বাংলার বামপন্থী নারী রাজনীতি : সংগঠন, কার্যকলাপ এবং আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭৭)

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে
পি এইচ. ডি-এর জন্য অনুমোদিত
গবেষণাপত্র

গবেষক
মিঠু ফৌজদার (প্রামানিক)
রেজিঃ নং ঃ ০২১৭/পি. এইচ. ডি (আর্টস)

ইতিহাস বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
পশ্চিম মেদিনীপুর

২০১৬

VIDYASAGAR UNIVERSITY
MIDNAPORE -721 102, WEST BENGAL
Ph: 03222- 276554/276555/276557/276558

গবেষক মিঠু ফৌজদার (প্রামানিক) আমার তত্ত্বাবধানে "বাংলার বামপন্থী নারী রাজনীতি: সংগঠন, কার্যকলাপ এবং আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭৭)" বিষয়ে গবেষণা করেছেন।

তাঁর এই গবেষণাকর্ম একান্তভাবে মৌলিক। অন্য কোথাও অন্য কোন ডিগ্রির জন্য এই গবেষণাপত্র বা তার অংশ জমা দেওয়া হয়নি।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ ডি. (ইতিহাস) উপাধির জন্য এই গবেষণাপত্র জমা দেওয়ার সুপারিশ করছি।

Sujaya Sarkar

মেদিনীপুর
তাং: 21.11.2016

(ড. সুজয়া সরকার)
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর,
ইতিহাস বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

DR. SUJAYA SARKAR
Associate Professor
Department of History
VIDYASAGAR UNIVERSITY
Midnapore-721102, W.B.

আমি মিঠু ফৌজদার (প্রামানিক) আমার গবেষণা পত্রের বিষয়- ''বাংলার বামপন্থী নারী রাজনীতি : সংগঠন, কার্যকলাপ এবং আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭৭)'' এই গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয়া ড. সুজয়া সরকার। আমার এই গবেষণা একান্তভাবে মৌলিক। আমার এই গবেষণাকর্ম বা তার অংশ বিশেষ কোনো উপাধির জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে আমি জমা দিইনি।

মিঠু ফৌজদার (প্রামানিক)
রেজিঃ নংঃ ০২১৭/পি. এইচ. ডি (আর্টস)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার গবেষণাপত্রটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সম্মানীয়া সহযোগী অধ্যাপিকা ড. সুজয়া সরকার মহোদয়াকে। যিনি সর্বতোভাবে এই কাজে সাহায্য করেছেন। এই কাজে সম্পূর্ণতা দেওয়ার জন্য উনি আমার পথপ্রদর্শক উপদেষ্টা। ওনার অকৃত্রিম নিয়ত ও অকুণ্ঠ সাহচর্য, মূল্যবান পরামর্শ, অভিজ্ঞতাপূর্ণ নির্দেশনা, আন্তরিক উৎসাহদান ছাড়া গবেষণাপত্রটি করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। উনি আমার এই কাজের প্রেরণা। ওনার কাছে আমি চিরঋণী।

আমার এই কাজে বিভিন্ন অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের এবং বহু গুণী ব্যক্তির কাছ থেকে নানাভাবে সহায়তা ও পরামর্শ পেয়েছি, কর্মপথে অভিমতের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছি, তাঁদের সকলকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য শ্রদ্ধেয় রঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়কে এবং মাননীয় নিবন্ধক শ্রদ্ধেয় জয়ন্ত কিশোর নন্দী মহাশয়কে। আমার এই কাজের ক্ষেত্রে তথ্য যুগিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন এমন অনেক মানুষ যাঁরা ছাড়া এই কাজকে সমৃদ্ধ করা যেত না। তাঁদের আমি অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই।

এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক উপাদানরূপে যেমন সমসাময়িক সংশ্লিষ্ট সরকারি নথিপত্র, কমিউনিস্ট পার্টি, কিষাণ, শ্রমিক ও নারী আন্দোলনের রাজনৈতিক দলিলপত্র, সম্মেলনের প্রতিবেদন, প্রচারপত্র, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্র, ইস্তাহার প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে তেমনই নারী আন্দোলনের সংগঠক ও কর্মীদের স্মৃতিকথা, অভিজ্ঞতালব্ধ রচনা, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি গবেষণাপত্রকে পূর্ণতা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কিছু রিপোর্ট পরিশিষ্ট অংশে সংযোজন করেছি। এই সমস্ত তথ্য প্রাপ্তির জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, পার্কস্ট্রীট, জাতীয় গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, মুজফ্ফর আহ্মেদ পাঠাগার কেন্দ্র-কলকাতা, গণশক্তি পাঠাগার, একসাথে পাঠাগার, সুকুমার সেনগুপ্ত পাঠাগার, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয় পাঠাগার—এর সকল আধিকারিক ও কর্মীদের। আমার গবেষণাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে এঁরা সকলে বিভিন্নভাবে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ ও সাহায্য করেছেন।

আমার পরিবারের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদের স্মারকস্বরূপ আমার এই গবেষণাপত্র। এই গবেষণাপত্রটি করার জন্য যাদের সবচেয়ে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তারা হল আমার দুই শিশু সন্তান মেহেলি ও মৌতালিকে। এই দুজনের নিঃস্বার্থ ভালবাসা আমার গবেষণার অনুপ্রেরণা। ব্যস্ততার কারণে অনেকসময় এদের দিকে ফিরে তাকাতে পারিনি। বড় হয়ে পড়তে পারবে—এটুকুই মনের তৃপ্তি।

গবেষণাপত্রটি যত্ন করে ডি.টি.পি করে সময়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে প্রকাশের জন্য আমি 'শ্রীলিপি' প্রিন্টার্স এর কাছে কৃতজ্ঞ।

সূচীপত্র

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায় : ১৬

বামপন্থী নারী সংগঠন : বিবর্তন ও
কার্যকলাপ (১৯৪৭-১৯৭৭)

দ্বিতীয় অধ্যায় : ৬৪

রাজনৈতিক আন্দোলনে বামপন্থী
মহিলাদের ভূমিকা: (১৯৪৭-১৯৭৭)

তৃতীয় অধ্যায়: ১২৬

আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য
বামপন্থী মহিলাদের কাজ: (১৯৪৭-১৯৭৭)

চতুর্থ অধ্যায়: ১৭৩

খাদ্য সমস্যা এবং বামপন্থী নারী : (১৯৪৭-১৯৭৭)

পঞ্চম অধ্যায় : ২১৪

বাংলার বামপন্থী নারীদের পরিচিতি, বিবরণ ও বিশ্লেষণ

উপসংহার ২৫১

রিপোর্ট ২৬২

চিঠি ২৮৮

বামপন্থী মহিলানেত্রীদের সংক্ষিপ্ত জীবনপরিচিতি ৩০৭

উৎসপঞ্জী ৩১৮

ভূমিকা

আধুনিক ইতিহাস চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নারীদের ইতিহাস। সমাজে নারীদের ভূমিকা, বিভিন্ন তত্ত্বগত আদর্শের সাথে তাদের পরিচয় এবং বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ ও আন্দোলনে তাদের অবস্থান— প্রত্যেকটি বিষয়ই ইতিহাসের আধুনিক গবেষকদের কাছে খুব আগ্রহের। এটা সত্যি যে সভ্যতার অগ্রগতি সত্ত্বেও নারীরা এখনও প্রান্তিক অবস্থায় আছেন। ২০০৭-এ প্রকাশিত UNICEF এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে তিনটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে নারীদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবশ্য প্রভাব থাকা উচিত-গৃহক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে।

কমিউনিজম/সাম্যবাদ হল একটি এমন ধারণা যেখানে সমাজ ও রাজনীতিতে নারীদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে বাংলায় কমিউনিজমের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

গবেষণার মূল বিষয়:

আমার গবেষণাপত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রভাবে বাংলার বামপন্থী নারী রাজনীতির গতিপ্রবাহ। এই গবেষণার সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে অর্থাৎ ভারত তথা বাংলার স্বাধীনতা লাভের সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত। সেই সময়কালে বাংলায় বামপন্থী নারীদের বিভিন্ন উদ্যোগ, কর্মপ্রচেষ্টা ও আন্দোলনে অংশগ্রহণ, তাদের সংগঠন-এসমস্তই এই গবেষণাপত্রের মূল বিষয়।

গবেষণার লক্ষ্য:

কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে আমার এই গবেষণার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। মূলতঃ যে যে বিষয়ের উপর এই গবেষণা আলোকপাত করেছে সেগুলি হল—

প্রথমত: কমিউনিস্ট মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত বাংলার বামপন্থী নারীদের চিন্তাভাবনা ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত: এই গবেষণার লক্ষ্য হল রাজ্যের ঐ সময়ের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা তুলে ধরা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থী নারীদের উদ্যোগগুলি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা।

তৃতীয়ত: বামপন্থী নারী সংগঠনগুলির সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা।

গ্রন্থ পর্যালোচনা

বাংলায় বামপন্থী আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বামপন্থী নারীদের রাজনীতি, সংগঠন, কার্যকলাপ ও আন্দোলন বিষয়ে প্রকাশিত আলোচনা ও গবেষণা। এখনো খুবই স্বল্প ও বিক্ষিপ্ত। তার একটি চিত্র তুলে ধরা হল।

রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত ‘‘ভারত ইতিহাসে নারী’’ গ্রন্থটি কে.পি.বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রকাশনা থেকে ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত। মূলতঃ ১৯৮৮ সালের ৩রা এপ্রিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের উদ্যোগে ‘‘ভারতের ইতিহাসে মেয়েদের স্থানঃ অতীত ও বর্তমানে শীর্ষক এক আলোচনাচক্রে বিভিন্ন বক্তার উপস্থাপিত বক্তব্যগুলি সংকলিত করা হয়েছে এই গ্রন্থে। সাতটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। কিন্তু সংকলনগুলিতে বাংলার নারী আন্দোলনের কোন চিত্র পাওয়া যায় না।

"Women in History' গ্রন্থটি প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স থেকে ২০০৩সালে প্রকাশিত। সম্পাদনা করেছেন অনুরাধা চন্দ, মহুয়া সরকার ও কুণাল চট্টোপাধ্যায়। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারী মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এক আলোচনা চক্রের বিষয় ছিল "Women in History" আলোচনাচক্রের আলোচিত প্রবন্ধগুলিকে সংকলিত করা হয় এই প্রবন্ধে। প্রবন্ধগুলিতে প্রাবন্ধিকরা প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে প্রবন্ধগুলিতেপ্রাচীন ভারতের নারীকে যেমন পাওয়া যায় তেমনিই জার্মান, চীনের নারীদেরও জানা যায়। কিন্তু আমার গবেষণার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

শ্রী পবিত্র সরকার সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক ২০০১সালে প্রকাশিত ‘‘ভারতের সমাজ ভারতের নারী’’ একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে দশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলিতে অসংগঠিত শিল্পে নারী, নিম্নবর্গের নারী, বাংলাদেশের মুসলমান নারীদের আইনগত অবস্থান, যৌনকর্মীদের অবস্থা, অস্থায়ী গার্হস্থ্য কর্মীদের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি, ভারতের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে মেয়েরা, পশ্চিমবঙ্গের শিশুকন্যাদের অবস্থান ইত্যাদি দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধ রচয়িতারা তথ্যভিত্তিক অনেক আলোচনা করলেও নির্দিষ্টভাবে বাংলার বামপন্থী মহিলাদের কার্যকলাপের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

শাশ্বতী ঘোষ রচিত ‘‘সমতার দিকে আন্দোলনে নারী : প্রথম পর্ব’’ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স থেকে ১৯৯৯সালে প্রকাশিত। শিক্ষার অধিকার থেকে সমানাধিকারের দিকে নারীর দীর্ঘ যাত্রা

শুরু। শিক্ষার আন্দোলন থেকে ভোটের আন্দোলন, বুর্জোয়া নারীবাদী ভাবনা থেকে সমাজতন্ত্রী ভাবনা পেরিয়ে আজকের স্বতন্ত্র নারীবাদী ভাবনায় পৌঁছানোর ইতিহাস অনুসন্ধান করাই এই গ্রন্থের মূল প্রয়াস। এই গ্রন্থের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে ভোটের অধিকার অর্জন দিয়ে। এই অধিকার অর্জন করতে গিয়ে শুধু ভারতবর্ষের নারীরাই নন, কিভাবে বিদেশের রমনীরা নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন তার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন লেখিকা। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রন্থটি থেকে সামগ্রিকভাবে বাংলার বামপন্থী নারীদের সামগ্রিক সংগ্রামের ইতিহাস পাওয়া সম্ভব নয়।

“ভারত ইতিহাসে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক এদের সংকট ও সংগ্রাম উনিশ থেকে বিশ শতক” গ্রন্থটি ড. অমল দাশের লেখা প্রগতিশীল প্রকাশনা থেকে ২০১৩ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থটিতে লেখক নিম্নবর্গের নারী শ্রমিকদের অবস্থা ভারতবর্ষে উনিশ থেকে বিশ শতক পর্যন্ত কেমন ছিল তা বর্ণনা করেছেন। মূলত তিনি নারী জাতিকে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ এই দুটি ভাগে ভাগ করে শুধুমাত্র নিম্নবর্গের নারী অর্থাৎ দরিদ্র, অনগ্রসর নারী শ্রমিকদের অবস্থার মূল্যায়ন করেছেন। দশটি অধ্যায়ে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। তবে এতে সমগ্র নারীজাতির বিষয় বিধৃত হয়নি। শুধু তাই নয় এই গ্রন্থটি থেকে বামপন্থী মতাবলম্বী নারীদের সাংগঠনিক শক্তি ও আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া সম্ভবপর নয়।

কমলা দাশগুপ্ত রচিত ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী’ একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন থেকে ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর অবদান এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থটি কোন জীবনচরিত নয়। ইতিহাসও নয়। এতে ইতিহাসের কিছু কিছু উপাদান রয়েছে। আসলে স্বাধীনতা সংগ্রামী অনেক নারী পরবর্তীকালে বামপন্থী মতাদর্শে আকৃষ্ট হন। এঁদের সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য এই গ্রন্থটি থেকে পাওয়া যায়। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বামপন্থী নারীদের সংগঠন, আন্দোলন সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য এই গ্রন্থে পাওয়া যায় নি।

Ranjana Kumari সম্পাদিত "Women in Decision Making" গ্রন্থটি নারী সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ।বিকাশ পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক ১৯৯২সালে প্রকাশিত। গ্রন্থটিতে বারোটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং সেইসঙ্গে কিভাবে মহিলাদের আরো বেশী করে যুক্ত করা যায় তাই মূলতঃ আলোচিত হয়েছে। বাংলার নারীদের অবস্থান এ থেকে স্পষ্ট নয়।

পার্থ চ্যাটার্জী ও প্রদীপ জগন্নাথন্ সম্পাদিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল "Community Gender and Violence"। Ravi Dayal Publishers থেকে ২০০০ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থটিতে নয়টি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রবন্ধ রচয়িতারা ভারতবর্ষের মহিলাদের অবস্থান, তারা কিভাবে ভায়োলেন্স-এর শিকার হন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এক একজন একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছেন। এতে নির্দিষ্টভাবে বাংলার মহিলাদের অবস্থার বর্ণনা নেই। তাছাড়া, বামপন্থী মহিলাদের কর্মকাণ্ডের উল্লেখও পাওয়া যায় না।

চন্দন বসুর লেখা "Radical Ideology and 'Controlled' Politics : CPI and the History of West Bengal 1947-1964" গ্রন্থটি Alphabet Books থেকে 2015 সালে প্রকাশিত। গ্রন্থটিতে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। পার্টি গঠনে মার্কসীয় তত্ত্ব, সেই তত্ত্বে লেনিন ও মাও সেতুং এর সংযোজন, ভারতবর্ষে কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা ও তার বিভিন্ন দিক, পশ্চিমবঙ্গে সি.পি.আই দলের প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিত এবং ১৯৪৭-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ঐ রাজনৈতিক দলের কাজ ও সীমাবদ্ধতা গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে কয়েকটি ঘটনা প্রসঙ্গে বামপন্থী নারী নেতৃত্বদের প্রতিক্রিয়া আলোচিত হলেও পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী নারীদের কার্যকলাপের কোন সার্বিক চিত্র প্রকাশিত হয়নি।

চন্দন বসুর লেখা আরো একটি গ্রন্থ হল "The Making of The Left Ideology In West Bengal - Culture, Political Economy, Revolution 1947-1970"। গ্রন্থটি Abhijeet Publications থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থটিতে সাতটি অধ্যায় রয়েছে। গবেষণাধর্মী গ্রন্থটিতে স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী মতাদর্শের উদ্ভব ও ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তার বিবর্তনের ধারা বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে কিভাবে বামপন্থা ক্ষমতায় এল, বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, জীবনযাত্রার ক্রমঅবনতি প্রভৃতি কারণগুলি কিভাবে জনমানসে বামপন্থী মতাদর্শকে গ্রহণীয় করে তুলল এই গ্রন্থটিতে লেখক তা বিশ্লেষণ করেছেন। সার্বিকভাবে বামপন্থার উত্থান আলোচিত হলেও বামপন্থী নারী আন্দোলনের সামগ্রিক দিক এতে আলোচিত হয়নি।

নীরা দেশাই এবং ঊষা ঠক্কর -এর লেখা "Women in Indian Society" গ্রন্থটি National Book Trust, India থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থটি থেকে বর্তমান ভারতে মহিলাদের অবস্থান যেমন উপলব্ধি করা যায় তেমনই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি মহিলাদের রাজনীতির আঙিনায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কতটা সচেতন তাও উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু আমার গবেষণার আলোচ্য সময়কালে বাংলার নারীদের অবস্থা তেমনভাবে উপলব্ধি করা যাবে না গ্রন্থটি থেকে।

"বিশ্বনারী আন্দোলনের পটভূমিকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শতবর্ষের ইতিহাস" গ্রন্থটি

শুভাশীষ গুপ্তের লেখা একটি তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ। ২০১১ সালে লেখক নিজে এটি প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির মধ্যে তিনটি খণ্ডের প্রত্যেকটিতে অনেকগুলি অধ্যায় রয়েছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য থেকে শুরু করে নারীমুক্তি সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা, নারীদের বিভিন্ন অধিকারের আন্দোলন, ভারতবর্ষে আধুনিক নারী আন্দোলন এবং পশ্চিমবাংলায় নারীদের জন্য বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বাংলার বামপন্থী নারীদের সংগঠন ও আন্দোলন সম্পর্কে যথোচিত বিষয়বস্তু গ্রন্থটি থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।

"Political Participation of Women in West Bengal– A Study"– গ্রন্থটি জয়শ্রী ঘোষের লেখা। প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স থেকে ২০০০সালে প্রকাশিত। মূলতঃ লেখিকা পশ্চিমবাংলার মহিলাদের রাজনৈতিক জীবনের কিছু চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর গ্রন্থটিতে। তবে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার ২৭টি পৌরএলাকাকে নিয়ে সমীক্ষা করা হয়েছে। আর এই এলাকায়- নারী পুরুষের বয়সের তারতম্য, জাতিগত এবং পরিবারগত ঐতিহ্য ইত্যাদির উপর মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কতটা প্রভাব ফেলে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার থেকে আমার গবেষণার মূল বিষয় সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়া সম্ভব নয়।

গোলাম মুরশিদের লেখা— ‘‘নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ রমণী’’ গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। নয়া উদ্যোগ কলকাতা থেকে ২০০১সালে প্রকাশিত। লেখকের "Reluctant Debutante:Response of Bengali Women to Modernization, 1849-1905" গ্রন্থের অনুবাদ হল এই গ্রন্থটি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকদের একাংশ তাঁদের মহিলাদের কিভাবে আধুনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেন এবং মহিলারা কিভাবে তাতে সাড়া দেন— এ গ্রন্থে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি পুরুষদের পরিচালিত সংস্কার আন্দোলনের ফলে মহিলারা কতটা আধুনিক হয়ে উঠেছিলেন এ গ্রন্থ থেকে তাও জানা যায়। তবে, এ গ্রন্থ থেকে স্বাধীনতার পর বাংলার নারীদের সংগঠন ও আন্দোলন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়।

‘নারী নির্যাতন ও নারী আন্দোলন’ — গ্রন্থটি ড: চিত্ত মণ্ডল সম্পাদিত নবজাতক প্রকাশনা থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত। ভারত ও বাংলাদেশের বেশ কিছু তরুণ লেখক ও গবেষকের লেখা প্রবন্ধ এতে সংকলিত হয়েছে। পাশাপাশি কিছু নারীবাদী এবং মার্কসবাদী নেত্রী নারীদের মুক্তির জন্য কিভাবে আন্দোলন সংগঠিত করেছেন, সমাজ কিভাবে নারীদের দেখে, পুরুষ নারীদের ওপর এখনও কিভাবে অত্যাচার চালায় এবং কিভাবেই বা নারীদের মুক্তির দিগন্ত

উন্মোচিত হতে পারে, এমনি ধরনের বেশকিছু প্রবন্ধ নিয়ে চারটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করে সংকলিত ও সম্পাদিত হয়েছে এই গ্রন্থ। বামপন্থী নারী আন্দোলনের নেত্রী কনক মুখোপাধ্যায়, সমাজতাত্ত্বিক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মালিনী ভট্টাচার্য, অনিলা দেবী, বিমলা রণদিভের প্রমুখের লেখা এই গ্রন্থে রয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বামপন্থী নারীরা কিভাবে নারীমুক্তির জন্য চেষ্টা করেন বা ধারাবাহিকভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে সাধারণ মহিলাদের সংগঠিত করেন সে বিষয়ে কোন আলোচনা এই গ্রন্থে নেই।

'অধিকার থেকে ক্ষমতায়ন'—গ্রন্থটি সোমা মুখোপাধ্যায়ের লেখা মিত্রর প্রকাশনা থেকে ২০০৮ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থটিতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতা ও অধিকারের বিকেন্দ্রীকরণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলা— প্রভৃতির মাধ্যমে নতুন এক সামাজিক শক্তি হিসেবে কিভাবে মহিলাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। এ সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে পশ্চিমবঙ্গের নারীদের কিভাবে ক্ষমতায়ন ঘটেছে তা স্বনিযুক্তি প্রকল্পে হোক, পঞ্চায়েতে হোক বা নীতি নির্ধারণে হোক - তার বর্ণনা পাওয়া যায়। তাতে কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বামপন্থী নারীদের কার্যকলাপের কোন ধারাবাহিক কার্যের বিবরণী পাওয়া যায় নি।

হ্যারিপোলিট সংকলিত - ''নারী-কমিউনিজম-মার্কস থেকে মাও'' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন মন্মথ সরকার। র‍্যাডিক্যাল প্রকাশনা থেকে ২০০৮ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থটিতে নারী আন্দোলন সম্পর্কে কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলসের চিন্তাধারা এবং পরবর্তীকালে লেনিন ও স্ট্যালিনের ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি সমাজ গঠনের সময় থেকে সমাজতন্ত্রে কিভাবে মুক্তি সম্ভব তার বর্ণনা রয়েছে এই গ্রন্থটিতে। মানবজাতি কিভাবে সভ্য শ্রেণিগত সমাজে উত্তীর্ণ হয় এবং সেখান থেকে শ্রেণিহীন সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার সময় সমাজকে কিরূপ পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের অবস্থার কীরকম পরিবর্তন ঘটে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে গ্রন্থটিতে। কিন্তু বাংলার নারী আন্দোলনে বামপন্থী নারীদের অবদানের কোনো উল্লেখ নেই।

শ্যামলী গুপ্তা-র নারীদের সম্পর্কে লেখা একটি গ্রন্থ হল 'বঙ্গ মহিলা চরিতাভিধান'। গ্রন্থটি সাহিত্যলোক প্রকাশনা থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত। বাংলাদেশের যেসব নারী সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প-রাজনীতি, সমাজনীতি ও বিভিন্ন অঙ্গনে অবদান রেখেছেন তাঁদের কথা তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থটিতে। ষোড়শ শতক থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অর্থাৎ স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার নারীদের এই গ্রন্থে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে, গ্রন্থটি থেকে কয়েকজন বামপন্থী

রমণীর ব্যক্তিগত জীবন ও কাজের বিবরণ পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু বাংলার নারী আন্দোলনের কোন সার্বিক চিত্র গ্রন্থটি থেকে পাওয়া যায় না।

শ্যামলী গুপ্ত সম্পাদিত "শতবর্ষের কৃতী বঙ্গনারী" - গ্রন্থটি ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত। বিশ শতকের প্রারম্ভে যাঁদের জন্ম এবং ইতিমধ্যে যাঁরা প্রয়াত হয়েছেন— এরকম একশোজন নারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এই সংকলনে পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে যেমন রয়েছেন লেখিকা ও বুদ্ধিজীবি, তেমনি অন্যদিকে সমাজ-পরিবর্তনের কর্মী। যাঁরা কোনো না কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কিন্তু গ্রন্থটিতে অনেকেরই পরিচয়ের অসম্পূর্ণতা রয়েছে। তাছাড়া, গ্রন্থটি থেকে বাংলার বামপন্থী নারীদের সম্পূর্ণ আন্দোলন ও সংগঠনের ইতিহাস জানা সম্ভব নয়।

শ্যামলী গুপ্তের লেখা "নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা" গ্রন্থটি দীপ প্রকাশনা - কলকাতা থেকে ২০০৭ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থটিতে অনেকগুলি প্রবন্ধ সংকলন রয়েছে। কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখিকা গ্রন্থটি লেখেননি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা প্রবন্ধগুলি একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এতে যেমন একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের ভূমিকা, নারীর স্বাধিকারের আন্দোলন, আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্যের ইতিহাস রয়েছে তেমনই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নারীদের উন্নয়নের খতিয়ানও এতে পাওয়া যায়। তবে বাংলার বামপন্থী নারীদের আন্দোলনের ক্রমানুযায়ী কোন বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

বৃন্দা কারাতের লেখা "অস্তিত্ব ও মুক্তি" গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত। বৃন্দা কারাতের লেখা 'Survival and Emancipation' বইটি থেকে মোট ১৪টি প্রবন্ধ বাছাই করে এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলিতে নারী শ্রমিক, সমাজতন্ত্রে নারীমুক্তি, পণপ্রথা, বিকল্প খাদ্যনীতি, ডাইনী প্রথা, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নারীদের সংগ্রাম, মহিলা সংরক্ষণ বিল ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বাংলায় বামপন্থী নারীরা কিভাবে নারীদের সংগঠিত করে মুক্তির জন্য আন্দোলন পরিচালনা করেন তার কোনো সার্বিক ইতিহাস গ্রন্থটি থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।

বাংলার নারী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন নেত্রীর লেখা কিছু গ্রন্থও রয়েছে। যেমন কনক মুখোপাধ্যায় লিখিত "নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা" বাংলার নারী আন্দোলন সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ। বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয় মার্চ, ১৯৯৩ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা

সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে এগিয়ে গিয়ে কিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হল এবং বিভিন্ন বাস্তব অবস্থার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি গড়ে ওঠার বিশদ বিবরণ তিনি তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বামপন্থী নারী আন্দোলনের ত্রুটি ও দুর্বলতার দিকগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যের অভাব রয়েছে এইগ্রন্থে। পাশাপাশি মহিলা ফ্রন্ট সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র দৃষ্টিভঙ্গীর কোন উল্লেখ নেই। লেখিকা যেহেতু নিজে একজন বামপন্থী নারী আন্দোলনের শরিক ছিলেন তাই বোধহয় উক্ত দিকগুলি সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন।

নারীমুক্তি আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েদের অবদান জানার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল কমিউনিস্ট নেত্রী রেনু চক্রবর্তীর "Communists in Indians Women's Movement" গ্রন্থটি। এই গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন পুষ্পময়ী বোস ও মণিকুন্তলা সেন এবং নামকরণ করেছেন "ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা (১৯৪০-১৯৫০)"। গ্রন্থটিতে লেখিকা নিজে আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে যা অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তার উপর ভিত্তি করে লিখেছেন। তাছাড়া বইটিতে ১৯৪০-১৯৫০খ্রী. পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ বর্ণিত হয়েছে। ফলে, পরবর্তীকালের বামপন্থী নারীদের বা তাদের কর্মসূচীর বিষয়ে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না গ্রন্থটি থেকে। সর্বোপরি কমিউনিস্ট কর্মীদের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে লেখিকা কোন বক্তব্য তুলে ধরেননি।

বামপন্থী মহিলা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'সেদিনের কথা'। ১৯৮২ খ্রি. নবপত্র প্রকাশনা থেকে বইটি প্রকাশিত। লেখিকা দীর্ঘ পঁচিশ বছরে নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তার একটি চিত্র গ্রন্থটি থেকে পাওয়া যায়। তবে, আমার গবেষণার আলোচ্য সময়কালের সম্পূর্ণ নারীসমাজের চিত্র গ্রন্থটি থেকে পাওয়া যায় না।

শ্যামলী গুপ্ত "বঙ্গনারীর প্রগতি প্রবাহ" নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটিতে লেখিকা প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নারীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অনেকগুলি অংশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে লেখিকা যা যা লিখেছেন তাই একত্রে সংকলিত করা হয়েছে। ফলে, বামপন্থী মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে ক্রমানুযায়ী জানা যায় না। তাছাড়া লেখিকা বিভিন্ন সহায়ক বা গৌণ উৎসের উপর নির্ভর করে গ্রন্থটি লিখেছেন।

অধ্যাপিকা কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'রাজনীতি নারীশক্তি' আরেকটি গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে

লেখিকা বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং স্বাধীনতার কাল থেকে রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ে ও স্তরে নারীর অবদান ও অবস্থান সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি মূলতঃ গুরুত্ব দিয়েছেন সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও শ্রেণীর নারীর ক্ষমতায়ন গুলি নিয়ে আলোচনা করার দিকে। ফলে বামপন্থী নারীদের কার্যকলাপ, আন্দোলন, সংগঠন সম্পর্কিত সমস্ত দিকগুলি তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

বর্তমান গবেষণায় এইসমস্ত ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ইতিহাসের তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ খ্রি. পর্যন্ত সময়কালে বামপন্থী নারীদের কার্যকলাপ, সংগঠন ও আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্য উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি :

বর্তমান গবেষণা কাজটির তথ্য উৎস হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি লেখ্যাগার বা মহাফেজখানা, সরকারি ও বেসরকারি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য প্রতিবেদন। লিপিবদ্ধ বিভিন্ন স্মৃতিকথা, বিভিন্ন সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক, প্রবন্ধ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এই গবেষণায় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রাথমিক তথ্যসূত্রের সাথে গৌণ তথ্যসূত্রের সমন্বয়ে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত ও সম্পন্ন করা হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

আমার গবেষণার কাজটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়গুলির আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে নীচে দেওয়া হল:

প্রথম অধ্যায় : বামপন্থী নারী সংগঠন: বিবর্তন ও কার্যকলাপ (১৯৪৭-১৯৭৭)

১৯৩০-এর দশকে বাংলার শিক্ষিত ছাত্রীদের অতি সামান্য অংশ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মহিলাদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এঁদের সংগঠিত করার পরিকল্পনা করা হয়। মণিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী, কমলা মুখার্জী, জুঁইফুল রায় ও কনক মুখার্জী - এই পাঁচজন মহিলা সদস্যকে নিয়ে প্রাদেশিক মহিলা ফ্রাকশন ও পরে প্রাদেশিক স্পেশ্যাল সেল গঠন করা হয়। এঁদের উপরেই বাংলায় মহিলাদের মধ্যে পার্টি ও গণসংগঠনের কাজ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।[১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় গড়ে ওঠা 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র মধ্যে বিভিন্ন দল ও মতের মহিলাদের সাথে বামপন্থী মহিলারাও যুক্ত হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর

পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এর বৃহৎ অংশটি থেকে যায় পূর্ববাংলায়, আর বাকী অংশটি পশ্চিমবাংলায়। পশ্চিমবাংলার সংগঠনটি ধীরে ধীরে বামপন্থী মহিলাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে থাকে। স্বাধীনতার পর সরকারের নীতি ও কার্যকলাপের বিরোধিতা করায় অন্যান্য গণসংগঠনের সাথে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইনে বেআইনী ঘোষণা করে।[২] ফলে এইসময় সমিতি প্রকাশ্যভাবে সম্মেলন করতে পারে নি। সেই কারণে ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সালে সমিতির চতুর্থ এবং পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় প্রায় গোপনভাবে। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে কলকাতা হাইকোর্ট আইনসিদ্ধ ঘোষণা করে এবং একে একে রাজবন্দীদের মুক্তি ঘটে। ফলে প্রকাশ্যভাবে সমিতির নেতৃত্বে বামপন্থী মহিলারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে বামপন্থী মহিলারা বিশ্বনারী সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচীতেই অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালের ৭-১০ই জুলাই সুইজারল্যাণ্ডের সুসান শহরে বিশ্বমাতৃসম্মেলনে মহিলারা অংশ নেন।[৩] এদিকে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নবম সম্মেলনে সমিতির নামের থেকে 'আত্মরক্ষা' কথাটি বাদ দেওয়া হয়। তবে এই পর্বে বামপন্থী মহিলাদের সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল হতে থাকে। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব প্রকট হতে থাকে। ফলে, পার্টি প্রভাবিত গণসংগঠনেও তার প্রভাব পড়ে। ১৯৭০ সালের ৭-৮ই মার্চ সমিতির ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলনের সময় সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।[৪] জরুরী অবস্থার সময় মহিলারা যৌথ কর্মসূচী নেন। কাজেই বলা যায়, সমস্ত সময়কাল জুড়ে নারী সংগঠন প্রত্যক্ষ করেছে বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহিলাদের কার্যকলাপ অব্যাহত ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায় : রাজনৈতিক আন্দোলনে বামপন্থী মহিলাদের ভূমিকা (১৯৪৭-১৯৭৭)

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বহু ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ভারত তথা বাংলাকে। এরমধ্যে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির সাথে যুক্ত কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যাগুলি যেরকম ছিল, তার সাথে সমান্তরালভাবে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল চরম খাদ্যসংকট, বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তির বিষয়টিও সেই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দিকটিও সমান প্রাসঙ্গিক ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ১৯৪৬-৪৭ সালে শুরু হওয়া তেভাগা ও অন্যান্য দাবিতে গ্রামাঞ্চলে কৃষক আন্দোলন। এই

আন্দোলনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে কৃষক নারীরা এতে সক্রিয় ও সংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৫] গ্রামীন মহিলাদের নিয়ে আন্দোলন পরিচালনার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিসহ বামপন্থী মহিলাদের ভূমিকার কথা জানা যায়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন। পাড়ায় সভা করা, পুলিশি জুলুমের বিরুদ্ধে কাগজে বিবৃতি দেওয়া এবং যেসব আন্দোলনকারীকে বিনা অপরাধে জেলে আটক রেখেছে তাদের বিনাশর্তে ছেড়ে দেওয়ার মত নানা কর্মসূচী বামপন্থী মহিলাদের পক্ষ থেকে নেওয়া হয় বলে জানা যায়।[৬] জাতীয়ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ছিল ১৯৫৬খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় আইন অমান্য করে কারাবরণ করা, স্বাক্ষর সংগ্রহ করা, বিভিন্ন সম্মেলনে বঙ্গ-বিহার সংযুক্ত বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন করার মত কর্মসূচী গ্রহণ করে বামপন্থী মহিলারা এই আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন বলে তথ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭] ১৯৬৭ সালে নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস দলের সরকারের পরাজয় হয় এবং প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। এই নির্বাচনে কয়েকজন বামপন্থী মহিলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিছুদিন পরেই এই সরকারের পতন হয়ে গঠিত হয় পি.ডি.এফ. সরকার। এই সরকারের বিরুদ্ধে মহিলারা আইন অমান্য করেন। সকলের সমবেত প্রতিবাদের ফলে পি.ডি.এফ. সরকারকে সরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার, প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি পদত্যাগ করলে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হয় এবং রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবিতে মহিলারা রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেন। ১৯৭২ খ্রি. নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন হয়। বারেবারে সরকারের পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রপতি শাসনে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হলে মহিলারা এই অধিকার রক্ষার দাবিতে আন্দোলনে সামিল হন। 'ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি'র নেতৃত্বে মহিলারা ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষায় অগ্রণী হন। আলোচ্যসময়কালে আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে যে সমস্ত আন্দোলনকারীকে সরকার গ্রেপ্তার করে তাঁদের মুক্তির দাবিতে মহিলারা বন্দীমুক্তি আন্দোলনে যুক্ত হন। জেলের অভ্যন্তরে ও জেলের বাইরে এই আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে। জেলের অভ্যন্তরে অনশন ও জেলের বাইরে সভা মিছিল করে মহিলারা সরকারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হন। এমনকি ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মহিলারা মিছিল করায় পুলিশের গুলিতে চারজন বামপন্থী মহিলা নিহত হন।[৮]

এইভাবে দেখা যায় ১৯৪৭-১৯৭৭ এই পর্বে বামপন্থী মহিলারা বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, কখনো প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন এবং বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায় : আর্থ সামাজিক উন্নতির জন্য বামপন্থী মহিলাদের কাজ (১৯৪৭-১৯৭৭)

রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ও কর্মোদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নতির জন্যও বামপন্থী মহিলারা বিভিন্নরকম কাজে নিজেদের যুক্ত করেন। স্বাধীনতার পর প্রধান সমস্যা ছিল বাস্তুহারা সমস্যা। বাস্তুহারা সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল একদিকে যেমন সার্বিকভাবে সকল উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক সমস্যার দিকটি, তেমনি ছিল নারীদের কিছু বিশেষ আর্থসামাজিক সমস্যা, যেমন- চাল, কাপড় এবং রুজির সমস্যা। আর এই সমস্যার সূত্র ধরেই বামপন্থী মহিলারা উদ্বাস্তু মানুষদের পাশে দাঁড়ান বলে তথ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯] মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জন্মলগ্ন থেকেই বামপন্থী মহিলারা মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা, প্রস্তাব নেওয়া, সভা ও মিছিল করে জনগণকে সচেতন করা, সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি পেশ করা, বিধানসভায় বিষয়টি উত্থাপন করার মত কর্মসূচী নেন মহিলারা। শুধু দেশের মধ্যে এই আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ না রেখে আন্তর্জাতিক স্তরেও এই আন্দোলনকে যুক্ত করেন মহিলারা। বামপন্থী মহিলা কর্মীদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করার জন্য যেমন বিভিন্ন শিক্ষা শিবির সংগঠিত করা হয় অন্যদিকে তেমনই সাধারণ মহিলাদের বিশেষ করে কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মহিলাদের সাক্ষর করার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করার মত কর্মসূচী নেন মহিলারা। সামাজিক শোষণের হাত থেকে মহিলাদের রক্ষা করা ও অধিকার আদায়ের জন্য বামপন্থী মহিলাদের নেতৃত্বে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। যেমন হিন্দু কোড বিলের সমর্থনে ছোট-বড় সভা করা, ঘরোয়া আলোচনা করা এবং এই বিলের সমর্থনে নারী-পুরুষের স্বাক্ষর তুলে আইনসভার মারফৎ কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়। মহিলাদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে বিশেষ বিবাহ আইন (১৯৫৬), হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৬) ও পতিতা ব্যবসা নিরোধ আইন (১৯৫৬) পাশ হয়। ভারতীয় সমাজজীবনে একটি ঘৃণ্যতম প্রথা হল পণপ্রথা। এই পণপ্রথা নিরোধ বিল ১৯৫৪ সালে বামপন্থী মহিলা সাংসদ রেণু চক্রবর্তীর নামে লোকসভায় উত্থাপিত হয়।[১০] এই বিল আইনে পরিণত করার জন্য মহিলারা নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সই সংগ্রহ করা, আইনমন্ত্রীর কাছে পোস্টকার্ড পাঠানো, জনমত গঠনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় সভা করার জন্য কর্মসূচী নেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও এই বিলটিকে

আইনে পরিণত করতে সাত বছর সময় লেগেছিল অর্থাৎ ১৯৬১সালে এই বিল আইনে পরিণত হয়। বামপন্থী মহিলাদের একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী ছিল দুঃস্থ মহিলাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা। জীবিকার দাবিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি সংসদে ও বিধান সভাতেও মহিলারা এই বিষয়টি নিয়ে সরব হন। নারী ও শিশুদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন জীবিকার সাথে যুক্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ান বামপন্থী মহিলারা। মৎসজীবী, বিড়ি শ্রমিক, বাস শ্রমিক, শিক্ষক, রেলওয়ে কর্মীদের জীবিকার দাবিতে বিভিন্ন আন্দোলনে তাদের ও তাদের পরিবারের পাশে থাকার সংবাদ তথ্য থেকে পাওয়া যায়। আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাধ্যমে বামপন্থী মহিলাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল নারীদের মর্যাদা সঠিকভাবে রক্ষা করা। দুষ্কৃতি আক্রমণ সহ মহিলাদের উপর ঘটে যাওয়া মর্যাদা হানিকর যে কোনরকম ঘটনারই প্রতিবাদে মহিলাদের সামিল হতে দেখা গিয়েছে। কাজেই বলা যায় মহিলা ও শিশুসহ সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মহিলারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন।

চতুর্থ অধ্যায় : খাদ্য সমস্যা এবং বামপন্থী নারী (১৯৪৭-১৯৭৭)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত খাদ্য সমস্যার সমাধান সহ আরো কয়েকটি লক্ষ্য নিয়ে গড়ে উঠে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে খাদ্য সংকট মোকাবিলা করার জন্য মহিলারা যেমন উদ্যোগ নেন তেমনই স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও তাঁদের উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। কারণ ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের মত না হলেও ১৯৪৭-১৯৭৭ এইসময়কালে প্রায় সারা বাংলা জুড়েই এই সংকট মাঝে মাঝেই তীব্র আকার ধারণ করেছিল। তাই এই পর্যায়ে মহিলাদের অন্যতম প্রধান কর্মকাণ্ড ছিল খাদ্য সমস্যার সাথে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে। আলোচ্য পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল রেশনব্যবস্থা। রেশনিং ব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে তার জন্য মহিলা নেত্রীরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছিলেন। যেমন- ২৯.০১.১৯৪৮ তারিখে ১২০০ মহিলাকে নিয়ে মণিকুন্তলা সেনের নেতৃত্বে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান হয় প্রচলিত রেশনিং ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং যথাযথ রেশন কার্ড চালু করার জন্য।[১১] ১৯৪৭ খ্রি. থেকে ১৯৫৮খ্রি. পর্যন্ত খাদ্য সমস্যার সমাধানে নারীরা মূলত যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তা হল রেশনিং ব্যবস্থা। যথাযথ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করার লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা এককভাবে এবং অন্যান্য গণসংগঠনের সাথে যৌথভাবে সরকারের কাছে দাবি দাওয়া উত্থাপন করেন। ১৯৫৯খ্রি. পশ্চিমবাংলায় সর্বত্র দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এই খাদ্য সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন রাজনৈতিক

দলের পাশাপাশি বামপন্থী মহিলারা নিজেদের যুক্ত করেন বলে জানা যায়। ১৯৫৯ এর অনুরূপ খাদ্য সংকট ১৯৬৬ সালে দেখা দেয়। এই সময়ের আন্দোলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে শুধু কলকাতাকেন্দ্রিক নয়, বিভিন্ন জেলায় এমনকি মফঃস্বল অঞ্চলগুলিতেও নারীদের অংশগ্রহণের চিত্রটি বিভিন্ন তথ্যে উঠে এসেছে। ১৯৬৭-১৯৭৭ এই দশ বছর সময়কালে নারীদের কর্মসূচীর মূল অভিমুখ ছিল খাদ্য সমস্যার সমাধান। আর এই সমস্যার সমাধানের জন্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নারীরা যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বামপন্থী মহিলা সংগঠনগুলি সেইভাবে আন্দোলনে সামিল হয়।

পঞ্চম অধ্যায় : বাংলার বামপন্থী নারীদের পরিচিতি, বিবরণ ও বিশ্লেষণ

১৯৪৭-১৯৭৭খ্রি. পর্যন্ত বাংলায় বামপন্থী নারীদের সংগঠন, আন্দোলন ও কার্যকলাপ এই গবেষণাপত্রের মূল আলোচ্য বিষয়। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণতা দিতে গেলে যে সমস্ত নারীরা বামপন্থী আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন তাঁদের পরিচিতি, তাঁদের জীবন, কাজের বিভিন্ন দিক ও চিন্তাভাবনা আলোচনা করা জরুরী। বামপন্থী নারী আন্দোলনের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে গেলে একদিকে যেমন নারীদের সংগঠনে যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপট আলোচনা করা প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মহিলারা কিভাবে রাজনীতির আঙিনায় যুক্ত হয়েছিলেন এবং অনেকক্ষেত্রে সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন করেও নিজেদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে নিযুক্ত রেখেছিলেন তাও বিশ্লেষণ করা দরকার। আর এই সমস্ত দিক আলোচনা করতে গিয়ে যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বামপন্থী নারী আন্দোলনে মহিলাদের যোগদানের প্রেক্ষাপট ছিল নানাধরনের। জাতীয় কংগ্রেস, বিপ্লববাদী আন্দোলন, বামপন্থী ছাত্রী আন্দোলন,[১২]কৃষক আন্দোলনসহ[১৩] নানা সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে মহিলারা বামপন্থী নারী আন্দোলনে সামিল হন। আবার, প্রথম পর্বে বামপন্থী নারী সংগঠন সারা বাংলায় সক্রিয় ছিল না। বামপন্থী মহিলাদের কার্যক্ষেত্রের উৎসস্থল ছিল কলকাতা, বর্ধমান, হুগলীসহ পূর্ববঙ্গ। বামপন্থী সংগঠনে মহিলাদের জীবনযাপনও এই অধ্যায়ের আলোচনায় উঠে এসেছে। সম্প্রদায়গত অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন শ্রেণীর মহিলাদের বামপন্থী নারী আন্দোলনে অংশগ্রহণের চিত্রটিও পরিস্ফুট হয়েছে। সর্বোপরি বামপন্থী নারীদের শিক্ষা, অধ্যয়ন জ্ঞানের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১) মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, এন.বি.এ,২০০৫, পৃ. ১০০।

২) পুলিশ ফাইল নং - ৮৯৮/৪৪।

৩) পুলিশ ফাইল নং - ৬১৯/৩৬, Copy of a cyclostyled letter in English dated 30.6.55.

৪) একসাথে, ফাল্গুন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

৫) পুলিশ ফাইল নং-১৬২৮/৪৯, Report of Superintendent of Police (D.C.Sen) Midnapur dated 12.6.50.

৬) ঘরে বাইরে, ১৩৫৯/৬০, দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা।

৭) ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩

৮) সাতাশে এপ্রিল, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, পৃ.৩০।

৯) পুলিশ ফাইল ৬১৯/৩৬।

১০) ঘরে বাইরে, ১৩৫৯, শারদীয়া, পৃ. ২৮৫।

১১) পুলিশ ফাইল নং - ৬১৯/৩৬।

১২) পুলিশ ফাইল নং - ৬১৯/৩৬।

১৩) পুলিশ ফাইল নং - ১৬২৮/৪৯।

প্রথম অধ্যায়

বামপন্থী নারী সংগঠন: বিবর্তন ও কার্যকলাপ(১৯৪৭-১৯৭৭)

১৯৩০ -এর দশকে বাংলার শিক্ষিত ছাত্রীদের অতি সামান্য অংশ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মহিলাদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। ১৯১৭ খ্রি. রাশিয়ায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, জহরলাল নেহেরুর সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি বঙ্গদেশের মহিলাদের অনুপ্রাণিত করেছিল নতুন ভাবনায়। তাছাড়া, তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহমদের মত কিছু ব্যক্তিত্ব মহিলাদের পার্টিতে নিয়ে আসবার ও তাঁদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তুলবার উদ্যোগ নেন। সর্বোপরি, নারী সমাজের প্রতি সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনেক ছাত্রীকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। এঁদের কেউ কেউ ছিলেন পূর্বের কংগ্রেসকর্মী, কেউ বিপ্লববাদী কর্মী, আবার বেশকিছু জন ছাত্র আন্দোলন থেকে এসেছিলেন। ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এঁদের সংগঠিত করার পরিকল্পনা করা হয়। মণিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী, কমলা মুখার্জি, জুঁইফুল রায় ও কনক মুখার্জি—এই পাঁচজন মহিলা সদস্যাকে নিয়ে প্রাদেশিক মহিলা ফ্রাকশন ও পরে প্রাদেশিক স্পেশ্যাল সেল গঠন করা হয়। এঁদের উপরেই বাংলায় মহিলাদের মধ্যে পার্টি ও গণসংগঠনের কাজ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।[১]

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও বামপন্থী নারীদের সাংগঠনিক কাজের গতিপ্রকৃতি :

১৯৪৭ খ্রি. ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় বাংলায় নারীদের যে সংগঠনটি সক্রিয় ছিল তা হল 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ১৯৪২ খ্রি. গড়ে ওঠা এই সংগঠনটির মূল লক্ষ্য ছিল নারীদের আত্মরক্ষা ও খাদ্যের জন্য দাবি-দাওয়া উত্থাপন, তার সাথে দুঃস্থ ও পীড়িতদের সেবা, প্রয়োজনে লঙ্গরখানা খোলা এবং এর সাথে কুটিরশিল্পের বিষয়ে মহিলাদের মধ্যে প্রচার করা ইত্যাদি। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এর বৃহৎ অংশটি থেকে যায় পূর্ববাংলায়, আর বাকী অংশটি পশ্চিমবাংলায়। পশ্চিমবাংলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মধ্যেও ভাঙ্গন দেখা দিতে থাকে রাজনৈতিক দৃষ্টি ও নীতির প্রশ্নে। কারণ, ব্রিটিশ সরকার দেশ ছেড়ে চলে গেলে

সংগঠনের একটা অংশ সরকার বিরোধী প্রতিবাদী ভূমিকা নিতে চাইল না। আবার, অন্যদিকে আরেকটি অংশ সেই সময়কার প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা নিতে চাইল। স্বাভাবিকভাবেই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির গঠনের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং সমিতি দুর্বল হয়ে যায়।

অন্যদিকে স্বাধীনতার পর সরকারের নীতি ও কার্যকলাপের বিরোধিতা করায় ১৯৪৮ সালের ১৫ই জানুয়ারি ডঃ প্রফল্লচন্দ্র ঘোষের মুখ্যমন্ত্রীত্বে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার প্রথম যে আইন চালু করে তার নাম ছিল 'পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা আইন।[২] এই আইনের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করেন ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ । পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা আইন পাশ হওয়ার ৪দিন পর অর্থাৎ ১৯শে জানুয়ারি ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে সরিয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী হন।[৩]

কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষিত করার সরকারি নোটিফিকেশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেক্রেটারি রঞ্জিত গুপ্ত-র স্বাক্ষরসহ জারি করা হয়েছিল। নোটিফিকেশন নম্বর হল ১৭৫৯ পি., তারিখ ২৫শে মার্চ, ১৯৪৮। কলকাতা গেজেটে ২৭শে মার্চ ১৯৪৮ তারিখে উল্লেখিত হয়।[৪] বিশেষ ক্ষমতা আইনের প্রতিবাদ জানিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ও কলকাতা জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। রানী মহলনবীশের স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে লেখা হয়—"বঙ্গীয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও কলিকাতা জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি পশ্চিমবঙ্গের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হইতেছে দেখিয়া বিশেষ উদ্বেগ বোধ করিতেছে। আরও বিশেষ ক্ষমতার যথেচ্ছ প্রয়োগের মারফৎ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সদস্যদের বিনাবিচারে আটক রাখা হইতেছে। ইহা গণতন্ত্রসম্মত নহে ও তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের আশ্বাসের প্রতিপন্থী।"[৫]

কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্টির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গণসংগঠনের সাথে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উপর সরকারের আক্রমণ শুরু হয়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অনেক নেত্রী ও কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়। প্রায় শতাধিক মহিলা কর্মী ও নেত্রীকে কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে আটক করা হয়েছিল। যেমন- ২০.১১.১৯৪৮ তাং আশা সামন্ত, ০২.০৩.১৯৪৯ তাং কমলা মুখার্জী, ০৮.০৩.১৯৪৯ তাং মণিকুন্তলা সেন, ২৯.০৪.১৯৪৯ তাং ভক্তি ঘোষ ও ঊষা চক্রবর্তীকে, ০৫.০৫.১৯৪৯ তাং অলকা মজুমদারকে গ্রেফতার করা হয়।[৬] এছাড়া, গীতা মুখার্জী, কনক মুখার্জী, অনিলা দেবী, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়, নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়, নলিনী দেবী, মীরা চ্যাটার্জী, প্রীতি লাহিড়ী, সুলেখা সান্যাল, অশ্রু হালিম, ডলি বসু, অনিমা মুন্সী, তরু দেবী, মমতা সেন, নীলিমা সেন, রেবা রায়চৌধুরী, বাণী দাশগুপ্ত প্রমুখ মহিলা নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার

হন।[৭] মণিকুন্তলা সেনের রচনা থেকে জানা যায় বিমলা মাজী, অনুপমা, সরোজিনী, সাধনা পাত্র সহ প্রায় ৩০/৪০জন কৃষক মহিলা মেদিনীপুর থেকে জেলে আসেন।[৮] বিভিন্ন জেলা থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মোট ১৭৯ জন কমিউনিস্ট নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এরমধ্যে কলকাতা থেকে ৫৩জন, দার্জিলিং থেকে ৯ জন, জলপাইগুড়ি থেকে ৩৪জন, বাঁকুড়া থেকে ৯ জন, মেদিনীপুর থেকে ৭জন, মুর্শিদাবাদ থেকে ৫জন, বর্ধমান থেকে ৮জন, হুগলী থেকে ১৮জন, হাওড়া থেকে ১৪জন, ২৪ পরগণার ৪জন, মালদহের ৪জন এবং আরো অনেকে গ্রেপ্তার হন।[৯]

কারাগারের বাইরে যে সমস্ত মহিলা নেত্রী ও কর্মী ছিলেন তাঁরা সতর্কতার সঙ্গে মহিলাদের আন্দোলন ও সংগঠনের কাজ চালাতে থাকেন। উল্লেখযোগ্য ছিলেন রেণু চক্রবর্তী, পঙ্কজ আচার্য, মাধুরী দাশগুপ্ত, মুক্তি মিত্র প্রমুখ। পুলিশের গোপন ফাইল থেকে জানা যায় যে, অনেকেই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। যেমন রেণু চক্রবর্তীর ছদ্মনাম ছিল যশোদা। বীণা দেবী নাম নিয়ে মণিকুন্তলা সেন কাজ করতেন।

মহিলা নেত্রী ও কর্মীদের গ্রেপ্তার ও সরকারের তরফে আন্দোলন দমন করার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে গণ সংগঠনগুলির স্বাভাবিক কাজকর্ম কিছুটা ব্যাহত হয় বলে জানা যায়। তাই, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রকাশ্যভাবে সম্মেলন হয় নি। ১৯৪৮সালের ৬ই অক্টোবর শিক্ষাব্রতী সুষমা সেনের সভানেতৃত্বে কলকাতায় একটি সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনটি ছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির চতুর্থ সম্মেলন। সম্মেলনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নানা আন্দোলন ও কাজের একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়। জনগণকে দমন করার সরকারী নীতির নিন্দা করা হয় সম্মেলনে।[১০] তথ্য থেকে জানা যায় সম্মেলনে নানা বিষয়ের উপর প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে - ১) দমননীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব, ২) বাস্তুহারা সম্বন্ধে, ৩)গৃহ সমস্যা, ৪) শিক্ষা সমস্যা ও ৫) শিশু রক্ষার উপর প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১১] সম্মেলনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পদাধিকারী বা কমিটিগুলির কোন নতুন নির্বাচন হয় নি বলে জানা যায়।[১২]

তথ্য থেকে জানা যায় বেশীরভাগ বামপন্থী মহিলা নেত্রী ও কর্মী জেলবন্দী থাকায় এবং সরকারী তরফে বাধাদানের ফলে মহিলাদের প্রকাশ্যে কাজকর্ম কিছুটা ব্যাহত হয়। তারফলে ১৯৪৯ সালের ১০-১২ নভেম্বর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পঞ্চম সম্মেলন হয় কলকাতায় প্রায় গোপন অবস্থায়। প্রস্তুতিপর্বে বা সম্মেলন চলার সময় পুলিশের নজরদারি থাকায় সম্মেলনের প্রথমে বা শেষে কোন সমাবেশ হয়নি। প্রতিনিধিরা গোপনে সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনের

বিশেষত্ব ছিল পুলিশের নজরদারি এড়িয়ে কৃষক ও শ্রমিক মহিলাদের উপস্থিতি। ফসলের ন্যায্যভাগ পাওয়া, পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সামিল হওয়া, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার পাওয়ার জন্য লড়াই-এ কিভাবে সামিল হওয়া যায় তা জানার জন্য তাঁরা আসেন।[১৩] সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল নারী জাতির উন্নয়নের ভাবনা। পাশাপাশি সরকারী দমন নীতির সমালোচনা করা হয়। সম্মেলনে বিশ্বশান্তি আন্দোলন, গণতান্ত্রিক অধিকার ও নারীর বিশেষ অধিকারগুলি রক্ষার আন্দোলন, কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন, বন্দীমুক্তি আন্দোলন, শিক্ষক, নার্স ও উদ্বাস্তুদের আন্দোলনের উপর আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[১৪]

স্বাধীনতার পর বামপন্থী মহিলাদের সংগঠনে কৃষক রমণীদের প্রভাব বাড়তে থাকে। তার কারণ স্বাধীনতার পূর্বে সংগঠিত তেভাগা আন্দোলন। ১৯৪৮-৪৯ সালে সারা পশ্চিমবাংলায় গ্রামগুলিতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষতঃ হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলায় এই আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। সরকার এই আন্দোলনকে বন্ধ করার জন্য গ্রামাঞ্চলে পুলিশ ক্যাম্প বসায়। পুলিশের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক রমণীদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন বামপন্থী মহিলারা। মেদিনীপুর, ২৪পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান ও পশ্চিম দিনাজপুরের মহিলাদের সংগঠিত লড়াইএর ইতিহাস উল্লেখের দাবি রাখে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র নামে বামপন্থী মহিলারা বাংলার মহিলাদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। সেইসময় থেকেই বাংলার গ্রামীন কৃষক মহিলাদের সংঘবদ্ধ করা, তাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার চেষ্টা হলেও মূলতঃ তেভাগা আন্দোলনের সময়ই কৃষক মহিলাদের মধ্যে মহিলা সমিতি গড়ে ওঠে এবং অতিদ্রুত বাংলার তেভাগা আন্দোলন অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে ১৯৩৭-৩৮ সালে কৃষকসভার নেতৃত্বে বাংলার গ্রামে গ্রামে কৃষকদের সংগঠিত করার চেষ্টা হলেও তা পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কৃষক মহিলাদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা ছিল না। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা নেত্রীরা কৃষক রমণীদের সংগঠিত করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শহর থেকে নেত্রীরা গ্রামে গিয়ে কৃষক রমণীদের মধ্যে থেকে তাদের সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। যেমন- মণিকুন্তলা সেন, কল্যাণী দাশগুপ্ত, অমিয়া দে, সরযূ সরকার, সুষমা দত্ত, অমিয়া ঘোষ, ব্রজকিশোরী কুণ্ডু, মৃণালিনী তলাপাত্র প্রমুখ।[১৫] শুধু মহিলাদের সংগঠিত করা নয় তাদের সাক্ষর করাও ছিল আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রীদের একটি কাজ। দিনাজপুরে এই দায়িত্ব পালন করেন রানী মিত্র, বীণা সেন, অলকা মজুমদার, মণিকুন্তলা সেন প্রমুখ; জলপাইগুড়িতে কল্যাণী দাশগুপ্ত,

রংপুরে লিলি দে, রেবা রায়, শান্তি প্রধান, কনক মুখার্জী প্রমুখ; পাবনা ও রাজশাহীতে মায়া সান্যাল, প্রতিমা দাশগুপ্ত, প্রীতি সরকার, পঙ্কজ আচার্য, ইলা মিত্র, যশোহর ও খুলনায় গীতা রায়চৌধুরী, গৌরী মিত্র, মেদিনীপুরে সাধনা পাত্র, বিমলা মাজী, ছায়া বেরা প্রমুখ, বরিশালে মনোরমা বসু, জুঁইফুল বসু প্রমুখ। এছাড়া তথ্য থেকে জানা যায় আরো বেশকিছু মহিলাকর্মী কৃষক রমণীদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[১৬]

পিটার কাস্টার্স তাঁর গ্রন্থ 'উইমেন ইন্ দি তেভাগা আপরাইজিং' গ্রন্থে কৃষক মহিলাদের সংগঠিত হওয়ার পেছনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অবদান কিছুটা স্বীকার করলেও কমিউনিস্ট পার্টির অবদান কিছু ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু একথা সর্বাংশে সত্য নয়। মণিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী, রানী মিত্র, কল্যাণী দাশগুপ্ত, অলকা মজুমদার, গীতা মুখার্জী, কনক মুখার্জী, ইলা মিত্র, মনোরমা বসু, বিমলা মাজী প্রমুখ অনেক মহিলা যাঁরা কৃষক রমণীদের সংগঠিত করেন তাঁরা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। কাজেই বলা যায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নামে বামপন্থী মহিলা কর্মীরা তেভাগা আন্দোলনের সময় কৃষক রমণীদের সমিতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার কাজে বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

স্বাধীনতার পূর্বেই শ্রমিক মেয়েদের নিয়ে সমিতি গড়ে তোলার উদ্যোগ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল। আলোচ্যপর্বে কৃষক মহিলাদের আন্দোলনের পাশাপাশি নারী শ্রমিকদের অধিকার অর্জনের লড়াই তীব্র হতে থাকে। তখনও নারী শ্রমিকরা সংগঠিত হয়নি, তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তারা লড়াই করত—মজুরী বাড়াবার, রেশন বাড়াবার জন্য। মণিকুন্তলা সেনের লেখা থেকে জানা যায় যে, তাঁর বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত এলাকা ছিল বজবজ চটকল এলাকা। এখানকার শ্রমিক মেয়েদের সংগঠিত করতে দীর্ঘদিন ধরে তিনি ঐ অঞ্চলে যাতায়াত করেন এবং ওদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে পরিচিত হন। সমিতি গড়ার পাশাপাশি শ্রমিক মহিলাদের নিয়ে সরকারের কাছে কিছু দাবি দাওয়া পেশ করেন, যে দাবিগুলি সম্পর্কে মহিলারা সচেতন ছিলেন না। এই দাবিগুলি ছিল— ১) সমান কাজে সমান মজুরি, ২) প্রসূতি-ভাতা, ৩) ক্রেশ ও শিশু বিদ্যালয়। কাজের মূল্য নির্ণয়ে কোনও পদ্ধতিই সেইসময় মালিকের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই আটঘন্টা কাজ করা সত্ত্বেও মহিলারা পুরুষদের সমান মজুরি পেত না। আর কারখানাতে মেয়েরা যত বছরই কাজ করত না কেন, তাদের স্থায়ী চাকরি হত না। আর চাকরি স্থায়ী না হওয়ায় প্রসূতিকালীন কোন সার্টিফিকেট ডাক্তারের কাছ থেকে পেত না। সার্টিফিকেট না পাওয়ায় প্রসূতি ভাতা ও ছুটিও মহিলারা পেত না। তাছাড়া,কাজের সময় মহিলাদের বাচ্চাগুলোকে শুইয়ে

রাখতে হত কারখানার ভেতরে চট পেতে। চট পাঁজার ধুলো-ময়লায় বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়ত। ফলে উপযুক্ত ক্রেশের প্রয়োজন ছিল। শ্রমিক মেয়েদের এইসমস্ত দাবি-দাওয়া নিয়ে মহিলা সমিতি এককভাবে লড়াই করলেও দাবি আদায় সহজ না হওয়ায় ট্রেড ইউনিয়নের সাথে মহিলা সমিতি সংযুক্ত হয়।[১৭]

চা বাগানের নারী শ্রমিকদের আন্দোলন এইসময় শুরু হয়েছিল। চা বাগানে নারী শ্রমিক ছিল প্রায় ৪৫শতাংশ। ম্যানেজারকে তারা মাঝে মাঝে দাবি দাওয়া নিয়ে ঘেরাও করত। উল্লেখ করা যায় ডান্‌কান ব্রাদার্সের ডেঙ্গুয়াঝড় চা বাগানের শ্রমিক মেয়েদের কথা। শ্রমিক নেত্রী মাইলী ছত্রী বাগানের ১৮০০ শ্রমিক মেয়েকে নিয়ে আন্দোলন করেন। পুলিশের হাতে ধরা না পড়লেও অনাহারে আসন্ন প্রসবা মাইলী ছত্রীর মৃত্যু হয়। চেঙ্গাইল, বাউড়িয়া, বজবজ ও কামারহাটির মিলের শ্রমিক মেয়েরা ম্যানেজারকে ঘেরাও করেন। ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে, সপ্তাহে একদিন ছুটি আর বোনাসের দাবিতে মেয়েরা আন্দোলন করে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলি বজবজে এক যুক্ত সম্মেলন করে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এই সম্মেলনে মহিলা যোগ দিয়ে নারী শ্রমিকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানায় ও তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৯৪৮খ্রিষ্টাব্দে বিনা বিচারে আটক আইনের প্রতিবাদে ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার জন্য বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস এর কিছু শ্রমিক গ্রেপ্তার হয় এবং কারখানায় লক আউট ঘোষিত হয়। ৯ই আগষ্ট কারখানার গেটে শ্রমিকরা পিকেটিং করে। প্রায় ৩৫০জন নারী শ্রমিক এই পিকেটিং করে। একইভাবে আসানসোলে মেথর শ্রমিকরা ধর্মঘট করে-সঠিক মজুরী, পাকা চাকরী, কোয়ার্টার, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ছুটি ইত্যাদি আদায়ের জন্য। এই ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন বামপন্থী নেত্রী নলিনী দেবী। পুলিশ নলিনী দেবীকে গ্রেপ্তার করতে এলে শ্রমিকরা বাধা দেয়। ফলে পুলিশের পক্ষে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।[১৮]

আলোচ্য সময়কালে নার্স, শিক্ষিকা, উদ্বাস্তু মহিলাদেরও আন্দোলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর নানানস্তরে মহিলাদের এই লড়াই বিশেষ করে শ্রমিক মহিলাদের আন্দোলনের নিরীখে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তাই, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পঞ্চম সম্মেলনের প্রতিবেদনের নাম হয় 'সংগ্রামী মেয়েদের ডাক'। এই সম্মেলনের বিবরণ 'সংগ্রামী মেয়েদের ডাক' নামে এক পুস্তিকায় প্রকাশ করা হয়—যা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।[১৯]সম্মেলন থেকে মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়কে সভানেত্রী এবং রেণু চক্রবর্তী আত্মগোপন করে থাকায় শ্রমিক নেত্রী উমা দেবীকে সম্পাদিকা নির্বাচিত করা হয়।

স্বাধীনতার পর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে মহিলাদের সরকারী নীতি ও কার্যকলাপের বিরোধিতা করার প্রবণতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকায় ১৯৫০সালের ৫ই জানুয়ারি কয়েকটি গণসংগঠনের সাথে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকেও সরকার বেআইনী ঘোষণা করে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রী সংঘ, পিপলস্ রিলিফ কমিটি, কিষান কমিটি, খেদ মজদুর সমিতি, নওজোয়ান লীগের সাথে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও তাদের শাখাগুলির কাজকর্ম বেআইনী ঘোষিত হয়।[২০] এর আগেই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মুখপত্র 'ঘরে বাইরে' , 'জয়া', 'মুক্তির পথে নারী' একে একে বেআইনী ঘোষিত হয় ও বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাই, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসের ১ম সংখ্যায় 'ঘরে বাইরে' পুনরায় প্রকাশিত হওয়ার পর 'আমাদের কথা' - কলামে লেখা হয় — ''মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মুখপত্র 'ঘরে বাইরে' দীর্ঘ সাড়ে তিনবছর পর আবার আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাইয়াছে। ১৯৪৯ সনে সরকার হইতে এই পত্রিকাকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু নারীসমাজের সেবা ও শিশুকল্যাণের কাজে এই সমিতির কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই পত্রিকাটি আবার প্রকাশের পথে বাধামুক্ত হইয়াছে।''[২১]

এইসময় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বন্দীদের ও সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে গড়ে ওঠে 'রাজবন্দীদের মায়েদের কমিটি'। এই কমিটির সভানেত্রী হন বিমল-প্রতিভা দেবী ও সম্পাদিকা উমা সেন। এই কমিটি সরকারের কাছে আবেদন পাঠায় রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সাথে এই কমিটি যৌথভাবে ১৯৪৮সালের ২৭শে এপ্রিল প্রথমে ভারতসভা হলে একটি মহিলাদের সমাবেশ ও পরে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মিছিল করলে চারজন মহিলা নেত্রী লতিকা সেন, প্রতিভা গাঙ্গুলী, অমিয়া দত্ত, গীতা সরকার পুলিশের গুলিতে নিহত হন।[২২] তাই পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ২৭শে এপ্রিল দিনটিকে জাতীয় দিবস হিসাবে পালন করার জন্য রাজবন্দীদের মায়েদের কমিটি একটি আবেদন প্রচার করে। ১৯৫০ সালের ২১শে এপ্রিল 'মতামত' পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। আবেদনে বলা হয় —''আমরা বাংলার রাজবন্দীদের মায়েদের কমিটির তরফ থেকে আগামী ২৭শে এপ্রিল জাতীয় দিবস পালন করার জন্য সমস্ত প্রগতিশীল জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা শত শত মায়েরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে আজ দলমত নির্বিশেষে বাংলার সমস্ত গণতন্ত্রকামী নারী পুরুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি— ২৭শে এপ্রিল শহীদ লতিকা, প্রতিভা, অমিয়া, গীতার পূণ্যস্মৃতিতে দেশজোড়া শোকদিবস পালন করে আপনার গণতন্ত্রের সংগ্রামকে বলিষ্ঠ করুন। ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষায় বাংলার শত শত মায়েদের সঙ্গে আপনিও প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠুন—রাজবন্দীদের বক্সার পাঠানো কোনমতেই চলবে না।

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই।"[২৩]

প্রেসিডেন্সি জেলে মহিলা বন্দীদের উপর অত্যাচারে প্রতিবাদে ১৯৫০খ্রি: ২৬শে মে রাজবন্দীদের মায়েদের কমিটির সভানেত্রী বিমল প্রতিভা দেবী একটি আবেদন প্রচার করেন। আবেদনে বলা হয়—"বাংলার জেলে জেলে হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ কারারুদ্ধ হয়ে আছে, তাহাদের উপর জুলুম যে কতপ্রকারে বাড়িয়া উঠিয়াছে, আমরা জনসাধারণের অবগতির জন্য তাহার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। দক্ষিণ বাংলার আসমানি আট মাসের গর্ভবতী, তাহাকে ও তাহার মাতা হাসিনাকে ডায়মণ্ডহারবারের কোর্টে হাজির করে।... হাসিনাকে প্রথম শ্রেণি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু আট মাসের গর্ভবতী আসমানীকে এখনও তৃতীয় শ্রেণির কয়েদীদের সহিত রাখা হইয়াছে। ...আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম প্রেসিডেন্সি জেলে ছাত্রী কর্মী মমতা সেন কলিক রোগে শয্যাগত, মহিলা নেত্রী নলিনী দেবী, অশ্রু হালিম কঠিন রোগে আক্রান্ত। ...আমরা আরো অবগত হইয়াছি প্রেসিডেন্সি জেল হইতে রাজবন্দীদের গত সপ্তাহ হইতেই দমদম হইয়া সুদূর বক্সার ক্যাম্পে পাঠানো হইতেছে।... বক্সার নির্বাসনের বিরুদ্ধে জেলের ভিতরে ও বাইরে বন্দীদের সহিত এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবিতে আপনাদের প্রতিবাদ তুলুন।"[২৪]

সমস্ত স্তরের মানুষের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১৯৫১সালের ১১ই মে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে কলকাতা হাইকোর্ট আইনসিদ্ধ ঘোষণা করে এবং একে একে রাজবন্দীদেরও মুক্তি ঘটে। যেমন কলকাতার কনক মুখার্জী, প্রীতি রায়, কমলা মুখার্জী, আরতি গুপ্তা, অনিলা মুন্সী, হুগলীর সন্ধ্যা চ্যাটার্জী, নৈহাটির অঞ্জলি সোম, মেদিনীপুরের অঞ্জলি ব্যানার্জী, বিমলা মাজী, ২৪ পরগণার শোভনা দত্ত, তৃপ্তি দাশগুপ্তা প্রমুখ জেল থেকে মুক্তি পান।[২৫] সমিতির পক্ষে লীলা মজুমদার, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, গীতা মল্লিক, অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা হুই, আর্যবালা দেবী, ইলা বসু, গীতা মুখোপাধ্যায়, অশ্রু দাস এক বিবৃতিতে মেয়েদের এক সমিতির মধ্যে সংগঠিত হবার জন্য আহ্বান জানান[২৬]।

স্বাধীনতার পর বাংলার বামপন্থী মহিলাদের সাংগঠনিক অবস্থা কিছুটা উপলব্ধি করা যায় ১৯৫১সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম রাজ্য সম্মেলনে উত্থাপিত মহিলা ফ্রন্ট সম্পর্কে প্রস্তাব থেকে[২৭]। প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় ১৯৪২ সালে দুর্ভিক্ষের সময় মহিলাদের সংগঠনের মধ্যে ৪২হাজার মহিলা সংঘবদ্ধ হন। কিন্তু শুধুমাত্র খাদ্য আন্দোলন ও কুটিরশিল্প গঠনের কাজে এই ব্যাপক সমাবেশকে সীমাবদ্ধ রাখার ফলে ক্রমশ নারী আন্দোলন দুর্বল হতে থাকে। তাছাড়া

সাংগঠনিক যথেচ্ছাচারের পাশাপাশি আন্দোলন সম্বন্ধে মহিলা নেতৃত্বদের অভিজ্ঞতার অভাবও সংগঠন ভেঙ্গে যাওয়ার অন্যতম কারণ। আন্দোলনে হঠকারিতার অন্যতম নিদর্শন ১৯৪৯ সালের ২৭শে এপ্রিল ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মহিলাদের মিছিল—যার ফলে চারজন মহিলা নেত্রী নিহত হন। পর্যালোচনাতে বলা হয় "যে কোন আন্দোলনের ইস্যু এলেই ডি.সি. থেকে মহিলা ফ্রাকশনের মিটিং ডেকে তাদের কাজের কোটা ও দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সভা শোভাযাত্রাগুলিতে অধিক পরিমাণ মহিলাদের নিয়ে যাবার কোটা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। সম্মেলনগুলিতে (রেল, ক্ষেতমজুর, ছাত্র ও শান্তি) স্বেচ্ছাসেবিকা পাঠানো, প্রতিনিধিদের থাকার জায়গা দেওয়া এবং সম্মেলনের প্রচার করা প্রভৃতির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, জেলা কমিটির দেয় তহবিল বাড়াবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়েছে। কিন্তু তাদের ফ্রন্টের অবস্থা কি, পার্টি সভ্য বাড়ছে না কমছে, গণসংগঠন আছে না ভেঙ্গে গেছে এসমস্ত ব্যাপারে মোটেই নজর দেওয়া হয় নাই। অন্যান্য ফ্রন্টের মতই মহিলা ফ্রন্টেও গণ আন্দোলন পরিচালনা করা হয়েছে মহিলাদের নিজস্ব কোন গণদাবির ভিত্তিতে নয়। যে সমস্ত পার্টি সারকুলার দেওয়া হতো তারই ভিত্তিতে গণপ্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালনা করা হতো। তাই, প্রতিটি গণপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব দৈনন্দিন যে সমস্ত কাজকর্ম থাকে এখানে আস্তে আস্তে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলা চলে। এইভাবে সাধারণ মহিলাদের কাজ হতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বস্তির সাধারণ মহিলা থেকে আরম্ভ করে উচ্চমধ্যবিত্ত মহিলা পর্যন্ত যখন হাজারো রকমের সমস্যায় ভারাক্রান্ত হয়ে পথ হাতড়াচ্ছে আমরা তখন আশু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রঙিন স্বপ্ন দেখছি। অথচ সাধারণ দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে ঐ অগণিত সাধারণ মহিলাদের মহিলা 'আত্মরক্ষা' সমিতিকে টেনে আনা সম্ভব ছিল"[২৮]। মহিলা ফ্রন্টের পর্যালোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করা হয় যে, জেলা কমিটির সভ্যাদের মধ্যে মহিলা আন্দোলন সম্বন্ধে কেউই অভিজ্ঞ ছিলেন না। কি তাদের দাবি, কিই বা তাদের সমস্যা— এ সম্বন্ধে ২/৪টি ভাসা ভাসা ধারণা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই মহিলারা বুঝতেন না। অথচ কলকাতার অন্যান্য আন্দোলন অপেক্ষা মহিলা আন্দোলনের ব্যাপকতা কোন অংশেই কম ছিল না। পর্যালোচনাতে আরো বলা হয় মহিলা আন্দোলনের উপরে শুধু মহিলাদের চেতনাই কম নয়, সাধারণভাবে সমগ্র পার্টির চেতনাও খুব নিম্নস্তরের। মহিলা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি তাচ্ছিল্যের মনোভাবও মহিলা সমিতির সংগঠন গড়ে না ওঠা এবং দুর্বল হওয়ার অন্যতম কারণ। মহিলা সংগঠনের এই দুর্বলতা দূর করার জন্য সম্মেলনে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে, মহিলা ফ্রন্ট একমাত্র মহিলাদের কাজ বলে যে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে তার অবসান

ঘটানো জরুরী। পাশাপাশি অন্যান্য মহিলা সাথে বিভিন্ন ইস্যুতে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়। যেহেতু ভারতের অধিকাংশ মেয়েরা অসংগঠিত অবস্থায় ছিল তাই বামপন্থী মহিলাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ও যুক্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক মহিলা সংগঠন গড়ে উঠবার বাস্তব ভিত্তি তৈরি হতে পারে বলে আশা করা হয়।[২৯]

তাই, দেখা যায় ১৯৫২খ্রিষ্টাব্দে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর মহিলারা যৌথ আন্দোলন গড়ার উপর জোর দেন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ৩-৪ মে কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ষষ্ঠ সম্মেলনে সম্পাদিকা রেণু চক্রবর্তীর পাঠ করা সম্পাদকীয় প্রতিবেদন থেকে সমিতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত লক্ষ্যের একটি রূপরেখা পাওয়া যায়। প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এইসময় সমিতির সদস্যসংখ্যা ছিল আটহাজার ও প্রাথমিক কমিটি ছিল ৪৫টি।[৩০] অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমিতির যে শক্তি ছিল তা অনেক কমে যায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী গীতা মল্লিক-এর বক্তব্য থেকে জানা যায় ১৯৫০খ্রিষ্টাব্দে-১৯৫২খ্রিষ্টাব্দে দুবছর সমিতি বেআইনি হবার ফলে সমিতির সাথে নারীসমাজের যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় এই শক্তি কমার অন্যতম কারণ। অতীতের সেই শক্তিকে ফিরিয়ে আনার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি অনগ্রসর পশ্চাৎপদ নারীসমাজকে আন্দোলনে নিয়ে আসার লক্ষ্যের কথা বলা হয়। সম্মেলন থেকে সভানেত্রী নির্বাচিত হন প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সহ সভানেত্রী শোভা হুই ও মিসেস সালেহা গণি, সম্পাদিকা-রেণু চক্রবর্তী ও সহ-সম্পাদিকা-কমলরানী বসু ও বেলা লাহিড়ী, কোষাধ্যক্ষ-লাবণ্য মিত্র।

১৯৫২খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কেন্দ্রে জওহরলাল নেহেরুর প্রধানমন্ত্রীত্বে এবং পশ্চিমবঙ্গে ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারের কাছ থেকে এইসময় বিভিন্ন দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে পুরুষদের সাথে সাথে মহিলারা যুক্তভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকেন। জানাযায় যে,তারই ফলে ১৯৫৩সালের ১২এপ্রিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মহিলা নেত্রীরা কলকাতায় একটি বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সর্বদলীয় মহিলা সংযোগ কমিটি গঠন করা হয়। নারীদের বিভিন্ন দাবী নিয়ে এই কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত হয়। কমিটির যুগ্ম আহ্বায়িকা হন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষে কমিউনিস্ট নেত্রী কমলা মুখার্জী ও বলশেভিক পার্টির পক্ষে সুধা রায়। কমিটির মধ্যে সোস্যালিস্ট পার্টি আর.এস.পি, আর.সি.পি.আই., এস.আর.পি., এস.ইউ.সি.,

বলশেভিক পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা এবং নির্দলীয় মহিলা প্রতিনিধিরা ছিলেন। নারীদের বিভিন্ন দাবি বিশেষত খাদ্য পরিস্থিতির উপর যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করে এই কমিটি।

আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন ও বাংলার বামপন্থী মহিলারাঃ

স্বদেশের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের পাশাপাশি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাধ্যমে বামপন্থী মহিলারা আন্তর্জাতিক নারী সংগঠনের সঙ্গেও নিজেদের যুক্ত করেন বলে জানা যায়। ১৯৪১ সালের জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর ফ্যাসিস্ট জার্মানীর আক্রমণের পটভূমিকায় বাংলার কমিউনিস্টদের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি। মৈত্রী আন্দোলনের এই ধারাপথেই কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ১৯৫১সালের ১২ ফেব্রুয়ারি চীন-ভারত মৈত্রী সংঘ গঠিত হয়েছিল। এই সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন ত্রিপুরারী চক্রবর্তী। এই কমিটির মধ্যে ছিলেন সত্যেন বসু, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, সুপ্রভা দেবী, ও.সি গাঙ্গুলী, প্রবোধ বাগচী, সত্য বাগচী, সত্যেন মজুমদার, বিবেকানন্দ মুখার্জী, মোহিত মৈত্র প্রমুখদের সাথে গীতা মল্লিক[৩১]।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিদেশের মহিলা সংগঠনের সঙ্গে বাংলার বামপন্থী মহিলারা যে যোগাযোগ রেখে চলতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২৫.৯.১৯৫২ তারিখে গীতা মুখার্জীর লেখা মস্কোতে সোভিয়েত মহিলাদের অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট কমিটির নেত্রী এন. পারভেনোভাকে পাঠানো এক চিঠি থেকে। এই চিঠিতে বাংলার নারী আন্দোলন ও সংগঠনের এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। ১৯৫৩ সালের ৫-১০ জুন ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন-এ বিশ্বনারী সংঘের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা ও শিশুর সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে মেয়েদের কর্তব্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য এই সম্মেলন আহ্বান করা হয়।

আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রী মহিলা ফেডারেশন পৃথিবীর সমস্ত মহিলাদের এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানায়। বিশ্ব নারী সংঘের এই আহ্বানকে বাস্তবায়িত করার জন্য মে মাসে পশ্চিমবাংলায় একটি প্রাদেশিক সম্মেলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তাঁর আগে বিভিন্ন জেলা বা এলাকাতে সম্মেলন করে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যাতে এই সম্মেলনে আসেন তাঁর ব্যবস্থা করা হয়। সম্মেলন গুলোর প্রস্তুতির জন্য ৮ই মার্চ 'আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে' সভায়, মিছিলে,

পোস্টারে নারী ও শিশুর দাবীগুলোকে দেশব্যাপী প্রচার করা এবং শান্তির জন্য সই সংগ্রহ করার মত কর্মসূচী নেওয়া হয়।[৩২]

ডেনমার্ক সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বে পশ্চিমবাংলা সহ বিভিন্ন রাজ্যে প্রস্তুতি সম্মেলন হয়এবং তারপর দিল্লীতে একটি সর্বভারতীয় প্রস্তুতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ০৩.০৫.১৯৫৩ তারিখে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বিশ্বনারী সম্মেলনের জন্য বাংলা প্রাদেশিক প্রস্তুতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুসূয়া বাঈ জ্ঞানচাঁদ সভাপতিত্ব করেন। দুইশত জন পুরুষ এবং পাঁচশত জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত বামপন্থী নেত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন— রেণু চক্রবর্তী, মণিকুন্তলা সেন, কমলা মুখার্জী, বেলা লাহিড়ী, মুক্তি মিত্র, পঙ্কজ আচার্য, নির্ম্মলা সান্যাল, গীতা মুখার্জী, কল্পনা যোশী প্রমুখ। এছাড়া, বিমল প্রতিভা দেবী,অনিমা মুন্সী, পুষ্পময়ী বসু প্রমুখও ছিলেন। বক্তারা সকলে শিশুদের উন্নয়ন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে মহিলাদের অগ্রগতির কথা বলেন।[৩৩]

১৯৫৩খ্রিষ্টাব্দে ৯ই এবং ১০ই মে বিশ্বনারী সম্মেলনের জন্য সারা ভারত প্রস্তুতি সম্মেলন হয় দিল্লীতে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ৩১৫জন প্রতিনিধি এই প্রস্তুতি সম্মেলনে যোগদান করেন। পশ্চিমবাংলা থেকে প্রতিনিধি যান ৭০জন[৩৪]। দিল্লী সম্মেলন থেকে ডেনমার্কে বিশ্বনারী সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ভারত থেকে ২৬ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন— যাঁদের মধ্যে কয়েকজন বামপন্থী মহিলা নেত্রী ছিলেন।[৩৫] ভারতের সাংসদ সদস্যা অ্যানি ম্যাসিকারিনীর নেতৃত্বে লোকসভার সাংসদ রেণু চক্রবর্তী, পুষ্পময়ী বসু, অনুসূয়া বাঈ জ্ঞান চাঁদ, হাজরা বেগম, অঞ্জলি মুখার্জী, পঙ্কজ আচার্য প্রমুখ প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

বিশ্বনারী সম্মেলনের অন্যতম প্রতিনিধি ও ভারতীয় লোকসভার সদস্যা রেণু চক্রবর্তী কোপেনহেগেন থেকে ফিরে এসে লিখলেন— "মহিলা আন্দোলনের যে ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লাভের নিদর্শন পেলাম কোপেনহেগেন সম্মেলনে— তার থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে এই আন্দোলন কখনও একটি দল বা মতের আন্দোলন হতে পারে না। কিন্তু নানান ধারার মত ও পথের লোক, নারী ও শিশুর অধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার আগ্রহে যে উল্লেখযোগ্য ঐক্যসাধন করেছিল সেইটাই হল কোপেনহেগেন সম্মেলনের বিরাট সাফল্য।"[৩৬]

কোপেনহেগেন সম্মেলন থেকে ফিরে এসে প্রতিনিধিরা সম্মেলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় সভা করেন। যেমন- অঞ্জলি মুখার্জী ৮টি সভা করেন। বালিগঞ্জে ৪টি,

বজবজে, টালিগঞ্জে, '৫২ক্লাবে ও হেয়ার স্কুলে' এইসমস্ত সভায় স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণির শ্রোতা সমবেত হন।[৩৭] প্রতিনিধিদের মধ্যে বামপন্থী নেত্রী পঙ্কজ আচার্য ১৫টি সভা করেন নিম্নমধ্যবিত্ত, বাস্তুহারা প্রভৃতি এলাকায়। বদরতলা,সানগর, বালিগঞ্জ, গৌরীবাড়ী, কোন্নগর, বরাহনগর, বজবজ, বেলেকাটা, খিদিরপুর, শহীদনগর, বেহালা, মধ্যমগ্রাম প্রভৃতি স্থানে সভা হয়। অতি অল্প সংখ্যক থেকে ৫০০জন পর্যন্ত সভাগুলিতে উপস্থিত থাকেন। সভাগুলিতে বিভিন্ন দেশের নারীদের কথা ও শান্তি আন্দোলনের তাদের ভূমিকা এ দেশের নারীদের উৎসাহিত করে বলে জানা যায়।[৩৮]

কোপেনহেগেন বিশ্বনারী নারী সম্মেলনের পর ভারতের বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সর্বভারতীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও রাজ্যস্তরে একটি পশ্চিমবঙ্গ কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়। মূলত বিশ্বনারী সংঘের শাখা হিসাবেই এগুলি গড়ে উঠে। সর্বভারতীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়িকা হন অনুসূয়া বাঈ জ্ঞানচাঁদ ও হাজরা বেগম। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়িকা হন মণিকুন্তলা সেন ও অঞ্জলি মুখার্জী। সর্বভারতীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে ১৯৫৪ সালের ৪-৭ জুন কলকাতা ইউনিভার্সিটি হলে একটি জাতীয় মহিলা সম্মেলন হয়। উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সমস্ত রাজ্যের বিভিন্ন মহিলা সংগঠনগুলিকে নিয়ে একটি সর্বভারতীয় মহিলা সংগঠন গঠন করা— যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বনারী সংঘের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকবে। তাই এই সম্মেলনেই গঠিত হয় 'ভারতীয় জাতীয় মহিলা ফেডারেশন' (National Federation of Indian Women)। পশ্চিমবঙ্গের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সহ ১৪টি সংগঠন এবং অন্যান্য রাজ্যের অনেক সংগঠনই এর সাথে যুক্ত হয়। ভারতীয় জাতীয় মহিলা ফেডারেশনের নেত্রীত্বে পশ্চিমবঙ্গের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অনেক নেত্রী যুক্ত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য ছিলেন— রেণু চক্রবর্তী, মণিকুন্তলা সেন, বেলা লাহিড়ী, পঙ্কজ আচার্য, কনক মুখোপাধ্যায়, আর্যবালা দেবী, শোভা হুই, সন্ধ্যা চ্যাটার্জী, গীতা মুখার্জী, বাণী দাশগুপ্ত প্রমুখ।[৩৯]

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বামপন্থী মহিলারা ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে নিজেদের যুক্ত করেন বলে জানা যায়। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে মাদ্রাজে সারা ভারত শান্তি ও এশীয় সংহতি সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৪জন মহিলা প্রতিনিধি যোগ দেন— যাঁদের মধ্যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রতিনিধি পঙ্কজ আচার্য ছিলেন। সম্মেলন থেকে ফিরে এসে 'ঘরে বাইরে' - তে লিখলেন ".. প্রত্যেকটি প্রদেশের ফেস্টুনসহ

প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা চলেছেন দলে দলে... ১০,০০০ লোকের কি বিরাট শোভাযাত্রা .....সবাই সম্মেলন থেকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার বুকভরা সংকল্প নিয়ে ফিরলাম।"[৪০]

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় ভারত-চীন মৈত্রী সম্মেলন হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে এশিয়ার মুক্তির ঘোষণা। এই সম্মেলনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রতিনিধিরা অংশ নেন বলে জানা যায়। আন্তর্জাতিক স্তরে পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল বিশ্বমাতৃসম্মেলন। ১৯৫৫ সালের ৯-১৫ফেব্রুয়ারি জেনেভা শহরে বিশ্বনারী সংঘের কাউন্সিল সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় ৪৫টি দেশের একশতজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। ভারতের মহিলা ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সভানেত্রী পুষ্পময়ী বসু, যুগ্ম সম্পাদিকা হাজরা বেগম ও হায়দ্রাবাদের কমলা আরাতুলা এই অধিবেশনে যোগ দেন। এই অধিবেশনেই বিশ্বশান্তির জন্য একটি বিশ্বমাতৃসম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত হয়। অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৫৫ সালের ৭-১০জুলাই সুইজারল্যাণ্ডের সুসান শহরে সারা বিশ্বের মায়েদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশ্বমাতৃসম্মেলন আহ্বান করা হয়।

বিশ্বমাতৃসম্মেলন সম্পর্কে ভারতের জাতীয় ফেডারেশনের পক্ষে হাজরা বেগম, অনুসূয়া জ্ঞানচাঁদ নিউ দিল্লী থেকে ১১.৭.১৯৫৫ তারিখে 'স্বাধীনতা' পত্রিকাকে একটি রিপোর্ট দেন। চিঠিটি ১৩.৭.১৯৫৫ তারিখে পার্কস্ট্রিট পোস্ট অফিস থেকে পুলিশ গ্রহণ করে। এই রিপোর্ট থেকে জানা যায় পৃথিবীর ৬৭টি দেশের প্রতিনিধি সমবেত কণ্ঠে পারমানবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং ভবিষ্যতে শিশুদের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রস্তুতি কমিটিতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক মহিলা ফেডারেশনের (WIDF) সভানেত্রী এবং ফ্রান্সের মহিলা ইউনিয়নের সভানেত্রী ম্যাডাম কটন, পশ্চিম জার্মানীর মহিলা শান্তি কমিটির গ্রেজিম্যান, লেবানন থেকে ওয়াদিয়া এ্যাবন ইসমাইল, ব্রাজিল থেকে ফিয়ালহো, জাপান থেকে হিরাটসুকা, নাইজেরিয়া থেকে রাসোমী কুটি, জার্মানী থেকে লিলি ওয়াচটার এবং চীন থেকে ম্যাডাম টিসাউমেনি চুয়ান। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বিশিষ্ট কিছু মহিলা অভিনন্দন বাণী পাঠান। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বেলজিয়ামের রানী, ম্যাডাম জলিস্ট কুরি, ম্যাডাম আন্না সেগহারস্, ম্যাডাম ওলঘালেপি চিনস্কা, ম্যাডাম সোনিচিং লিং এবং রাজকুমারী অমৃত কাউর প্রমুখ।[৪১]

ভারত থেকে বিশ্বমাতৃসম্মেলনে চল্লিশজন প্রতিনিধি আটটি রাজ্য থেকে এবং আটটি

বিভিন্ন নারী সংগঠন থেকে প্রতিনিধিত্ব করতে দিল্লী থেকে বিশেষ বিমানে ১৯৫৫ সালের ৩রা জুলাই রবিবার ৯.৫০মিনিটে রওনা দেন। জাতীয় মহিলা ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দুটি নীতি উপস্থাপিত করার সিদ্ধান্ত হয়। নীতি দুটি হল— পঞ্চশীল নীতি এবং বান্দুং সম্মেলন। এছাড়া, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, বিভিন্ন প্রকার রোগ এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কিভাবে সমস্যা সৃষ্টি করছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এছাড়া ভবিষ্যতে এশিয়া মহিলা সম্মেলনের ধারণা বাস্তবায়িত করার উপর জোর দেওয়া হয়। বিশ্বমাতৃসম্মেলনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে যে সমস্ত প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন—

বোম্বে - নোবেল র‍্যালি, সরলাবাঈ দেওধর, কৃষ্ণা বাঈ কপ্পিকর, অখিলা শঙ্কর, সীতা মুখার্জী, আনন্দীবাঈ বিজাপুরা, চারুলতা গোখলে।

দিল্লী - চিত্রা সেন, শীলা গুজরাল, স্বাতী সেন, অনুসূয়া জ্ঞানচাঁদ, হাজরা বেগম।

হায়দ্রাবাদ - জামালউন্নিসা বেগম।

টি.সি.- অ্যানি যোসেফ, আন্নামা থমাস।

মহারাষ্ট্র - মীনাক্ষীবাঈ সেন, সরস্বতী বাঈ কির্লোস্কার।

উত্তরপ্রদেশ - সাদিকা সারান।

বাংলা - ব্রহ্মকুমারী রায়, অরুণা মুন্সী।

মৈত্রী সেন, মাধুরী ঘোষ, বিভা সরকার, চিত্রা রায়, নন্দরানী ব্যানার্জী, লিলি দত্ত, মীনা দাশগুপ্ত, বীণা ভট্টাচার্য, ভানু দাশগুপ্তা, সুষমা সেনগুপ্তা, সবিতা বোস, মণিকুন্তলা সেন, মুক্তা কুমার, গীতা ঘোষ, অমিয়া ঘোষ, ঊষা গুপ্তা, আসান গাঙ্গুলী, রেবা রায় চৌধুরী, কনক মুখার্জী, সুরুচি সেনগুপ্তা।

আসাম - অর্চনা সিরকার প্রমুখ।[৪২]

বাংলা থেকে যে সমস্ত প্রতিনিধি যান তাঁদের মধ্যে বামপন্থী মহিলারাও ছিলেন। যেমন মণিকুন্তলা সেন, মুক্তা কুমার, রেণু চক্রবর্তী, গীতা মুখার্জী প্রমুখ।[৪৩] এই সম্মেলনে একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হয় এবং সেটি বিশ্বের দেশে দেশে প্রচার করা হয়। ঘোষণাপত্রে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয় এবং শান্তির স্বপক্ষে সকলকে সমবেত করার আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলন শেষে প্রতিনিধিদের একাংশ সোভিয়েত সফরে যান। মৈত্রেয়ী দেবী ছাড়া বেশীরভাগই ছিলেন কমিউনিস্ট নেত্রী। সোভিয়েত দেখে প্রতিনিধিরা অভিভূত হন। তবে সোভিয়েতের যে সমস্ত কিছু ভাল নয় তা স্বীকার করেন সোভিয়েতের প্রতিনিধি তানিয়া। এরপর ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে বিশ্বনারী সংঘে ভারতীয় সেক্রেটারি হিসাবে একজন মহিলা প্রতিনিধি চাওয়া হয়। বাণী দাশগুপ্ত

যান। তিনি সেখানে পাঁচ-ছয় বছর কাজ করেন।[৪৪]

বিশ্বমাতৃসম্মেলনের সার্থকতা কতখানি এবং ভারত তথা বাংলার বামপন্থী মহিলাদের এই সম্মেলন কতটা অনুপ্রাণিত করেছিল তা মণিকুন্তলা সেনের বর্ণনা থেকেই উপলব্ধি করা যায়। বিশ্বমাতৃসম্মেলন থেকে ফিরে এসে 'ঘরে বাইরে'-তে লেখেন, "মাতৃ সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়াইয়া আমেরিকার মা ও কোরিয়ার মা, বৃটিশ মা দক্ষিণ আফ্রিকার মা যখন পরস্পর আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া পরস্পরের সন্তানের কল্যাণে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন রাজরোষ বা রাজশক্তির দম্ভ যে কত ব্যর্থ, কত অকিঞ্চিৎকর, যুদ্ধের আয়োজন যে হাস্যকর তাহাই পরিস্ফুট হয়। বিশ্বনারী আন্দোলনের লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্য যেন এক স্বর্গীয় পরিবেশ রচনা করে, নারী আন্দোলনের আন্তর্জাতিকতা সার্থক রূপ পরিগ্রহ করে। ... ভারতবর্ষের প্রগতিশীল নারী আন্দোলনও তাহার ক্রমবর্ধমান সংঘশক্তি লইয়া এই আন্তর্জাতিক নারীশক্তির সহিত মিলিত হইতেছে ইহা পরম আশা ও ভরসার কথা।"[৪৫]

সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি:

আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি নিজেদের সাংগঠনিক শক্তিকে শক্তিশালী করার দিকে নজর দেন বাংলার মহিলারা। ১৯৫৪ সালের ৩রা-৫ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সপ্তম সম্মেলনের আগে স্থানীয় এবং জেলাভিত্তিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থাপিত বিষয় থেকে তৎকালীন সময়ে আন্দোলনের কর্মসূচীর বিষয়গুলি সম্পর্কেও অবগত হওয়া যায়। পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত মেদিনীপুর জেলার গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে ৩০.০৩.১৯৫৪ সন্ধ্যে থেকে ১৯০৪ সালের ৩১শে মার্চে সকাল পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির স্ত্রী একাদশ বার্ষিক সম্মেলন হয়। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা বেলা লাহিড়ী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। ৩১.০৩.১৯-৫৪ তারিখে সমাবেশ হয় তমলুক শহরে বেলা লাহিড়ীর সভানেত্রীত্বে। গীতা মুখার্জী (বিশ্বনাথ মুখার্জীর স্ত্রী) এবং আশা ঘোষ বক্তব্য রাখেন। মহিলাদের কাজ, প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য নার্সিংহোম এবং বর্গাদারদের উপর জোতদারদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তারা বক্তব্য রাখেন। গীতা মুখার্জী জনসাধারণকে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।[৪৬]

১৯৫৪ সালের ২রা এপ্রিল হুগলী জেলার ADIO-এর রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে হুগলী জেলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন ২৭শে এবং ২৮শে মার্চ চুঁচুড়াতে

অনুষ্ঠিত হয়। ২৭.৩.১৯৫৪ তারিখে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অফিস অন্তারবাগানে সম্মেলনের সূচনা হয়। তিনশতজন প্রকাশ্য সমাবেশে ছিলেন— যাঁদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিলেন মহিলা। ২৮.০৩.১৯৫৪ তারিখে দাসপাড়া ময়দানে কমল রানী বসুর সভাপতিত্বে প্রকাশ্য সমাবেশ হয়। নেতৃত্বদের মধ্যে ছিলেন মণিকুন্তলা সেন, সন্ধ্যা চ্যাটার্জী, বুড়াশিবতলার মুক্তা কুমার, বৈদ্যবাটির পারুল রায়চৌধুরী এবং ভদ্রেশ্বরের দক্ষবালা দাসী প্রমুখ। বক্তারা সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের সমানাধিকার কেন প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করেন। শিক্ষা, কর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা সংগঠিত হওয়া ও লড়াই করার কথা বলেন এবং সরকারের অর্থনীতির সমালোচনা করেন। সর্বোপরি পাকিস্তান ও আমেরিকার সামরিক নীতির সমালোচনা করে বিশ্বশান্তির দাবি তোলেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন সন্ধ্যা চ্যাটার্জী, মুক্তা কুমার, পারুল রায়চৌধুরী এবং দক্ষবালা দাসী।[৪৭]

স্থানীয় ও জেলাভিত্তিক সম্মেলনের পর ১৯৫৪ সালের ৩রা-৫ই এপ্রিল কলকাতায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সপ্তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মূলত বামপন্থী মহিলারাই নেতৃত্ব দান করেন বলে জানা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে ৮নং কৈলাস বোস স্ট্রিটে প্রতিনিধি সম্মেলন হওয়ার পরে কলকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে প্রকাশ্য সম্মেলন হয়। কলকাতা, ২৪পরগণা, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, দার্জিলিং, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি ১৪টি জেলা থেকে প্রায় দুশো প্রতিনিধি উপস্থিত হন। সেই সময় সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল আঠারো হাজার। সম্পাদিকা কনক মুখার্জীর পেশ করা রিপোর্ট থেকে ১৯৫২-৫৪ সালের মহিলাদের কাজের উল্লেখযোগ্য দিকগুলি সম্পর্কে জানা যায়। খাদ্য ও রিলিফের আন্দোলন, নারীর সামাজিক অধিকারের আন্দোলন, শান্তি আন্দোলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমিতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা জানা যায়। রিপোর্ট থেকে জানা যায় এইসময়ে কৃষক মহিলাদের মধ্যে মহিলা সংগঠন যেমন প্রসারিত হয় তেমনই শ্রমিক নারীদের মধ্যে চটকল নারী শ্রমিকরা সংগঠনে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি থেকে মহিলাদের কাজ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞাত হওয়া যায়। গৃহীত প্রস্তাবাবলী ব্যাখ্যা করেন গীতা মুখার্জী। শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ভবিষ্যতকে সুনিশ্চিত করা, নারীর অধিকার গুলি রক্ষার জন্য বিশ্বশান্তি আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মণিকুন্তলা সেন। গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বেকারীর ভয়াবহতার বিরুদ্ধে নারীর কর্মসংস্থানের আন্দোলন, আইন করে ছাঁটাই বন্ধ, মেয়েদের কারিগরী

শিক্ষা, কুটির শিল্পের প্রসার, উপার্জনহীন নারীদের জন্য বেকার ভাতার দাবি ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ দাবি ইত্যাদি। সপ্তম সম্মেলনে নির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পদাধিকারীরা বেশীরভাগই ছিলেন বামপন্থী নেত্রী। যেমন সভানেত্রী নির্বাচিত হন আর্যবালা দেবী, সহ-সভানেত্রী মীরা সেন, মায়া চট্টোপাধ্যায়, শোভা হুই, নির্মলা সান্যাল, রেণু চক্রবর্তী। সম্পাদিকা বেলা লাহিড়ী, সহ-সম্পাদিকা- সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায় ও কমলরানী বসু, কোষাধ্যক্ষ- লাবণ্য মিত্র, অফিস সম্পাদিকা - শান্তি দেবী। অন্যান্য সদস্যরা হলেন — মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, মণিকুন্তলা সেন, কমলা মুখার্জী, কনক মুখার্জী, তিলোত্তমা ভট্টাচার্য্য, মনোরমা পাকড়াশী, গীতা মল্লিক, পঙ্কজ আচার্য, মাধুরী দাশগুপ্ত, বাণী দাশগুপ্ত, গীতা মুখার্জী, সাধনা পাত্র, শচী বিশ্বাস, নিরুপমা চ্যাটার্জী, দুখমন বিবি, বাকুসুদাবেগম প্রমুখ। কর্মসমিতির সদস্যাদের নামের তালিকায় যেহেতু বেশীরভাগ নেত্রীই ছিলেন বামপন্থী তাই বলা যেতে পারে যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি মূলত এইসময় নিয়ন্ত্রিত হত বামপন্থীদের দ্বারাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় দলমত নির্বিশেষে মহিলারা সংগঠনটি গড়ে তুললেও ধীরে ধীরে সমিতির নেতৃত্ব চলে আসে বামপন্থীদের হাতে।[৪৮]

এই সময় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ইতিহাসে একটি অন্যতম ঘটনা ছিল সমিতি পরিচালিত 'ঘরে বাইরে' পত্রিকার নবপর্যায়ে পথ চলা। ১৯৪৯ সালে সরকারের পক্ষ থেকে এই পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন পর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে (১৩৫৯ সালের ফাল্গুন মাসে) পত্রিকাটি পূর্ণাঙ্গ মাসিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় বিশ্বনারী সঙেঘর সম্পাদিকা ভায়লাঁ কুতুরিয়ে শুভেচ্ছা বাণীতে লেখেন— " 'ঘরে বাইরে' পত্রিকার প্রকাশনা উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারীসঙেঘর আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। শিশুদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবন নারীজাতির অধিকার রক্ষার জন্য এবং শান্তির জন্য আপনারা যে কাজ করে যাচ্ছেন সে কাজের সাফল্য কামনা করি।"[৪৯] দীর্ঘ সাড়ে তিনবছর পর আবার আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়ে সম্পাদকীয়তে নারীমুক্তি সংগ্রামের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা ও আদর্শনিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে পথ চলার কথা ঘোষণা করা হয়। তথ্য থেকে জানা যায় সমিতি ও পত্রিকার উদ্যোক্তা ও পরিচালিকাদের মধ্যে প্রধানত ছিলেন বামপন্থী মহিলারা।[৫০]

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অষ্টম প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। তার আগে স্থানীয় ও জেলা ভিত্তিতে কিছু কিছু সম্মেলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, মেদিনীপুর জেলায় ১৯৫৫ সালের ৬ই মে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির

সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রায় দু'হাজার মহিলার সমাবেশ হয়। নির্মলা সান্যাল সভা নেতৃত্ব করেন। বিমলা মাজী, জনা সামন্ত, কমলা মাইতি এবং মণিকুন্তলা সেন উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ভারতীয় গ্রামীন মহিলাদের পিছিয়ে পড়া ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করেন অন্যান্য দেশের মহিলাদের এবং শীঘ্রই মহিলাদের নিজেদের বিভিন্ন দাবীর কথা তুলে ধরতে বলেন। যেমন- মহিলাদের জন্য কাজ, গ্রামে মাতৃসদন খোলা, শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং নিরক্ষর মহিলাদের সাক্ষরের ব্যবস্থা করা। পরের দিন অর্থাৎ ৭.৫.১৯৫৫ তারিখে শান্তির স্বপক্ষে একটি কনভেনশনে প্রায় ১৫০০ (দেড়হাজার) মহিলারা জমায়েত হয়। শান্তির প্রতীক হিসেবে কয়েকটি পায়রা উড়িয়ে কনভেনশন শুরু হয়। বিধায়ক মৃগেন ভট্টাচার্য্য সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া সত্য ঘোষাল, অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত, হরেকৃষ্ণ কোনার বক্তব্য রাখেন।[৫১]

পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় ২২.৫.১৯৫৫ তারিখে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কোন্নগর শাখার তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয় কালীতলা উদ্বাস্তু ক্যাম্পের কাছে। সভানেতৃত্ব করেন গীতা মুখার্জী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন মণিকুন্তলা সেন। প্রায় ২০০জন মহিলার উপস্থিতিতে সম্মেলন হয়। সম্মেলনে জোর দেওয়া হয় পারমানবিক বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহের উপর এবং মহিলাদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে উন্নত করার জন্য সংগঠনকে শক্তিশালী করার উপর।[৫২]

পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত ডি.আই.বি.-র রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে—মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির হাওড়া জেলার অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালের ৮ই-৯ই অক্টোবর। প্রতিনিধিদের সম্মেলন হয় ৮ তারিখ। সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত সর্দার পাড়ার সুরেশ ভট্টাচার্য্যের আটচালাতে।প্রকাশ্য সভা হয় ৯ তারিখ সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত আন্দুলের দক্ষিণপাড়ার আনন্দময়ী ময়দানে। ৮.১০.১৯৫৫ তারিখে শেষ অধিবেশনে পঙ্কজ আচার্য প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এই অধিবেশনে সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন শৈলজা দে এবং সুরুচি দেবী। ৮ তারিখ প্রতিনিধিদের অধিবেশন চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত। একষট্টি (৬১) জন প্রতিনিধি যার মধ্যে পনের (১৫)জন পুরুষ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। প্রতিনিধিরা এসেছিলেন সাঁকরাইল, বাগনান, ডোমজুড়, শিবপুর, মধ্য হাওড়া এবং সালকিয়া থেকে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্তগুলি হল—

১) **কর** — সরকারের বিভিন্ন কর প্রথা নিয়ে আলোচনা হয়। যা দিন দিন প্রতিটি পরিবারকে বিপর্যস্ত করে চলেছে। আর এই অত্যধিক করভার গ্রামীন মহিলাদের কাছে বোঝা স্বরূপ। তাই

এই বাড়তি করের বোঝা লাঘব করার জন্য সরকারের কাছে চাপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২) **ভূমি সংস্কার বিল** — মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বেশির ভাগ সদস্যা যেহেতু ছিলেন কৃষক পরিবারের সেহেতু তাঁরা ভূমিসংস্কার বিল কার্যকরী করার উপর জোর দেন বলে জানা যায়। জমিদারী ব্যবস্থা বিলুপ্ত হলেও এবং নিজেরা চাষাবাদ করলেও তার থেকে লাভ হচ্ছিল কম। তাই ভূমিসংস্কার বিল পাশ করিয়ে এবং কোনরকম আর্থিক লেনদেন ছাড়াই (ফ্রি তে) জমিদান করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩) **পি.ডি এবং সিকিউরিটি অ্যাক্ট** — এই দুটি কালা কানুন বিলোপ করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৪) **শান্তি** — শান্তি রক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কারণ যুদ্ধের ফলে সব থেকে সমস্যায় পড়েন মহিলারা। স্বামী, পুত্র অথবা ভাই কেউ না কেউ যুদ্ধে যেতে বাধ্য হন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেন। যার জন্য মহিলারা শান্তিমূলক আন্দোলনের পক্ষে বেশী আগ্রহ দেখান এবং প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

৫) **বেকার মহিলা** — মহিলারা যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ পান সেজন্য নানারকম কলকারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে দাবী পেশ করার প্রস্তাব নেওয়া হয়।

৬) **বয়স্ক শিক্ষা ও শিশুকল্যাণ** — শিশুদের যেহেতু প্রথম শিক্ষিকা মা তাই সেই মায়েদের প্রথমে শিক্ষিত করা দরকার। শিশুকল্যাণের বিষয়টিও অন্য দেশের তুলনায় ভারতে অবহেলিত। তাই, ঐ দুটি বিষয়ের ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা বলা হয়।

৭) **মাতৃত্ব**— মায়েদের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার উপর জোর দেওয়া হয়।

সর্বোপরি মহিলা আত্মরক্ষাসমিতিতে নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সেজন্য পরের বছর নতুন সদস্য সংগ্রহর মাত্রা স্থিরীকৃত হয় পাঁচহাজার। উনিশ (১৯) জনকে নিয়ে হাওড়া জেলা সমিতির পরিষদ গঠিত হয়। সভানেত্রী হন শৈলজা দে, সহ-সভানেত্রী সুরুচি দেবী এবং সম্পাদিকা হন শচী রানী বিশ্বাস।[৫৩] মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কলকাতা জেলার অষ্টম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৬সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এই সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলি হল ক) মাতৃমঙ্গল ও বেদনাহীন প্রসব ব্যবস্থা, খ) বাসস্থান সমস্যা, গ)বস্তী, ঘ) ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে প্রস্তাব ইত্যাদি।[৫৪]

১৩.৩.১৯৫৬ তারিখে পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত একটি রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে এইসময়

তুফানগঞ্জে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গড়ে উঠছে। জানা গেছে যে শ্রী নৃপেন্দ্র নারায়ণ পালের দুই মেয়ে লক্ষ্মী পাল ও সেবিকা পাল সংগঠনটি গড়ে উঠার পেছনে মুখ্য ভূমিকা নেন। আর তুফানগঞ্জ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা হন সেবিকা পাল।[৫৫] ৪.৭.১৯৫৬ তারিখে মধ্যমগ্রাম মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা হিরন্ময়ী রায় বেলা লাহিড়ীকে জানাচ্ছেন ৮.৬.১৯৫৬তারিখে মধ্যমগ্রাম মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বাৎসরিক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনের রিপোর্টে তিনি জানান ৩৫০জন মহিলার উপস্থিতিতে সম্মেলন হয়। সারা ভারত মহিলা ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদিকা হাজরা বেগম ছিলেন প্রধান অতিথি; সভানেতৃত্ব করেন কমল বসু। নেতৃত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিবেদিতা নাগ। হাজরা বেগম বলেন— "এখানে এসে বিশেষ করে আমার চোখে পড়ল বাস্তুহারাদের অবস্থা। এর তুলনায় পাঞ্জাবের বাস্তুহারাদের অবস্থা ভাল। মাত্র ৫০টি মহিলার জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়াছে।"[৫৬] পাশাপাশি তিনি চিনের কথা তুলে ধরেন। ১৫জনকে নিয়ে একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। মধ্যমগ্রাম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি হল—

১নং প্রস্তাব— প্রস্তাবিকা - কণা সেনগুপ্ত, সমর্থিকা - শোভা মুখার্জী।

প্রস্তাবে শ্রী নেহেরুর শান্তির নীতিকে অভিনন্দন জানানো হয়।

২নং প্রস্তাব— প্রস্তাবিকা - ভবরানী মজুমদার   সমর্থিকা - নির্ম্মলা চ্যাটার্জী।

সস্তাদরে চালের ব্যবস্থা ও বেকার মহিলা পুরুষদের কাজের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব।[৫৬]

আঞ্চলিক ও জেলাভিত্তিক সম্মেলনের পর প্রাদেশিক সম্মেলন হয় চন্দননগরে। পুলিশ ফাইলে পাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় ৭.২.১৯৫৬ তারিখে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রাদেশিক সম্পাদিকা বেলা লাহিড়ী গণতান্ত্রিক নারী সমিতির পঙ্কজা দেববর্মাকে একটি চিঠি পাঠান। ঠিকানাটি হল—গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ৩৭/২,কৃষ্ণনগর, পোস্ট অফিস-আগরতলা, ত্রিপুরা। চিঠিতে লেখেন যে, ১৯৫৬সালের ২৪-২৬ শে ফেব্রুয়ারি চন্দননগরে সমিতির অষ্টম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ঐ সম্মেলনে পঙ্কজা দেববর্মাকে উপস্থিত থাকতে এবং আশীর্বাদ পাঠাতে অনুরোধ করেন।[৫৭] সম্মেলন যে চন্দননগরে হয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৭.১.১৯৫৬ তারিখে বুড়া শিবতলা চুঁচুড়া থেকে মুক্তা কুমারের বেলা লাহিড়ীকে লেখা চিঠিতে, ওই চিঠিতে লেখেন চন্দননগরের নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সম্মেলনের কোন কাজ শুরু করতে পারেন নি। এছাড়া চিঠিতে অরুণা মুন্সীর কথা জানতে চান। ১৯.১.১৯৫৬ তারিখে চিঠিটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে।[৫৮]

১৯৫৬ সালের ২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারি চন্দননগরে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রাদেশিক অষ্টম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জানা যায় সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা

থেকে মোট ৮৯জন প্রতিনিধি ও শতাধিক দর্শক উপস্থিত ছিলেন।[৫৯]

শ্রীযুক্তা শোভা হুইকে সভানেত্রী করে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনের সূচনায় অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অমলা রায় প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে চন্দন নগরের মহিলা আন্দোলনের ইতিহাস বিধৃত করেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রাদেশিক সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা বেলা লাহিড়ী সমিতির কাজ, আন্দোলন, সফলতা, ত্রুটি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্ট থেকেই বিগত দু'বৎসর সমিতির কাজকর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। গত দু'বৎসরে সমিতি আন্দোলন করে হিন্দু বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ বিল ও উত্তরাধিকার বিলগুলিকে আইনে পরিণত করার জন্য। এছাড়া শান্তি আন্দোলন, জীবিকা আন্দোলন, রিলিফ আন্দোলন, বিড়ি নারী শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন করে। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সম্বর্ধনায় সমিতি উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে - শিশুদের নিয়মিত পালন করে। সমিতির নিজস্ব কুটিরশিল্পকেন্দ্র, বয়স্কা বিদ্যালয়, শিশু বিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, পাঠাগার ও নিয়মিতভাবে সমাজসেবা করে চলেছে।[৬০]

এই সমস্ত কাজের পাশাপাশি সাংগঠনিক দুর্বলতর কথাও তুলে ধরা হয়। সম্মেলনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়—"... আমরা সপ্তম সম্মেলনে ৫০হাজার সভ্য সংগ্রহের যে সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা পালন করিতে পারি নাই। সমিতি শুধুমাত্র ৪টি জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। দূরের জেলা, বিশেষ করিয়া উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নাই বলিলেই চলে। পশ্চিমবাংলার জেলাগুলির সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। ২৪ পরগণার মতো জেলায় আজও আমরা কোন জেলা কমিটি গঠন করিতে পারি নাই। সর্বত্রই সমিতির কর্মী সংখ্যার অভাবে আমাদের কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না...।"[৬১]

এই রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন আন্দোলনে সমিতি অংশগ্রহণ করলেও এই সময় সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রমাণিত হয়। আসলে এই দুর্বলতার মূল কারণ সমিতির নেত্রীবৃন্দ ও কর্মীদের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্য। এই পার্থক্যের জন্য কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক চলতে থাকে। সমিতির নেতৃত্বের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। সমিতির সংগঠনের সর্বস্তরে ক্রমশ তার প্রভাব পড়তে থাকে। অষ্টম সম্মেলনের সময় থেকেই এই মতানৈক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অষ্টম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে ছিল নারীদের জীবিকা, বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন, উত্তরাধিকার বিল, শান্তি ও বিশ্বনারী শ্রমিক সম্মেলনকে অভিনন্দন প্রভৃতি। শ্রীযুক্তা শোভা হুই, গীতা মুখোপাধ্যায়, মণিকুন্তলা সেন, পঙ্কজ আচার্য, জ্যোতি দেবী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং মেদিনীপুরের শ্রীমতী কমলা মাইতি, হুগলীর শ্রীমতী কল্পনা ব্যানার্জী, মুর্শিদাবাদের শ্রীমতী

শান্তি ভট্টাচার্য প্রমুখ জেলার প্রতিনিধিরা প্রতিনিধি সম্মেলনে আলোচনায় যোগদান করেন।[৬২] প্রস্তাবগুলি থেকে উপলব্ধি করা যায় যে নারীরা শুধু নিজেদের সমস্যা নয় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার সঙ্গেও নিজেদের যুক্ত করেছিলেন।

ঐ সম্মেলন থেকে যে প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয় তার সদস্যাদের অনেকেই ছিলেন তৎকালীন সময়ে বামপন্থী নেত্রী। নির্বাচিত হন পৃষ্ঠপোষিকা - আর্যবালা দেবী, নন্দরানী মুখার্জী, কিরণশশী মিত্র, মনোরমা পাকড়াশী, সভানেত্রী- শোভা হুই, সহ-সভানেত্রী— রেণু চক্রবর্তী, মায়া চট্টোপাধ্যায়, নির্মলা সান্যাল, মীরা সেন, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়,সম্পাদিকা-বেলা লাহিড়ী, সহ-সম্পাদিকা-পঙ্কজ আচার্য, কমলরানী বসু, কোষাধ্যক্ষ- লাবণ্য মিত্র। কার্যকরী সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ - মণিকুন্তলা সেন, কমলা মুখোপাধ্যায়, কনক মুখোপাধ্যায়, গীতা মুখোপাধ্যায়, বীণা ভট্টাচার্য, জ্যোতি দেবী, বাণী দাশগুপ্ত, শান্তি দেবী, তিলোত্তমা ভট্টাচার্য, গীতা মল্লিক, গীতা মুখার্জী, শচী বিশ্বাস, নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়, আশা সামন্ত, মুক্তা কুমার ,তুলসী মজুমদার, গৌরী দাশগুপ্তা, শান্তি ভট্টাচার্য, গীতা ব্যানার্জী, বিভা কোঙার, বিভা ঘোষ প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অষ্টম সম্মেলনের রিপোর্টে যেমন সমিতির সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকাশ পায় তেমনই ১৯৫৬ সালের ১৬ই-২১শে জানুয়ারী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট থেকে এই সময়কার কমিউনিস্ট মহিলাদের সংগঠন সম্পর্কে দুর্বলতার কিছুটা চিত্র পরিস্ফুট হয়। রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে মাদুরা কংগ্রেসের পরবর্তী সময় থেকে ১৯৫৬সাল পর্যন্ত মহিলাদের মধ্যে দুটি বড় আন্দোলন হয়—একটি হিন্দু কোড বিলের সমর্থনে অপরটি মেয়েদের জীবিকার দাবীতে। বাংলাদেশের বিভিন্ন মহিলা সমিতির সংযুক্ত নেতৃত্বে এই দুটি বড় আন্দোলন পরিচালিত হয়। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাতৃসম্মেলন, শান্তি সংসদের আহ্বানে বিভিন্ন সময়ে শান্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ, কতকগুলি স্কুল ও শিল্পকেন্দ্র দৈনন্দিন কাজ হিসাবে পরিচালনা করে এই সমিতি। কিন্তু এইসমস্ত কাজ করলেও মহিলাদের সংগঠন আগের তুলনায় যে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে তা রিপোর্টে বলা হয়। সংগঠনের সভ্য সংখ্যা ১৮,০০০ থেকে ৭/৮ হাজারে নেমে যায়। মাত্র ৫টি জেলা ছাড়া অন্য জেলায় কোন শাখা কমিটি ছিল না। মহিলাদের এই দুর্বলতার কারণগুলি সম্পর্কে সম্মেলনে বলা হয় — ১) শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে মহিলাদের আদৌ প্রবেশ ঘটে নি। প্রধানত শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত অংশের মেয়েদের মধ্যেই সংগঠন সীমাবদ্ধ ছিল। ২) পার্টির সর্বস্তরে মহিলা আন্দোলন সম্পর্কে উদাসীনতা এর বৃদ্ধির পথে বড় অন্তরায়। মহিলা আন্দোলনের প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে পার্টি

ইউনিটগুলি ও পার্টি কর্মীরা আদৌ মনোযোগী নন। ফলে মহিলা আন্দোলন শক্তিশালী হতে পারে নি।[৬৩] রিপোর্টে বলা হয়— "মহিলা আন্দোলনের প্রশ্নকে আমরা নিছক মহিলা কমরেডদের সমস্যা হিসাবেই এখনও দেখিয়া থাকি। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহা ছাড়া আন্দোলন সম্পর্কে মহিলা কমরেডদের কিছুটা ধারণাও স্পষ্ট নহে। ফলে প্রচুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও দেশের নরনারী সমাজের মধ্যে পার্টির সংগঠিত প্রভাব বাড়ে না, মহিলা আন্দোলন জোরালো হয় না। অপরদিকে ইহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন, নানা গঠনমূলক কাজ ইত্যাদি লইয়া কংগ্রেস পশ্চিমবাংলার সর্বত্র মেয়েদের মধ্যে সুপরিকল্পিতভাবে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে। প্রধানতঃ নির্বাচনকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রচেষ্টা ক্রমশই বাড়ানো হইতেছে এবং বহু সমিতি এইভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নারী সমাজ একটি বড় শক্তি। এই শক্তিকে টানিতে না পারিলে সমগ্রভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনই দুর্বল হইতে বাধ্য। স্বভাবতই কমিউনিস্ট পার্টি নিষ্ক্রিয় থাকিলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রভাবই এই শক্তিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবে। এই কথা স্মরণ রাখিয়া এ বিষয়ে অবিলম্বে পার্টির কর্তব্য স্থির করা দরকার।"[৬৪]

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি থেকে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি:

১৯৫৭ সালে ১লা মার্চ থেকে ভারতে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন হয়। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দু'জন সদস্যা রেণু চক্রবর্তী ও মণিকুন্তলা সেন যথাক্রমে দ্বিতীয়বার লোকসভা ও রাজ্যবিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৫৮খ্রিস্টাব্দে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নবম সম্মেলন থেকে মহিলাদের সাংগঠনিক অবস্থা সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যায়। ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর-১লা জানুয়ারী ১৯৫৯সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নবম সম্মেলন হয় কলকাতা স্টুডেন্টস হলে। প্রকাশ্য সমাবেশ হয় ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে। প্রাদেশিক সম্মেলনের আগে কোন কোন জায়গায় জেলা সম্মেলনের সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন -২০.১১.১৯৫৮ তারিখে অন্তারবাগান, চুঁচুড়া থেকে হুগলী জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা মুক্তা কুমার বেলা লাহিড়ীকে একটি চিঠি দেন। চিঠিটি পুলিশ ফাইলে রক্ষিত আছে। চিঠি থেকে জানা যায় যে, হুগলী জেলা সম্মেলন ৩০.১১.১৯৫৮ তারিখ এবং প্রতিনিধি সম্মেলন ২৯.১১.১৯৫৮ তারিখ।[৬৫] প্রাদেশিক সম্মেলনের সময় সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪,৪২৯জন ছিল বলে জানা যায়। কলকাতা, হাওড়া, হুগলী,মেদিনীপুর, ২৪পরগণা, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ— এই ৮টি জেলার ৯৮জন প্রতিনিধি সম্মেলনে আসেন বলে জানা

যায়। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—বিশ্বশান্তি আন্দোলন, এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন, খাদ্যসংকট, শিক্ষা সংকট, সমবায় আন্দোলন, শিশুরক্ষণাগার, অশ্লীল বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, পণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রভৃতি।

নবম সম্মেলনে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গঠনতন্ত্র সংশোধন করে সমিতির নামের থেকে বাদ দেওয়া হয় 'আত্মরক্ষা' কথাটি। প্রস্তাবে বলা হয় —"পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির এই নবম সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নাম পরিবর্তন করিয়া পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি করা হউক।"[৬৬] কারণ হিসাবে বলা হয় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় দেশ ও সমাজ জীবনকে রক্ষা করবার জন্য গড়ে ওঠে "Women's Self Defence Committee" যার বাংলা নামকরণ করা হয় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। যে পটভূমিকায় 'আত্মরক্ষা' কথাটি যুক্ত করা হয়েছিল এখন তার কোন প্রয়োজন নেই। সেই কারণে কনক মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে— এখন থেকে যেন সমিতির নামকরণ হয় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি। এই প্রস্তাবটি সম্মেলনে গৃহীত হয়। কমলা মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন সমিতির সদস্যদের বয়সের মান ১৫ থেকে ১৮ করার। এই প্রস্তাবটিও গৃহীত হয়।

সম্মেলনে উত্থাপিত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন থেকে সমিতির সাংগঠনিক দিকের নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির একটি চিত্র পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়— "গত সম্মেলনের সময় আমাদের সমিতির সভ্য সংখ্যা ছিল ১৭,২৩০। আর বর্তমানে আমাদের সভ্য সংখ্যা ১৪,৪২৯। গত সম্মেলনের সময় আমাদের হাওড়া, হুগলী, কলকাতা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, তুফানগঞ্জ, মেদিনীপুর এবং ২৪পরগণার কিছু কিছু এলাকায় সমিতির কমিটি ছিল এবং কাজও মোটামুটি করা হইত। কিন্তু বর্তমানে হাওড়া,হুগলী, কলকাতা, শিলিগুড়ি, তুফানগঞ্জ, মেদিনীপুর এবং ২৪ পরগণার দুটি এলাকা বাদে আমাদের সমিতির অস্তিত্ব প্রায় নাই বলিলেই চলে। সমিতি সাধারণত নিম্ন মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশে সহস্র সহস্র শ্রমিক কৃষক মেয়েদের মধ্যে আজও আমরা কোন সংগঠন গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। বাংলাদেশের এই অসংগঠিত শ্রমিক-কৃষক মেয়েদের যদি সমিতির মধ্যে টানিয়া আনিতে সক্ষম না হই, তবে কোনদিনই সমিতি শক্তিশালী হইতে পারিবে না।

প্রাদেশিক কমিটির সভাগুলিতে সভ্যরা নিয়মিত যোগদান না করায় অনেকসময় প্রাদেশিক কমিটির কাজ ঠিকমতো করা সম্ভব হয় নাই। দূরের জেলাগুলির সঙ্গেও দু-একখানি চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ছাড়া আমাদের যোগাযোগ প্রায় নাই বলিলেই হয়।

দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে আত্মরক্ষা সমিতি জনসাধারণের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু সংগঠনের দিক দিয়ে আমরা মোটেই অগ্রসর হইতে পারি নাই। আজ আমাদের সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার।"[৬৭]

উপরের প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নবম সম্মেলনের সময় সমিতির সাংগঠনিক শক্তি অনেকটাই কমে যায়। এর অন্যতম কারণ ছিল সমিতির নেতৃত্বদের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক অষ্টম রাজ্য সম্মেলনে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্টে এই দুর্বলতার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ৮-১২ই এপ্রিল কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে এই সম্মেলন হয়। সম্মেলনে মহিলা ফ্রন্ট সম্পর্কে বলা হয়, কমিউনিস্ট পার্টিতে মহিলা ফ্রন্ট অত্যন্ত দুর্বল। এর কারণ হিসাবে মহিলা আন্দোলন ও সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পার্টির সর্বস্তরে সঠিক চেতনা ও ধারণার অভাবকেই দায়ী করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে—"পার্টির মহিলা কমরেডরা নিজেদের ধারণা এবং ক্ষমতা অনুযায়ী কিছু কিছু আন্দোলন ও সংগঠনের কাজ করিয়া থাকেন। বর্তমানে পার্টির সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহিলা সংগঠনগুলির সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩০হাজার হইবে। ১০/১২ টি কুটির শিল্প কেন্দ্র এবং ১০/১২টি শিশু বিদ্যালয় ও বয়স্ক স্কুল গণসংগঠনগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়। একখানি মাসিক পত্রিকার নিয়মিত পরিচালনা এই ফ্রন্টের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ। প্রায় ১০বৎসর ধরিয়া ইহার সম্পাদনা হইতে বিক্রয় পর্যন্ত সমস্ত কাজই মহিলা কমরেড এবং সমিতির কর্মীরা নিয়মিত করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু মহিলা আন্দোলনের বিস্তৃতির প্রয়োজনের তুলনায় এবং বর্তমানে ইহার যে সুযোগ ও সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার তুলনায় উপরোক্ত কাজ একান্তই নগণ্য। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের সর্বত্র নারী সমাজের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকারলাভের চাহিদা যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে নারীসমাজের মধ্যে এই সকল দাবীর ভিত্তিতে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও সংগঠন গড়িয়া তোলা সম্ভব। নানাবিধ সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল হইতে নারী সমাজকে মুক্ত করা, এবং সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করা এই উভয় স্বার্থেই নারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করা কমিউনিস্ট পার্টিরই দায়িত্ব। কিন্তু এ সম্পর্কে পার্টি এখনও সচেতন নহে। শুধু তাহাই নহে, মহিলা ফ্রন্টের কাজকে উপেক্ষা করা বা লঘু করিয়া দেখার পিছনে পার্টির সর্বস্তরে কিছু পরিমাণে সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব রহিয়াছে ইহাও অস্বীকার করিলে ভুল হইবে।"[৬৮]

মহিলা ফ্রন্টের দুর্বলতা হিসাবে কতকগুলি ঘটনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার। সাধারণ জনসভাগুলিতে আগে যেরূপ মহিলাদের সমাবেশ দেখা যাইত আজকাল প্রায়ই তাহা দেখা যায় না। পার্টিসভ্য বৃদ্ধির অভিযানে তুলনামূলক হারে মহিলা সভ্যাবৃদ্ধির সংখ্যা অনেক কম। সাধারণ আন্দোলনের সময়ে এবং এমনকি নির্বাচনের সময়েও পার্টি পরিবার বা প্রভাবিত পরিবারের মেয়েরা আগের মতন কাজে নামেন না। মহিলা ফ্রন্টের কাজের ক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া দু-একটি জিলা ছাড়া শুধুমাত্র শহরের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে।"

মহিলা ফ্রন্টের দুর্বলতা কাটাবার জন্য সেজন্য প্রস্তাব করা হয়—১) মহিলা আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে সমগ্র পার্টিকে শিক্ষিত করতে হবে। ২) শ্রমিক ও কৃষক মহিলাদের মধ্যে সংগঠনকে প্রসারিত করে একটি গণতান্ত্রিক ভিত্তি দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ৩) শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে মহিলারা এগিয়ে এলে তাদের সাথে পার্টির মহিলা নেত্রীদের যাতে যোগাযোগ স্থাপিত হয় সে বিষয়ে পার্টিকে নজর দিতে হবে।[৬৯]

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির আভ্যন্তরীণ সংকট ক্রমশ প্রকট হতে থাকলেও ১৯৬১ সালের ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারি সমিতির দশম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। ১৮ই ফেব্রুয়ারি গণেশ এভিনিউ, এ.বি.টি.এ হলে প্রতিনিধি সম্মেলন হয় এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে প্রকাশ্য সমাবেশ হয়। সম্মেলনের সময় সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ২১,৬৯৮ জন এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সমিতির পরিচালনায় ২০টি কর্মক্ষেত্র ও ২২টি শিশু ও বয়স্ক বিদ্যালয় চলছিল। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন থেকে বিগত দুবছরের সমিতির কাজের একটি বিবরণ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল— খাদ্য ও জীবিকার আন্দোলন, বিশ্বশান্তির জন্য আন্দোলন, নারীর অধিকারের আন্দোলন প্রভৃতি।[৭০]

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি ছিল— কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বার হত্যার প্রতিবাদ, কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে সার্বজনীন ভোটাধিকার, জীবিকা, শিক্ষার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ, সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণদাবি প্রভৃতি। সম্মেলন থেকে সভানেত্রী নির্বাচিত হন ডাঃ জ্যোৎস্না মজুমদার, সহ-সভানেত্রী মায়া চট্টোপাধ্যায়, নির্মলা সান্যাল, বেলা লাহিড়ী, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়,হেনা ঘোষ, রেণু চক্রবর্তী, প্রতিমা দাশগুপ্ত। সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন - পঙ্কজ আচার্য, অন্যান্য সম্পাদিকারা হলেন - জ্যোতি দেবী, গীতা মুখার্জী, বাণী দাশগুপ্ত, তিলোত্তমা ভট্টাচার্য। কার্যকরী কমিটিতে নির্বাচিত হন মণিকুন্তলা সেন, কমলা মুখার্জী, কনক মুখার্জী, নিবেদিতা নাগ, আশা রায়, জ্যোতি চক্রবর্তী, ইরা শর্মা, মলিনা সরকার, উমা গাঙ্গুলী,

মুক্তা কুমার, মঞ্জু ঘোষ, নিরুপমা চ্যাটার্জী, মীনা দেবী, রমা ঘোষ, ভক্তি ঘোষ, সাবিত্রী গাঙ্গুলী প্রমুখ।[৭১]

বামপন্থী মহিলা সংগঠনে আদর্শগত মতপার্থক্য:

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির কর্মীদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হচ্ছিল তা আরোও প্রকট আকার ধারণ করে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে চীন-ভারত সংঘর্ষকে সংস্পর্শকে কেন্দ্র করে। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের একটা অংশ চীনকে আক্রমণকারী চিহ্নিত করে চীন বিরোধিতায় নামে নি। আর একটা অংশ চীনকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করে। পার্টির এই প্রভাব গণসংগঠনের মধ্যেও পড়ে। চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় কেন্দ্র সরকার জরুরী অবস্থা জারি করে ভারতরক্ষা আইনে চীন সমর্থিতদের গ্রেপ্তার করতে থাকে। ফলে, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির অনেক নেত্রী ও কর্মীও কারারুদ্ধ হন। যেমন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সম্পাদিকা পঙ্কজ আচার্য, 'ঘরে বাইরে' -এর সম্পাদিকা কনক মুখোপাধ্যায়, মহিলা সমিতি ও কৃষক আন্দোলনের নেত্রী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়, দার্জিলিং এর চা শ্রমিক নেত্রী রণমায়া রাইনী, ইলা মিত্র প্রমুখ। অপরদিকে সমিতির মধ্যে যাঁরা চীনকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করেন- সেই একাংশ গ্রেপ্তার না হওয়ায় সমিতি তাঁদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। এই সমস্ত নেত্রী ও কর্মীদের মধ্যে ছিলেন রেণু চক্রবর্তী, মণিকুন্তলা সেন, কমলা মুখার্জী, বেলা লাহিড়ী, গীতা মুখার্জী, বাণী দাশগুপ্ত, মুক্তি মিত্র, তিলোত্তমা ভট্টাচার্য প্রমুখ। ফলে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির মধ্যে দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে প্রকট হতে থাকে। এই দ্বন্দ্ব আরো বেশী হয় ১৯৬৪ সালে কারারুদ্ধ মহিলা নেত্রী ও কর্মীরা যখন ছাড়া পান। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত অনুযায়ী চলার ফলে 'ঘরে বাইরে' পত্রিকার বিক্রয় পড়ে গিয়ে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। সেইকারণে ১৯৬৭খ্রিষ্টাব্দে এপ্রিলের পর থেকে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[৭২]

১৯৬১ সালের ১৭ থেকে ২১শে জানুয়ারী বর্ধমান শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক নবম সম্মেলন হয়। গোয়েন্দা বিভাগের গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যায় সম্মেলন পরিচালনার জন্য গঠিত সভাপতিমণ্ডলীতে অন্যান্যদের সাথে ছিলেন মণিকুন্তলা সেন। আবার যে সমস্ত প্রতিনিধিরা প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য রাখেন তাঁদের মধ্যে মহিলা নেত্রী শ্রীমতী জ্যোতি দেবী ছিলেন। তবে, রিপোর্ট থেকে নারী ফ্রন্ট সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।[৭৩] ১৯৬১খ্রিষ্টাব্দে ৭-১৬ই এপ্রিল পর্যন্ত অন্ধ্রের লুমুম্বানগর, বিজয়ওয়াড়ায় সি.পি.আই-র ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস হয়। গোয়েন্দা বিভাগের গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, এই কংগ্রেসে অন্যতম পর্যবেক্ষক

হিসাবে অংশ নেন বাংলা থেকে শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়। দলের মধ্যে ভাঙ্গন যে প্রকট হয়েছিল তা আলোচনা থেকে প্রকাশ পায়। তবে গোয়েন্দা রিপোর্টে বাংলা তথা সমগ্র ভারতে দলের নারী ফ্রন্টের কোন স্পষ্ট চিত্র এতে প্রতিফলিত হয় নি।[৭৪]

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির আভ্যন্তরীন সংকট থাকলেও বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে আন্দোলনে মহিলাদের সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাশাপাশি সমিতির সাংগঠনিক কাজকর্মও পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ৪-৫ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির একাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। এইসময় সমিতির সদস্যসংখ্যা ছিল ১৪,৭৪০জন। কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, বর্ধমান, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলা থেকে ২৬১জন প্রতিনিধি ও ২৩জন দর্শক সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—ভারতরক্ষা আইন রদ করার ও ভারতরক্ষা আইনে ধৃত রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি, সভা ও শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ বিলের প্রতিবাদ, খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের দাবি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ, ভিয়েতনামে মার্কিন আক্রমণের প্রতিবাদ, কাশ্মীর ও দেশরক্ষা বিষয়ে নারী শিক্ষার বিস্তারের দাবি, নারীদের জীবিকার দাবি, অশ্লীল পোস্টার প্রদর্শনের প্রতিবাদ, বিশ্বগণতান্ত্রিক নারী সঙেঘর বিশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে অভিনন্দন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়।[৭৫]

সম্মেলনে সভানেত্রী নির্বাচিত হন- জ্যোৎস্না মজুমদার, সহ সভানেত্রী, মায়া চট্টোপাধ্যায়, নির্মলা সান্যাল, রেণু চক্রবর্তী, জ্যোতি চক্রবর্তী, বেলা লাহিড়ী। আর সম্পাদিকা হন- পঙ্কজ আচার্য। সহ সম্পাদিকারা নির্বাচিত হয়েছিলেন- জ্যোতি দেবী, গীতা মুখার্জী, মাধুরী দাশগুপ্ত, বাণী দাশগুপ্ত, তিলোত্তমা ভট্টাচার্য। মোট ৩৫জনের একটি রাজ্য কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।[৭৬]

১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ২২শে -২৬শে অক্টোবর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ দশম রাজ্য সম্মেলনের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্টে মহিলা ফ্রন্ট সম্পর্কে বলা হয় যে, আগের তুলনায় মহিলাদের সাংগঠনিক ক্ষমতা দূর্বল হয়েছে। এর কারণ হিসাবে রিপোর্টে বলা হয়— “মহিলা সংগঠনে সংশোধনবাদী গোষ্ঠী বেশ ক্ষতি করতে পেরেছে।” দুর্বলতা কাটাবার উপায় হিসাবে নতুন রাজ্য কমিটিকে মহিলা ফ্রন্ট সম্পর্কে নির্দিষ্ট কার্যক্রম নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়।[৭৭]

১৯৬২খ্রিষ্টাব্দে থেকে ১৯৬৭খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় মহিলা ফ্রন্টের অবস্থা কেমন ছিল তা অনুধাবন করা যায় দমদম, ২৪ পরগণায় ১৯৬৮খ্রি. ৬ই-৯ই ডিসেম্বর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ রাজ্য সম্মেলনে প্রকাশিত মহিলা ফ্রন্টের রিপোর্ট থেকে। পাশাপাশি গণসংগঠনের

মধ্যে ভাঙ্গন স্পষ্ট বোঝা যায়। একটি গোষ্ঠী বাম ও অন্য গোষ্ঠী সংশোধনবাদী তথা দক্ষিণপন্থী নামে পরিচিত হয়। জানা যায় ১৯৬২সালে সমিতির সভ্যসংখ্যা ছিল ১৮০০০। কার্যকরী কমিটিতে বাম গোষ্ঠীর ৮জন আর দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর ২৭জন। কাউন্সিলে বাম গোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য ছিল। ১৯৬৫সোলে সমিতির সভ্যসংখ্যা ছিল ২১,০০০। কাউন্সিলে বামগোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল। ১৯৬৭সালে সমিতির সভ্যসংখ্যা হয় ৪৩হাজার। কার্যকরী কমিটি ও কাউন্সিলে দুটি গোষ্ঠীই সমান সমান ছিল।

একাদশ সম্মেলনে উত্থাপিত রিপোর্টে জেলাভিত্তিক একটি চিত্র তুলে ধরা হয়। রিপোর্ট থেকে জানা যায়।

১) কলকাতা - কলকাতা জেলা কমিটিতে বাম গোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ। পূর্ব কলকাতা ও মেটেবুরুজ ছাড়া সব অঞ্চলেই সমিতি ছিল। ১৯৬৭ সালের পর মোমিনপুর ও পাইকপাড়ায় সমিতি গড়ে উঠে। আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রায় সব শাখা কমিটি অংশগ্রহণ করলেও সমিতির জেলা কমিটি সক্রিয় নয়। পার্টির উদ্যোগে শিক্ষা শিবিরের কোন ব্যবস্থা হয়নি।[৭৮]

২) ২৪ পরগণা - বাম গোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখা যায়। দু-একটি স্থানে পার্টির উদ্যোগে শিক্ষা শিবির হলেও জেলাভিত্তিক সমিতি এবং পার্টির সাব কমিটি নেই।

৩) হুগলী- বাম গোষ্ঠীর শক্তি বেশী। কৃষক ও ক্ষেতমজুর মহিলাদের মধ্যে সমিতির বিস্তার হয়েছে। পার্টির উদ্যোগে শিক্ষা শিবির হয়েছে। পার্টির সাব কমিটি আছে, সমিতির জেলা কমিটিও আছে।

৪)বর্ধমান - দক্ষিণপন্থীদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। জানুয়ারি মাসে জেলা সম্মেলনে জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। কৃষক মহিলাদের মধ্যে সমিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তার লাভ করেছে। জেলা সাব-কমিটি নেই।

৫) হাওড়া - জেলা কমিটি থাকলেও দু-একটি অঞ্চলে সমিতির কাজ সীমাবদ্ধ। পার্টি সাব কমিটি না থাকায় পার্টি নেতৃত্বকেই দায়ী করা হয়েছে। মহিলা ফ্রন্টের কাজ করার জন্য মহিলা কর্মীর অভাব। পার্টি সেদিকে কোন নজর দেয় না। ফ্রাকশান সভ্যা থাকলেও পার্টির কাজে ব্যস্ত থাকায় মহিলা ফ্রন্টের কাজে কোন সাহায্য করতে পারেন না। জেলা সাব কমিটি নেই।

৬) মুর্শিদাবাদ- আগস্ট মাসে সমিতির সম্মেলন করে জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। কৃষক ও ক্ষেতমজুর মহিলাদের সংখ্যাই বেশি এবং সম্মেলনে তাঁরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। পার্টি সভ্যার সংখ্যা খুবই কম। পার্টি সাব কমিটি নেই।

৭) মালদহ- সম্প্রতি জেলা সম্মেলনে হলেও দক্ষিণপন্থীরা সম্মেলনে যোগ দেন নি। তাঁদের আলাদা সমিতি আছে বলে জানা যায়। সমাবেশে কৃষক মহিলাদের প্রাধান্য ছিল।[৭৯]

৮) নদীয়া- বিগত দুই-তিনবৎসর ধরে সমিতি গড়ে তোলার চেষ্টা হয় ফ্রাকশনের পক্ষ থেকে। তবে, পার্টি নেতৃত্বের চেষ্টা ও স্থানীয় মহিলা কর্মী না থাকায় ফ্রাকশনের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। বিগত মহিলা সম্মেলনের সময় আড়ংঘাটায় একটি কমিটি গঠিত হলেও বর্তমানে কোন কাজ হচ্ছে না। পার্টির কোন উদ্যোগ নেই। উল্লেখযোগ্য বিষয় দক্ষিণপন্থীদের সমিতি আছে।

৯) কোচবিহার - দিনহাটায় একটি সমিতি থাকলেও বর্তমানে যোগাযোগ ক্ষীণ। দক্ষিণপন্থীদের কিছু নেই।

১০) জলপাইগুড়ি - এখানে দক্ষিণপন্থীদের একটি সমিতি আছে। বামগোষ্ঠীর সমিতি নেই। বামগোষ্ঠীর নেতৃত্বে কৃষক অঞ্চলে তরাই মহিলা সমিতি গড়ে উঠলেও পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়নি। বর্তমানে যুক্ত হওয়ার আবেদন জানিয়েছে বলে জানা যায়।

১১) কলোনী সমিতি - কলকাতায় গড়ে ওঠা কলোনীগুলিতে অনেকগুলি সমিতি ছিল। কিন্তু তারা পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সাথে সংগঠনগতভাবে যুক্ত ছিল না। এই সমিতিগুলি মহিলা ফেডারেশনের সাথে যুক্ত ছিল। আন্দোলনের সময় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সাথে যোগদান করত। বর্তমানে দু-একটি ছাড়া বাকীগুলির অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।[৮০]

এছাড়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, কার্শিয়াং, পশ্চিমদিনাজপুর ও দার্জিলিং এ দক্ষিণপন্থীদের সমিতি থাকার কথা জানা যায়। রিপোর্ট থেকে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা ফেডারেশনে বামগোষ্ঠী নামমাত্র ছিল। এই সংগঠনে মূলতঃ দক্ষিণপন্থীরাই নেতৃত্ব দিতে থাকেন।

মহিলা ফ্রন্টের সমস্যা সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয় কেন্দ্রীয়ভবে সকলে কাজ না করার ফলে ২/৩ জনের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। ১৯৬৭ সালের মহিলা সম্মেলন পর্যন্ত সমানভাবে সকলে কাজ না করলেও মিলিত প্রচেষ্টা ছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর অবস্থার পরিবর্তন হয়। সমিতির অফিস চালনায় কেউ সাহায্য করেন না বলে জানা যায়। তাছাড়া মহিলাকর্মীদের নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়। অনেকের খারাপ স্বাস্থ্য। সর্বোপরি মহিলাদের পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হয় যে, সমাজে নারী জাতি সম্পর্কে যে উপেক্ষা, পার্টির মধ্যেও সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশে সম্পর্কেও কম বেশী সে উপেক্ষাই বিদ্যমান। রাজনৈতিকভাবে মহিলাদরে শিক্ষিত করার দায়িত্ব পার্টি নেন না বলে মহিলারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাছাড়া, শুধুমাত্র রাজনৈতিক আলোচনার জন্য সাধারণ মহিলারা সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন না। কাজের

ক্ষতি স্বীকার করে বস্তির খেটে খাওয়া মহিলারা, কলকারখানার মহিলারা, কৃষক মহিলারা সভা-মিছিলে আসেন না। একমাত্র কাজের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে কিছু কিছু মহিলা যোগ দেন। অন্যান্য গণসংগঠন বাম ও দক্ষিণগোষ্ঠীর মধ্যে পৃথক হয়ে গেলেও মহিলা সমিতি ভাগ হয়নি। তাই রিপোর্টে মহিলা সমিতির বাম গোষ্ঠী অভিযোগ আনে যে, সমিতির নেতৃত্বে যেহেতু পূর্ব থেকেই দক্ষিণপন্থীদের প্রাধান্য ছিল তাই নীচুতলায় বামগোষ্ঠী কাজ করা সত্ত্বেও সম্মুখভাবে দক্ষিণপন্থীদেরই প্রাধান্য আছে। এতে পার্টির অনেকের ধারণা দক্ষিণপন্থী মহিলাদের লেজুড় হয়ে বামগোষ্ঠীর মহিলারা কাজ করেন। এর প্রভাবে পার্টি সদস্যরা সমিতিকে অত্যন্ত খারাপ চোখে দেখার ফলে অনেক মহিলা সমিতির কাজ বর্জন করেন বলে জানা যায়।

উপরের সাংগঠনিক রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় যে, মহিলাদের ঐক্যের অভাবে সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। সমিতির দুই গোষ্ঠীর লড়াই এই দুর্বলতার অন্যতম কারণ। মহিলাদের সাংগঠনিক শক্তিকে বৃদ্ধি করা বা শক্তিশালী করার দিকে পার্টি নেতৃত্বের উপেক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। যারফলে দুই গোষ্ঠীর মহিলাদের নেতৃত্বে কোথাও কোথাও দুটি করে সমিতি গড়ে ওঠার সংবাদও পাওয়া যায়।[৮১]

মহিলা সমিতির সাংগঠনিক বিভেদ ধীরে ধীরে প্রকাশ হতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলে মহিলারাও পছন্দ অনুযায়ী দুটি পার্টির যেকোন একটিতে যোগ দেন। আবার অনেকে কোনো পার্টিতে যোগ না দিয়ে মধ্যপন্থা নীতি গ্রহণ করেন। কেউ কেউ আবার কোন পার্টিতে যোগ না দিয়ে বা মধ্যপন্থা নীতি গ্রহণ না করে রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেন। তথ্য থেকে জানা যায় কনক মুখার্জী,জ্যোতি চক্রবর্তী, মাধুরী দাশগুপ্ত ,মুক্তা কুমার পুষ্প ঘোষ, সাধনা পাত্র, প্রভা চ্যাটার্জী, কণিকা গাঙ্গুলী, সাধনা ঘোষ, রানী সর্বজ্ঞ, রাণু ভট্টাচার্য, জয়ন্তী গোস্বামী, শ্বেতা চন্দ, কমলা দাস প্রমুখ কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) তে যোগ দেন। আর রেণু চক্রবর্তী, কমলা মুখার্জী, বাণী দাশগুপ্ত, বিদ্যা মুন্সী, বীণা গুহ, রাণী মিত্র, মুক্তি মিত্র প্রমুখ নেত্রীরা কমিউনিস্ট পার্টি (দক্ষিণপন্থী) তে যোগ দেন। পঙ্কজ আচার্য, জ্যোতি দেবী কোন পার্টিতে যোগ না দিয়ে মধ্যপন্থা নীতি অনুসরণ করেন। মণিকুন্তলা সেন কোন পার্টিতেই যোগ না দিয়ে স্বেচ্ছা অবসর নেন। মহিলা নেত্রীরা দুটি দলে বিভক্ত হলেও এবং দুটি নীতি নিয়ে কাজ করলেও সমিতিকে কেউই না ভেঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে চলতে থাকেন।[৮২]

এই অবস্থায় সমিতির কাজকর্ম যৌথভাবে চলতে থাকে। তাই, ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ৩০সেপ্টেম্বর থেকে ১লা অক্টোবর কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির দ্বাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যৌথভাবে।

সম্মেলনের সময় সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৩,৮৭২জন। জানা যায় ১৫টি জেলায় জেলা কমিটি গঠিত হয়েছিল। সারা রাজ্যে ১৮০টি প্রাথমিক কমিটি ছিল। ৪৩৫জন সম্মেলনের প্রতিনিধি ছিলেন। সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল সেগুলি হল— যুক্তফ্রন্ট সরকারের ১৮ দফা কর্মসূচীকে সমর্থন জানানো, খাদ্য সংকটের উপর , ছাঁটাই প্রতিরোধ করা, অশ্লীল চলচ্চিত্র পোস্টারের বিরুদ্ধে, মুসলিম সমাজে বহুবিবাহ নিরোধ সম্বন্ধে, নারীর শিক্ষা, জীবিকা, মাতৃমঙ্গল, নারীর সমানাধিকার, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমর্থন প্রভৃতি বিষয়ের উপর মোট ১১টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৮৩]

সম্মেলন থেকে ৩৫জনের কার্যকরী কমিটি ও ১৩৫জনের একটি রাজ্য কাউন্সিল নির্বাচিত হয়। সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন সভানেত্রী জ্যোৎস্না মজুমদার, সহসভানেত্রী রেণু চক্রবর্তী, কনক মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ আচার্য, নির্মলা সান্যাল, মায়া চট্টোপাধ্যায়,পুষ্প ঘোষ, মঞ্জরী গুপ্ত, তিলোত্তমা ভট্টাচার্য, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদিকা- জ্যোতি চক্রবর্তী ও বেলা লাহিড়ী , সহ সম্পাদিকারা হলেন- মাধুরী দাশগুপ্ত, গীতা মুখার্জী, কণিকা গাঙ্গুলী, রানী দাশগুপ্ত, জ্যোতি দেবী; কোষাধ্যক্ষ- বীণা চৌধুরী। কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মুক্তা কুমার, কমলা মুখার্জী, কমলা দাস, মুক্তি মিত্র, সাধনা ঘোষ, অমিয়া নন্দী, শিখা গুহ, রানু ভট্টাচার্য, সাধনা পাত্র, ঝরণা ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা ব্যানার্জী, গৌরী চট্টোপাধ্যায়, বিভা কোঙার, ইরা শর্মা, বিদ্যা মুন্সী, বীণা গুহ, মায়া মৈত্র, মনতোষিনী দেবী। নির্বাচিত যুগ্ম সাধারণ সম্পাদিকাদের নাম থেকেই দেখা যাচ্ছে যে সমিতির মধ্য দ্বন্দ্ব তীব্র আকারে বিদ্যমান ছিল। তাই, দুই গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দুজনকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত করা হয়।

১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে গঠিত প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে ১৯৬৭সালের নভেম্বর মাসে। তৈরি হয় পি.ডি.এফ (Progressive Democratic Front) সরকার। এই সরকারের মধ্যে সি.পি.আই, আর.এস.পি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বামপন্থী দলগুলি যুক্ত হয়। ফলে, যে সমস্ত বামপন্থী দল পি.ডি.এফ. সরকারের সঙ্গে যুক্ত হল না তাদের সাথে যুক্ত হওয়া বামপন্থী দলগুলির এবং তাদের গণসংগঠনগুলির মধ্যেকার বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করে। জনগণের আন্দোলনের চাপে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ২১ফেব্রুয়ারি পি.ডি.এফ সরকারকে বাতিল করে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ৯ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবাংলার মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়। নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই সরকারের কর্মসূচীগুলি রূপায়নের

প্রশ্নে মহিলা সমিতির কর্মীদের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সমিতির মধ্যে যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল তা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৭০খ্রিষ্টাব্দে৭-৮ই মার্চ সমিতির ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলনের আগে বামগোষ্ঠীর মহিলাদের সমর্থক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদিকা জ্যোতি চক্রবর্তী একসাথে পত্রিকাতে এই দ্বন্দ্বের কথা প্রকাশ্যে প্রকাশিত করলেন।[৮৪] দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করলে দক্ষিণপন্থী মহিলারা তার বিরোধিতা করেন বলে জানা যায়। ফলে সংগঠনের কাজকর্ম মিলিতভাবে চললেও সংগঠনের মধ্যেই পাল্টা সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে।

ফলে ১৯৭০ সালে সমিতির ত্রয়োদশ রাজ্যসম্মেলন দুটি পৃথকভাবে হয়। বামপন্থী মহিলাদের সংগঠন এই প্রথম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। বামগোষ্ঠীর মহিলারা তাঁদের সমিতির নামকরণ করেন ‘পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি’। আর দক্ষিণপন্থী মহিলারা ‘পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি’ রেখে দেন। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলন হয় ৭ই মার্চ মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে। আর পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সম্মেলন হয় নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটে। যুগ্ম সম্পাদিকা বেলা লাহিড়ী একটি ইশ্‌তেহার বিলি করেন সম্মেলন উপলক্ষ্যে। তার থেকে জানা যায় সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন রেণু চক্রবর্তী, গীতা মুখার্জী, ইলা মিত্র, অপরাজিতা গোপ্পী প্রমুখ। ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের নেত্রীদেরও উপস্থিত থাকার কথা জানা যায়।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ১৯৭১খ্রিষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে প্রকাশিত গঠনতন্ত্র থেকেও এই দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার সমিতির পতাকা, প্রতীক ও ফেস্টুনের সম্বন্ধেও জানা যায়।[৮৫] সমিতির মহিলা কর্মীদের দ্বন্দ্বের কারণে ১৯৬৭ সালে ‘ঘরে বাইরে’ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর ১৯৬৮ সালের মে মাসে (১৩৭৫ বঙ্গাব্দে) পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ‘একসাথে’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। যা আজও বিদ্যমান রয়েছে।[৮৬]

১৯৭০ সালে ৯-১৫ ই ফেব্রুয়ারি ২৪ পরগণা জেলার গারুলিয়ায় (নোয়াপাড়া) অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্লেনামে উপস্থাপিত রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সভ্য সংখ্যা ছিল ৪৩,০০০ হাজার, তা বেড়ে ১৯৭০ সালে দাঁড়ায় ৬৫,০০০। পার্টি সদস্য বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট কোটা ঘোষণা করেছিল ১লাখ।[৮৭] সমিতির মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী রসিদ বিলি

করে ১,৩৮,০০০টি। আর বাম গোষ্ঠী বিলি করে ১,০৮,০০০টি।[৮৮] তাই মোট সদস্যপত্র বিলি হয় ২,৪৬,০০০। এই প্লেনামে মহিলা ফ্রন্টের পক্ষ থেকে শ্রীমতী জ্যোতি চক্রবর্তী রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে পার্টিকে মহিলা ফ্রন্টের উপর জোর দেওয়ার কথা বলেন। জানা যায়, কলকাতা, হুগলী, বর্ধমান জেলায় পার্টি টিম আছে কিন্তু রাজ্যগতভাবে এর অস্তিত্ব খুবই দুর্বল। কনক মুখার্জী জানান যে, একসাথে পত্রিকাকে ভিত্তি করে মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।[৮৯]

ইতিমধ্যে জাতীয় পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী পদত্যাগ করলে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে। ১৯শে মার্চ পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রপতির শাসন শুরু হয়। রাষ্ট্রপতি শাসনে পশ্চিমবাংলায় মহিলাদের সাংগঠনিক অবস্থা কেমন ছিল তা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলনে উত্থাপিত রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট থেকে খানিকটা জানা যায়। ১৯৭২খ্রিষ্টাব্দে ১৬-২০ শে জানুয়ারি বাসে মেদিনীপুর শহরে এই সম্মেলন হয়। রিপোর্ট থেকে মহিলাদের নানা আন্দোলনের কথা যেমন জানা যায়, তেমনই যে সমস্ত এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টির পুরুষ কর্মীদের কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে সেখানে মহিলাদের সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তথ্য থেকে জানা যায় বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকা, কলকাতার উত্তর বেলেঘাটা, বাগবাজার, কসবা, তিনজলা, ২৪ পরগণার হালতু, বরানগরের কয়েকটি এলাকা, ন'পাড়া, যাদবপুর, গরফা প্রভৃতি এলাকা ছিল উল্লেখযোগ্য। আবার রাষ্ট্রপতি শাসনে পুলিশ, সি.আর.পি-র গুলি ও দুষ্কৃতিদের আক্রমণে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ছয়জন কর্মী নিহত হন- কাশীপুরের বীথি দে, দমদমের অঞ্জলি ঘোষ, ধাপার মহারানী সাঁতরা, জলপাইগুড়ির (ধূপগুড়ি) মঙ্গলেশ্বরী রায়, বহড়ার মালতী মজুমদার, মিএগ্রা বাগান (কলকাতা) -এর শিপ্রা সাহা। এছাড়া, যে সমস্ত কমিউনিস্ট মেয়েরা সংগঠিত আক্রমণের শিকার হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন উমা আঢ্য, পারুল বসু, লতিকা নিয়োগী, ঝর্ণা দাশগুপ্ত, ক্ষমা ভট্টাচার্য, অসীমা পোদ্দার প্রমুখ। আক্রান্ত হন কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা নেত্রী ও গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভানেত্রী ৭১ বৎসর বয়স্কা (কাকীমা) জ্যোতি চক্রবর্তী।[৯০] রিপোর্ট থেকে জানা যায় বর্ধমান, হুগলী, ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলে ও কলকাতার উপকণ্ঠে ধাপার কৃষক মেয়েদের লড়াই উল্লেখের দাবী রাখে। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে ১লা জুন পুলিশের সঙ্গে লড়াই-এ কৃষক রমনী মহারানী সাঁতরা নিহত হন। বর্ধমানের হাটগোবিন্দপুর, মীরেরপাড়া, সহজপুর, বিজুর, মঙ্গলকোট, গলসী, বীজপুর, সুলতানপুর প্রভৃতি গ্রামে ক্ষেতমজুর মেয়েদের উপর সি.আর.পি পুলিশের আক্রমণের বিরুদ্ধে মহিলারা লড়াই করেন। হুগলীর পাণ্ডুয়া, হরিপাল, ধনিয়াখালি,

মালদহের কালিয়াচক, নদীয়ার আড়াঘাটা, ধুবুলিয়া, হাওড়ার বাগনান, চব্বিশ পরগণার ক্যানিং, সোনারপুর, বারুইপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ক্ষেতমজুর মেয়েদের প্রতিরোধ উল্লেখের দাবি রাখে। এইসমস্ত প্রতিরোধ থেকে সেইসময়ে কৃষক ও ক্ষেতমজুর মহিলাদের মধ্যে সাংগঠনিক শক্তির প্রসার যে হয়েছিল তা কিছুটা উপলব্ধ হয়।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ১৯৭০খ্রিষ্টাব্দে ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলনের সময় সভ্য সংখ্যা ছিল ১,১৩,৭২৬জন। তারপর ১৯৭২ সাল অর্থাৎ পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে বিভিন্ন জেলায় নতুন রসিদ বই যায় প্রায় দুইলক্ষ। ১৯৭১খ্রিষ্টাব্দে ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত জমা পড়া সদস্যসংখ্যা থেকে বিভিন্ন জেলায় পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সাংগঠনিক শক্তি কেমন ছিল তা জানা যায়।

ক্রমিক নং	**জেলার নাম**	**জমা পড়া সদস্য সংখ্যা**
১।	কলকাতা	১১০৪০
২।	বর্ধমান	৭৪০০
৩।	হাওড়া	৮০৫০
৪।	হুগলী	৪৯৫০
৫।	নদীয়া	২১২৫
৬।	বাঁকুড়া	৫৮৯
৭।	মেদিনীপুর	১৬৮০
৮।	মালদহ	৫২৫
৯।	বীরভূম	৬০০
১০।	দার্জিলিং	২৫০০
১১।	মুর্শিদাবাদ	৫০০
১২।	২৪ পরগণা	৩০,৬৬৭
		মোট ৭০৬২৬

উপরের ১২টি জেলায় সক্রিয় জেলা কমিটি ছিল। কোচবিহার, দিনাজপুর, পুরুলিয়া ও জলপাইগুড়িতে জেলা কমিটি ছিল না। বারটি জেলায় পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির প্রায় ৬০০টি প্রাথমিক কমিটি ছিল।

জানা যায় ১৯৭০-১৯৭২খ্রিস্টাব্দ এই দুই বৎসরে সবচেয়ে মহিলা সংগঠনের প্রসার ঘটেছিল ২৪পরগণা ও হাওড়া জেলায়। ১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলনের সময় ২৪পরগণায় কোন জেলা কমিটি ছিল না। স্থানীয় সংগঠন বিদ্যমান ছিল মাত্র। কলকাতার উপকণ্ঠে ২৪পরগণা জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব থাকায় মহিলা 'সংগঠনও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে বলে জানা যায়।

জানা যায় হাওড়া জেলায় মহিলাদের সংগঠন দুর্বল ছিল। পার্টির প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে মহিলাদের সংগঠনও বাড়তে থাকে। বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোলে শ্রমিক মহিলাদের ও পরিবারের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির যোগাযোগ ছিল উল্লেখযোগ্য। যদিও দুর্গাপুর মহিলা সমিতি পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু সহযোগী হিসাবে কাজ করেছে বলে জানা যায়। আবার সব জেলার মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সংগঠিত ও প্রতিটি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে হুগলীর মহিলা সমিতি। নদীয়ার উদ্বাস্তু শিবিরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সংগঠন গড়ে উঠেছিল। কলকাতা জেলাতেও রাজনৈতিক অস্থিরতা ও গুপ্তহত্যার প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে মহিলা সমিতির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

তবে, এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির প্রভাব বাড়লেও মহিলা ফ্রন্টে সংগঠিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য বা জেলা স্তরে গড়ে উঠে নি। রাজ্য বা জেলাস্তরে মহিলা ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে কোন সর্বক্ষণের কর্মী ছিল না। তার মূল কারণ হিসাবে রিপোর্টে বলা হয় বহু মহিলা সমিতির মধ্যে এলেও তাঁদেরকে শিক্ষিত করে সুযোগ্য কর্মী ও নেতৃত্ব তৈরি করা হয় না। তাছাড়া সর্বত্র অর্থাৎ অঞ্চল থেকে জেলা এমনকি রাজ্য কাউন্সিল সভাতেও পার্টি নেতৃত্বরা বসে থেকে মহিলা সমিতির বিষয়গুলো ঠিক করে দেন। মহিলাদের প্রকৃত সাংগঠনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে কর্মী ও নেত্রী তৈরি করতে না পারলে এই দুর্বলতা কাটানো সম্ভব নয় বলে রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়। এই দুর্বলতা কাটানোর জন্য সম্মেলনে মহিলা ফ্রন্টের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয় গণসংগঠনের সামাজিক ভিত্তি ব্যাপক ও দৃঢ় করার জন্য সর্বতোমুখী ব্যাপক ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আর বিভিন্ন সহযোগী পার্টির গণসংগঠনগুলির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতিকে যৌথভাবে অত্যাচারিত এলাকাগুলিতে প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার সংগঠনে যুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে।[৯১]

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের সময় বামপন্থী মহিলাসংগঠনগুলি যৌথভাবে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকে। তাই, ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে

একটি যুক্ত মহিলা কনভেনশন হয়। এই কনভেনশনের যুগ্ম আহ্বায়িকা ছিল পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ এবং নিখিলবঙ্গ মহিলা সভা। মহিলা কনভেনশন থেকে রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটিয়ে নির্বাচনের দাবী তোলা হয়। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে ১৯৭২খ্রিষ্টাব্দে ১১মার্চ পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতা লাভ করে।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন থাকে। জানা যায় এইসময় কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির উপর আক্রমণ চলে ফলে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ১৪জন মহিলাকর্মী সহ ১৭জন নারী প্রাণ হারান।[৯২] আহত ও নির্যাতিত হন বেশ কয়েকজন। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে বামপন্থী মহিলা সংগঠনগুলির যৌথভাবে প্রতিরোধ গড়ার সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন- ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ২৬সেপ্টেম্বর নারী নির্যাতনের প্রতিবাদসহ আরো কয়েকটি দাবী নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি,নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ, মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ, অগ্রণী মহিলা পরিষদ ও অগ্রগামী মহিলা সমিতি- এই পাঁচটি বামপন্থী মহিলা সমিতি একত্রে সমাবেশ করে।[৯৩] ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ১৫জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ, মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ, অগ্রণী মহিলা পরিষদের কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে কলকাতায় এক সমাবেশ ও মিছিল হয় ভিয়েতনামের সমর্থনে। অর্থাৎ ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে থেকে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে এই পাঁচ বছর বামপন্থী মহিলারা সংগঠনগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়।

ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত হয়ে আন্দোলন করার পাশাপাশি বামপন্থী মহিলা গণসংগঠনগুলি প্রত্যেকে নিজ নিজ সংগঠনের ব্যাপ্তি ও সাংগঠনিক শক্তির ভিতকে দৃঢ় করা, মহিলাদের মধ্যে প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করে। তাই, দেখা যায় ১৯৭৩সালের ২০-২২ এপ্রিল ২৪পরগণা জেলার মধ্যমগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির চতুর্দশ সম্মেলন হয়। সম্মেলনের সময় পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ২,২১,৬৩২। ১৯৭০ সালে ত্রয়োদশ সম্মেলনের সময় সমিতি ভাগ হয়ে যাবার পর সমিতির প্রসার ঘটে। ১৯৭৩ সালে চতুর্দশ সম্মেলনের সময় প্রায় দেড়লক্ষ সভ্যার বৃদ্ধি ঘটেছিল।[৯৪] পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলার মধ্যে পশ্চিম দিনাজপুর ছাড়া ১৫টি জেলা থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন বলে জানা যায়। এর থেকে বোঝা যায় রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলায় পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সংগঠনের ব্যাপ্তি ঘটেছিল।[৯৫]

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির চতুর্দশ সম্মেলনের দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষা বিভিন্ন

জেলার নেত্রী কর্মীদের যে উৎসাহ করে এবং তারফলে সংগঠনকে যে জেলায় জেলায় শক্তিশালী করার চেষ্টা চলে তা বিভিন্ন জেলার নেত্রীদের লেখা থেকে প্রকাশ পায়। যেমন কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষে কণিকা গাঙ্গুলী লেখেন "সম্মেলন থেকে ফিরে এসে সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্মীরা এলাকায় এলাকায় সমিতির কর্মী ও সাধারণ সভ্যাদের সভা থেকে এবারকার সম্মেলনের শিক্ষা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।"[৯৬]

সত্তরের দশকের মেদিনীপুর জেলার পশ্চিবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সম্পাদিকা নন্দরানী ডল লেখেন—"বিগত সাধারণ নির্বাচনের পর এত সন্ত্রাস থাকা সত্ত্বেও মহিলা সমিতির ডাকে সেই কৃষক মেয়েরা এসেছেন। কৃষক আন্দোলনসহ সমস্ত গণ আন্দোলনগুলিতেই মেয়েদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।"[৯৭]

১৯৭২-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সাংগঠনিক রূপ কেমন ছিল তা জানা যায় ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ৫ই-৯ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ত্রয়োদশ সম্মেলনে উত্থাপিত মহিলা ফ্রন্টের রিপোর্ট থেকে।[৯৮] জানা যায় ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির চতুর্দশ সম্মেলনের পর বাৎসরিক সভ্যা সংগ্রহের প্রথা চালু হবার পর থেকে বছরে ৮০ হাজারের বেশী সভ্যা হয়নি। ১৯৭৫খ্রিষ্টাব্দে -১৯৭৭খ্রিষ্টাব্দে জরুরী অবস্থার সময় সভ্যা সংগ্রহ সবচেয়ে কম হয়। ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে নতুন সভ্যা সংগ্রহ হয় ৪৩হাজার। ১৪টি জেলাতে সমিতির শাখা ছিল। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সমিতির সংগঠন খুবই দুর্বল। কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে সমিতি নামে টিকে ছিল। সমিতির সংগঠন ছিল না পশ্চিম দিনাজপুর ও পুরুলিয়াতে। যে সমস্ত জেলাতে সমিতি শক্তিশালী ছিল সেগুলি হল হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, ২৪পরগণা। জানা যায় জেলায় জেলায় মহিলা সংগঠনের প্রসার ঘটার বাস্তব পরিস্থিতি থাকলেও জেলাগতভাবে পার্টি নেতৃত্বের বিশেষ উদ্যোগ না থাকায় তার প্রসার ঘটেনি। মহিলা ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও খুবই দুর্বল ছিল। সর্বক্ষণের কর্মীর খুবই অভাব ছিল। যে পরিমাণ কাজের জন্য কর্মীর দরকার ছিল তা ছিল না।

মহিলা কর্মীদের সাংগঠনিকভাবে শিক্ষিত করার জন্য ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ ও ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পার্টির রাজ্য নেতৃত্বের পরিচালনায় দুটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবির সংগঠিত হয়। জেলায় জেলায় কিছু কিছু পার্টি স্কুল থাকলেও সাধারণ কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যে দরকার ছিল তা রিপোর্টে বলা হয়। এর থেকে গণসংগঠনের একটা চিত্র পাওয়া যায়।[৯৯]

কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মহিলা ফ্রন্টের অবস্থা কেমন ছিল তাও প্রকাশ পায় রিপোর্টে।

জানা যায় মহিলাফ্রন্টের কোন কেন্দ্রীয় সাব কমিটি বা পার্টি টিম ছিল না। গণসংগঠনের ফ্রাকশনও ছিল না। তাই জেলাভিত্তিক মহিলা পার্টি সভ্যার কোন রিপোর্ট সম্মেলনে মহিলা ফ্রন্ট উপস্থাপিত করতে পারে নি। রিপোর্টে মহিলা ফ্রন্ট থেকে অভিযোগ করা হয় পার্টিগতভাবে কোন দায়িত্বের মধ্যে মহিলা ফ্রন্টের নেতৃত্বকে সংগঠিত করা হয়নি।

মহিলা ফ্রন্ট থেকে বিগত ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে একাদশ রাজ্য সম্মেলন ও ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলনে পার্টির বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল ত্রয়োদশ সম্মেলনেও পার্টির সাবেকী ও সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র সমালোচনা করা হয় বলে তথ্য থেকে জানা যায়। পার্টির নেতৃত্বরা পার্টি সংগঠন ও সামাজিক দায়িত্বশীল সংগঠন থেকে মহিলাকর্মীদের বাদ দেওয়ায় মহিলা ফ্রন্টের মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে না ওঠার কারণ বলে অভিযোগ করা হয়। ব্লক কমিটি, পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন থেকে শুরু করে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরের মধ্যে নারীদের এনে সামাজিক ও প্রশাসনিক কাজে শিক্ষিত ও যোগ্য করে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই কাজ সমগ্র পার্টির মধ্যে সঞ্চারিত করা প্রয়োজন বলে দাবি করা হয়। এই ক্রুটির জন্য পার্টি সংগঠনের ও নেতৃত্বের দিক থেকে মহিলা ফ্রন্টের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।[১০০]

পার্টি নেতৃত্বের নজরদারি ঠিকমত না থাকলেও ১৯৭৫ সালের ২৮-৩০ মার্চ জেলার সালকিয়াতে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির পঞ্চদশ রাজ্য সম্মেলন হয় বলে তথ্য থেকে জানা যায়। রাষ্ট্র সংঘ থেকে আবার ১৯৭৫ সালটিকে ‘আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ’ হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এই পটভুমিকায় পঞ্চদশ রাজ্য সম্মেলনে নানা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে মোট ১৯টি প্রস্তাব গৃহীত হয় বলে জানা যায়। যার মধ্যে কয়েকটি হল- আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ, খাদ্যসংকট ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি,বেকার সমস্যা, নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, বন্দীমুক্তি, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ইত্যাদি।

১৯৭৫সালের ২৫জুন আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয় । জরুরী অবস্থার সময় সভা-সমিতি মিছিল সমাবেশের অবাধ গতি না থাকায় মহিলারা সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচী নেন বলে জানা যায়। যেমন- কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ পালন, ১৯৭৬খ্রিষ্টাব্দে ২৯শে আগস্ট কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু উপলক্ষে নানা সভা-সমিতির আয়োজন ইত্যাদি। ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৬-২২মার্চ ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষিত হলে জরুরী অবস্থার অবসান হয়। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের পরিবর্তে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত

হয়। ১৯৭৭খ্রিষ্টাব্দে ১১ ও ১৪জুন অষ্টম বিধানসভার নির্বাচন হয় পশ্চিমবঙ্গে। এই নির্বাচনে বামপন্থী দলগুলিকে নিয়ে গঠিত বামফ্রন্ট সরকার গঠন করে। সরকার গঠনের পরই সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দিলে মহিলা সংগঠনের নেত্রী ও কর্মীরা মুক্তি পায়। তথ্য থেকে জানা যায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্বায়ত্তশাসনের বিস্তার ঘটানোর জন্য ১৯৭৮ সালের জুন মাসে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সংগঠিত করলে প্রায় ২০০জন মহিলা পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে নির্বাচিত হন। তাছাড়া সরকারী তরফে ঘোষণা করা হয় মহিলারা পঞ্চায়েতের মধ্যে নির্বাচিত না হলে দুজন করে মহিলা সদস্য সরকার মনোনয়ন করবেন। ফলে, গ্রামোন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজে ধীরে ধীরে মহিলারা যুক্ত হতে থাকেন। তারফলে দেখা যায় যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মহিলাদের সংগঠনের সাংগঠনিক শক্তি আগের তুলনায় বৃদ্ধি পায়।

মন্তব্য:

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ১৯৪৭খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৭খ্রিস্টাব্দ মধ্যে বামপন্থী মহিলাদের সাংগঠনিক রূপ বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়েছিল। মহিলা সংগঠনের প্রতিবেদন ও সম্মেলনের বিবরণীগুলো এ সম্পর্কে বহু তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরে। প্রাথমিকপর্বে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মধ্যে তাঁরা নিযুক্ত হয়ে নিজেদের ধীরে ধীরে সংগঠিত করতে থাকেন। মূলত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও পীড়িতদের সেবা করার লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা সংগঠিত হলেও ধীরে ধীরে সাংগঠনিক ছত্রছায়ায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁরা কর্মসূচী গ্রহণ করেন। আর এই কর্মসূচীগুলি পালনের মধ্য দিয়ে সংগঠনে মহিলাদের আনার চেষ্টা করেন। বামপন্থী মহিলাদের মূল লক্ষ্য দেখা গিয়েছে শ্রমজীবী ও কৃষক মহিলাদের সংগঠনে নিয়ে আসার চেষ্টা। সেক্ষেত্রে তাঁরা পুরোপুরি সফল না হলেও সেই সময়ের পরিস্থিতিতে তাঁদের এই প্রচেষ্টা নারী আন্দোলনে একটি ইতিবাচক দিক।

স্বাধীনতার পর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মধ্যে থেকে বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়িত করতে গিয়ে সরকারের প্রতি সমিতির দৃষ্টিভঙ্গী কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। ফলে, সমিতি থেকে অনেকেই সরে যাওয়ায় সমিতির সাংগঠনিক শক্তি আগের তুলনায় অনেক কমে যায়। আবার সমিতিকে বেআইনী ঘোষণার পর চাপের মধ্যে থেকেও মহিলারা বিভিন্ন কাজে যুক্ত থাকেন। কারাগারে অনেকে বন্দী থাকলেও কারাগারের বাইরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সমিতির কাজ যেমন চালিয়ে নিয়ে যান তেমনই সমিতির মধ্যে ঐক্যকে ধরে রাখার

চেষ্টা করেন — যা সংগঠনগত দিক থেকে সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এক সদর্থক বৈশিষ্ট্য।

এই সময়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র নামের পরিবর্তন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আত্মরক্ষার তাগিদে গড়ে ওঠা এই সংগঠনটির নামের সাথে 'আত্মরক্ষা' কথাটি ছিল প্রাসঙ্গিক। কিন্তু স্বাধীনতার পর এই প্রাসঙ্গিকতা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাই 'আত্মরক্ষা' কথাটি বাদ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গে মহিলা সমিতি।

বামপন্থী মহিলা সংগঠনে আদর্শগত মতপার্থক্য ১৯৬০এর দশকের শেষভাগের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। স্বাধীনতার কিছু পর থেকেই এই বিরোধের যে সূচনা হয়েছিল তা হেনা বেরা কর্তৃক বেলা লাহিড়ীকে লেখা চিঠি থেকেই জানা যায়।[১০১] তারফলে, সংগঠন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি পৃথক মহিলা সংগঠনের সৃষ্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ও পশ্চিবঙ্গ মহিলা সমিতি নামে দুটি সংগঠন পৃথকভাবে কাজ করে যেতে থাকে। আর সংগঠনের মধ্যে এই বিরোধ নিঃসন্দেহে বামপন্থী মহিলাদের সাংগঠনিক শক্তিকে বেশ দুর্বল করে দিয়েছিল। তেমনই নারী আন্দোলনের এই পর্যায়টিকে একটি সমস্যাসঙ্কুল অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

আবার, সত্তরের দশকের সূচনা থেকেই পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বামপন্থী নারী সংগঠনগুলি সমস্ত বিরোধ ভুলে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করে। এরফলে খাদ্যসংকট, ভূমিসংস্কার, মহিলাদের বিভিন্ন দাবিসহ ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মতো বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁদের আন্দোলন অনেক বেশী শক্তি অর্জন করেছে। বামপন্থী নারী সংগঠনগুলির অস্তিত্ব যখন বিপন্ন তখন তাঁদের মিলিত কর্মসূচী তাঁদের সংগঠনকে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সাহায্য করেছে — যা সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এক সদর্থক বৈশিষ্ট্য।

বামপন্থী নারী সংগঠনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল নারী সংগঠনগুলি মূলতঃ পরিচালিত হত বামপন্থী দলগুলির দ্বারা। ফলে, বামপন্থী দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব পড়েছে নারী সংগঠনেও। নারীফ্রন্ট থেকে বামপন্থী দলগুলির বিরুদ্ধে সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গীর অভিযোগ আনা হয়েছে বারবার। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিকতার ঝোঁক থেকে বামপন্থী দলগুলি বেরিয়ে নাআসায় নারী ফ্রন্টের প্রতি তাচ্ছিল্য মনোভাব কাজ করেছে এবং তারফলে নারীফ্রন্টের সংগঠনের ব্যাপ্তি ও শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে তা প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, বলা যায় সমস্ত সময়কাল জুড়ে নারী সংগঠন প্রত্যক্ষ করেছে বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বামপন্থী মহিলারা বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সংগঠনের অস্তিত্বকে অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, যা ভবিষ্যতে সংগঠনগত দিক দিয়ে আরও পরিণত হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, এন.বি.এ.,২০০৫ পৃ.১০০

২. বসু জ্যোতি, যতদূর মনে পড়ে, পৃ.৪২

৩. মজুমদার মঞ্জুকুমার ও চক্রবর্তী ভানুদেব, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৬৫

৪. বিশ্বাস অনিল,বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, এন.বি.এ - ২য় খণ্ড, পৃ.৬৫-৬৬

৫. বিশ্বাস অনিল, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫০

৬. পুলিশ ফাইল নং - 898/44 (1) District Intelligence Branch, Bankura the 8th Nov.1950, No. 4201/95-48 (154) R. 2184 , File No.-1628/49, Copy of Memo No. 167/1 (4) S.B. dated 25.1.51 from the Superintend, Presidency Jail to the Asst. Secy. to the Govt. of West Bengal Home (Special) Dept.

৭. মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা; পৃ. ১০৪

৮. মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা

৯. সেনগুপ্ত অমলেন্দু, উত্তাল চল্লিশ, পৃ. ২৩২, ‘মজুমদার মঞ্জুকুমার ও চক্রবর্তী ভানুদেব’ বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, ৫ম খণ্ড, পৃ.২৬৬

১০. চক্রবর্তী রেণু, ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা, পৃ. ৯১

১১. ঘরে বাইরে, ১৩৫৯-১৩৬০, পৃ. ৪৬৫

১২. মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ. ১০৫

১৩. চক্রবর্তী রেণু, ভারতীয় নারী আন্দোলনে বাংলার কমিউনিস্ট মহিলারা, পৃ. ৯৩-৯৪

১৪. মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ. ১০৫

১৫. দেশহিতৈষী, ১৩৯৮, পৃ.১২৩

১৬. দেশহিতৈষী, ২০০৬, পৃ. ২০৩

১৭. সেন মণিকুন্তলা, সেদিনের কথা, নবপত্র প্রকাশনা, ১৪৮-১৪৯

১৮. মঞ্জিল, ১৯৪৯ সালের ২৪ জুলাই

১৯. চক্রবর্তী রেণু, ভারতীয় নারী সম্মেলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা (১৯৪০-১৯৫০) পৃ. ৯৭-৯৯

২০. বিশ্বাস অনিল, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯২

২১. ঘরে বাইরে, ১৩৫৯, ফাল্গুন, ১ম সংখ্যা।

২২. রাজ্য কমিটি পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, সাতাশে এপ্রিল, ১৯৮৫ সালের ২৭শে এপ্রিল

২৩. মতামত, ২১ এপ্রিল, ১৯৫০

২৪. মতামত, ২৬শে মে, ১৯৫০

২৫. পুলিশ ফাইল নং ১৬২৮/৪৯, প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেণ্ডেন্ট লেখেন— "The undersigned begs to report the female of detenus named below have been released from this jail on the 23rd January, 1951under the orders of the Hon'ble High Court, Calcutta, dated 22nd January, 1951 for warded under No.587 cr.dated 22.1.51

২৬. মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব চক্রবর্তী, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৩৭৯

২৭. বিশ্বাস অনিল,বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৩

২৮. মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব চক্রবর্তী, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৭৭২-৭৭৫

২৯. বিশ্বাস অনিল, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০৬-৪০৭

৩০. মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ. ১১২

৩১. বিশ্বাস অনিল, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮১

৩২. ঘরে বাইবে, ১৩৫৯/৬০ ১ম সংখ্যা পৃ.৩২

৩৩. পুলিশ ফাইল নং - ৩৮৯০/৪৯, Report dated 3.5.53 regarding the open peace session of the Bengal Preparatory Conference of the World Congress of Women held at the University Institute Hall.

৩৪. ঘরে বাইরে, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, ২য় বর্ষ, ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা

৩৫. দিল্লী সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় 'ঘরে বাইরে' তে ১৩৫৯-৬০; ২য় বর্ষ; ৩য়-৪র্থ সংখ্যায়। মণিকুন্তলা সেনের লেখা- 'ডেনমার্ক সম্মেলনের প্রস্তুতিতে ভারতের নারী' - শীর্ষক প্রবন্ধে সম্মেলনের বর্ণনা রয়েছে।

৩৬. ঘরে বাইরে, ১৩৫৯-৬০, ২য় বর্ষ, পৃ. ১৮৭

৩৭. ঘরে বাইরে, ১৩৫৯-৬০, ২য় বর্ষ, পৃ. ৩২৪

৩৮. ঘরে বাইরে, ১৩৫৯-৬০, ২য় বর্ষ, পৃ. ৩২৫

৩৯. মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ.১২৩-১২৮

৪০. ঘরে বাইরে, মাঘ, ১৩৬১

৪১. পুলিশ ফাইল নং - ৬১৯/৩৬, Copy of a Cyclostyled letter in English dated 30.6.55 in a Book Post Cover addressed to the Editor, Swadhinata, 33 Alimuddin Street, Calcutta16, issued Hazra Begum, Anasuya Gyan Chand, National Federation of Indian Women, 10-B, Asif Ali Road, New Delhi, Intercepted at Park Street P.O on 13.7.55 bearing Postal Seal of issue New Delhi - dated 11.7.55- National Federation of Indian Women.

৪২. পুলিশ ফাইল নং- ৬১৯/৩৬

৪৩. সেন মণিকুন্তলা, সেদিনের কথা, পৃ. ২২৮-২৪০ ও মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ. ১৩০-১৩১

৪৪. সেন মণিকুন্তলা, সেদিনের কথা, পৃ. ২২৮-২৪০

৪৫. ঘরে বাইরে, শারদীয়া, ১৩৬২

৪৬. পুলিশ ফাইল নং- ১৩৪০/৪৩ ও স্বাধীনতা - ৩০.৩.১৯৫৪

৪৭. পুলিশ ফাইল নং ১৩৪০/৪৩ Week ending Report/ D.I. B. Hooghly 2.4.1954

৪৮. মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ.১১৪

৪৯. ঘরে বাইরে; ফাল্গুন, ১৩৫৯

৫০. কনক মুখোপাধ্যায় - নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ. ১১৪-১১৮

৫১. পুলিশ ফাইল নং - ৬১৯/৩৬

৫২. পুলিশ ফাইল নং - ৬১৯/৩৬

৫৩. পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬। হাওড়া জেলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অষ্টম জেলা সম্মেলনের বিবরণ সুপারিনটেনডেন্ট অফ্ পুলিশ (হাওড়া) ও ডি.আই.বি-র তরফে পাঠান হয় ১১.১০.১৯৫৫ তারিখে এস.এস.আই.বি. (পশ্চিমবঙ্গ) কে। বিবরণটি থেকে সম্মেলন সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। Proceedings of the District conference of the MARS Howrah held on the 8th and 9th October, 1955. Forward under S.P., D.I.B., Howrah's Memo No., 5208/ 91-97 R. 4058dated 11.10.55 to S.S.I.B., W.B.

৫৪. মজুমদার মঞ্জুকুমার ও চক্রবর্তী ভানুদেব বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান;

নবম খণ্ড, পৃ.২১-২২

৫৫. পুলিশ ফাইল নং - ৮৯৮/৪৪(১), Copy of report of D.I.O. (I) dated 13.3.56

৫৬. পুলিশ ফাইল নং - ৮৯৮/৪৪(১)

৫৭. পুলিশ ফাইল নং - ৮৯৮/৪৪ (১), A letter dated 7.2.56 from Bela Lahiri of Paschim Banga Mahila Attyapaksha Samity 188/2, Bowbazar St. Calcutta 12. to Pankaja Deb Barma, Ganatantrik Nari Samity 37/2 Krishna Nagar, Po.- Agartala, Tripura

৫৮. পুলিশ ফাইল নং - ৮৯৮/৪৪ (১)

৫৯. ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩২

৬০. ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩২

৬১. কনক মুখোপাধ্যায়, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ. ১৪০-১৪১

৬২. ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩৩

৬৩. বিশ্বাস অনিল, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড,পৃ. ২৬০

৬৪. বিশ্বাস অনিল, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড; পৃ.২৬০

৬৫. পুলিশ ফাইল নং - ৮৯৮/৪৪(১)

৬৬. মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ. ১৪৫-১৪৬

৬৭. মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ. ১৪৫-১৪৬

৬৮. বিশ্বাস অনিল,বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য,তৃতীয় খণ্ড,পৃ. ৫৫১-৫৫২

৬৯. তদেব , পৃ. ৫৫১-৫৫২

৭০. মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ. ১৫২-১৫৩

৭১. মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ. ১৫৩

৭২. মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা , পৃ. ১৫৬

৭৩. বিশ্বাস অনিল,বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭২৪-৭২৯

৭৪. বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৩০-৭৩৬

৭৫. মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা , পৃ. ১৫৯-১৬০

৭৬. মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা , পৃ. ১৬০

৭৭. বিশ্বাস অনিল,বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬২-৪০২

৭৮. বিশ্বাস অনিল,বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭৪-৫৭৫

৭৯. বিশ্বাস অনিল,বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭৪-৫৭৫

৮০. 'সেদিনের কথা' তে মণিকুন্তলা সেন এই সমিতি গড়ে ওঠার বর্ণনা দিয়েছেন। তার থেকে জানা যায় যে, কলোনীগুলিতে নিত্য নতুন মহিলা সমিতি ও কর্মকেন্দ্র গড়ে উঠলেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য তাঁরা কেউই পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে যোগ দেন নি। তবে পরবর্তীকালে এঁরা সবাই দক্ষ কর্মী হয়ে ওঠে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

৮১. বিশ্বাস অনিল,বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭৫-৫৭৬

৮২. মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ. ১৬৯-১৭০

৮৩. মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। পৃ. ১৬৯-১৭০

৮৪. একসাথে, ফাল্গুন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে, 'পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির ঐক্য কারা ভাঙছে' শিরোনামে জ্যোতি চক্রবর্তী দুই গোষ্ঠীর মহিলাদের দ্বন্দ্বের কারণ বিশ্লেষণ করেন।

৮৫. পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি: গঠনতন্ত্র, আগষ্ট, ১৯৭১

৮৬. মুখোপাধ্যায় কনক, মনে মনে, একসাথে (তারিখহীন) পৃ. ১৯৩

৮৭. বিশ্বাস অনিল, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড; পৃ. ৬১৬

৮৮. বিশ্বাস অনিল, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড; পৃ. ৬১৬

৮৯. বিশ্বাস অনিল, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড; পৃ. ৬৩৭-৬৩৮

৯০. বিশ্বাস অনিল, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড; পৃ. ৭৮২ (১৯৬৮ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ রাজ্য সম্মেলনে মহিলা ফ্রন্ট সম্পর্কে যে হতাশাজনক চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছিল দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলনে নারীদের সংগ্রামে ব্যাপ্ত হওয়ার চিত্র পাওয়া যায় এই দলিলে।)

৯১. বিশ্বাস অনিল,বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৭৭৬-৭৮৭

৯২. বিশ্বাস অনিল,বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, পঞ্চম খণ্ড; পৃ. ৫২২

৯৩. মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ.২০৮-২১১

৯৪. বিশ্বাস অনিল,বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, পঞ্চম খণ্ড; পৃ. ৫২৪, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ত্রয়োদশ সম্মেলনের মহিলা ফ্রন্টের রিপোর্ট থেকে অনেক তথ্য জানা যায়।

৯৫. একসাথে; বৈশাখ, ১৩৮০, 'পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির চতুর্দশ সম্মেলনে' এই শিরোনামে সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ লেখেন - মঞ্জরী গুপ্ত।

৯৬. একসাথে, শ্রাবণ, ১৩৮০, 'কলকাতা জেলা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি' - এই শিরোনামে লেখাটি প্রকাশিত হয়।

৯৭. একসাথে, শারদীয়া, ১৩৮০, 'মেদিনীপুর কৃষক মেয়েদের সংগ্রামী ভূমিকা' - এই শিরোনামে নন্দরানী ডলের লেখা প্রকাশিত হয়। এর থেকে মেদিনীপুরের আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণের চিত্রটি পাওয়া যায়।

৯৮. বিশ্বাস অনিল,বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, পঞ্চম খণ্ড; পৃ. ৪৪৮।

৯৯. বিশ্বাস অনিল,বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, পঞ্চম খণ্ড; পৃ. ৫২৪।

১০০. বিশ্বাস অনিল,বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, পঞ্চম খণ্ড; পৃ. ৫২৪-৫২৬।

১০১. পুলিশ ফাইল নং - ৬১৯/৩৬ বেলা লাহিড়ীকে লেখা চিঠিতে হেনা বেরা লেখেন— "RCPI এর কমলা মজুমদারকে অবশ্য বলা ছিল যদি All India Committee র কিছু গঠন করা হয়। কিন্তু আমাদের সমিতির যে সভ্যা এসেছিলেন তিনি বললেন উনি নিজে বলা সত্ত্বেও কমলা এরা ওর সঙ্গেও কিছু আলাপ করেনি আমাকে খবর করা ত দূরের কথা। উনি যা বললেন তাতে বোঝা গেল সারা ভারতের চেহারা দেখে ওরা P বিরোধী দল একটা তৈয়ারী করার চেষ্টায় ছিল। যারফলে ওরা আমাদের নাম প্রস্তাব করেনি। অথচ আসামে আমাদের মহিলা সমিতিই সবচেয়ে Active । যাক ওসব বলে এখন লাভ নেই। তবে একটা বিষয় জানতে চাইছি। যদি আসাম থেকে আমাদের মহিলা সমিতির তরফ থেকে All India Committee - কে জানানো যায় তাহলে কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায় কি?"

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক আন্দোলনে বামপন্থী মহিলাদের ভূমিকা: (১৯৪৭-১৯৭৭)

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বহু ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ভারত তথা বাংলাকে। এরমধ্যে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির সাথে যুক্ত কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যাগুলি যেরকম ছিল, তার সাথে সমান্তরালভাবে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল চরম খাদ্যসংকট। বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি, টামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং বঙ্গবিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দিকটিও সমান প্রাসঙ্গিক ছিল।

কৃষক আন্দোলন ও বামপন্থী মহিলারা:

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ১৯৪৬-৪৭ সালে শুরু হওয়া তেভাগা ও অন্যান্য দাবিতে গ্রামাঞ্চলে কৃষক আন্দোলন। এই আন্দোলনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে কৃষক নারীরা এতে সক্রিয় ও সংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। গ্রামীন মহিলাদের নিয়ে এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিসহ বামপন্থী মহিলাদের ভূমিকার কথা জানা যায়।

অবিভক্ত বাংলাদেশে নিজের শ্রম ও মূলধন দিয়ে উৎপাদন করা ফসলের দুই তৃতীয়াংশ মালিকের কাছ থেকে নেওয়ার জন্য প্রায় ষাট লক্ষ ভাগচাষী বা বর্গাদার চল্লিশের দশকের সূচনায় যে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন—তা ইতিহাসে 'তেভাগা' আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯৪৬সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত দুটি পর্যায়ে অর্থাৎ প্রাক্ স্বাধীনতা পূর্বে ও পরে এই আন্দোলন ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাক্ ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলাদেশে চাষীই ছিল জমির মালিক। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ক্ষমতা দখলের পর জমিদাররা সমস্ত জমির মালিক হয়ে ওঠে। এই জমিদার জোতদারেরা সর্বগ্রাসীর মত জমি, দখলিস্বত্ব, ফসল সবই গ্রাস করে। ফলে, প্রচলিত কৃষিব্যবস্থা ধ্বংস হয়, কৃষকের স্থান অধিকার করে আধিয়ার ও ক্ষেতমজুর। গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৪৩জন বাসিন্দাই পরিণত হয় ভাগচাষীতে। মোট আবাদী জমির শতকরা ষাটভাগ হয়ে যায় বর্গাজমি।[১]

এই জমিদারেরা কালে কালে শহরবাসী হওয়ায় জমিভিত্তিক সম্পর্ক আর প্রত্যক্ষভাবে

জমিদার ও কৃষকের মধ্যে থাকে না। বহু মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয় যারা তাদের সুবিধা অনুযায়ী কৃষকদের সঙ্গে জমির নানারকম বন্দোবস্ত করে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নরকম নামকরণ হয়। যেমন— উত্তরবঙ্গে হয় আধিয়ার প্রথা, পশ্চিমবঙ্গে সাঁজা, খাড়াবাগ, মকরাবাগ (বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া, মেদিনীপুর), পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে টঙ্ক ও চট্টগ্রামে হয় গুলা প্রথা।[২] নামের বিভিন্নতা থাকলেও ভূমিহীন ভাগচাষীরা উৎপাদনের সমস্ত ব্যয় বহন করে ফসলের অর্ধেক হয় ফসলে নয়তো নগদে অনাবাসী জমিদার ও জোতদারদের খোলান বা খামারে তুলে দিতে বাধ্য হত। চাষের খরচের জন্য অর্থ কৃষককে দিতে হত। ফলে মালিককে অর্ধেক ফসল দেওয়ার পর বাকী অর্ধেক পূর্বের নেওয়া ঋণ সুদ সহ শোধ করে কৃষকের কাছে কিছুই থাকত না। এছাড়া, জোতদারের খোলা চাঁজা, গোলপূজো, মহলদারী, বরকন্দাজী, মণ্ডপ সেলামী, হাতিখোয়া, ঘোড়াখোয়া, সন্ন্যাসী খোয়া (এদের খাওয়ানোর খরচ),মাছ খাওয়ান,পালা-পার্বণ, যাত্রা, থিয়েটারের খরচ দিতে হত জোতদারকে। এই অবস্থায় মালিকের কাছে পরিবারের খোরাকির জন্য টাকা ধার না নিলে কৃষক ও তার পরিবার বাঁচতো না। পরের বছর সুদ সমেত সমস্ত ধার শোধ করতে না পারলে কৃষকের বসবাসের জায়গা পর্যন্ত নিলাম হয়ে যেত এবং তার জায়গায় অন্য ভাগচাষী বসত।[৩]

এই সমস্ত অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকদের ক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরে ধূমায়িত হচ্ছিল। সেই ক্ষোভ ফেটে পড়ে ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে। অবিভক্ত বাংলার ৬০লক্ষ কৃষক প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন এই সংগ্রামে। ১৯৪৬সালের খুলনা জেলার মৌভোগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার নবম-সম্মেলনে তেভাগায় আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়। ১৯৪৬ সালে ধান কাটার সময় হতে তেভাগার সংগ্রাম শুরু হয়।[৪]

আন্দোলনে আওয়াজ তোলা হয়— ১) আধি নাই, তেভাগা চাই, ২) বিনা রসিদে ভাগ নাই, ৩) পাঁচসেরের বেশী সুদ নাই, ৪) বাজে কোন আদায় নাই, ৫) জমি থেকে উচ্ছেদ নাই ইত্যাদি। ১৯৪০ সালে নিযুক্ত ভূমিরাজস্ব কমিশন এই দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করে সুপারিশ করেছিলেন— ক) মালিক ফসলের তিনভাগের এক ভাগের বেশী আদায় করতে পারবে না, খ) ভাগচাষীকে জমিতে প্রজাস্বত্ব দিতে হবে।[৫]

কমিশনের সুপারিশ তৎকালীন মন্ত্রীসভাও গ্রহণ করে বর্গাদারের উৎপন্ন ফসলের দুই তৃতীয়াংশের দাবিকে বিধিবদ্ধ রূপদানের জন্য একটি খসড়া বিল রচনা ও প্রচার করেছিল। কিন্তু তৎকালীন সুরাবর্দীর মন্ত্রীসভা বিলটি ধামা চাপা দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কারণ হিসাবে তাঁর বক্তব্য ছিল— “আমি জানতাম না যে, আমার দলে এত জোতদার রয়েছে।” অর্থাৎ জোতদার

জমিদারদের কাছে নতি স্বীকার করেই এই বিল ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল।"[৬]

তেভাগা আন্দোলন দিনাজপুর, যশোর, ময়মনসিংহ,জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা (কাকদ্বীপ ও মথুরাপুর) জেলায় তীব্র হলেও ১৯টি জেলার বহু জায়গাতেই এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল।[৭] কৃষকদের দাবী ছিল— ফসল তোলা হবে কৃষকের গোলায়, জোতদার বা জমিদারের গোলায় নয়। কারণ জমিদারের গোলায় তুললে জমিদার ভাগ করার আগেই সরিয়ে ফেলবে।

কৃষকদের দাবী ছিল—'জান দেব তবু ধান দেব না'। জোতদার জমিদাররা পুলিশ দিয়ে ফসল তুলতে লাগল। জমিদারদের বাড়ীতে বসল পুলিশ ক্যাম্প। স্বভাবতই ভাগচাষীদের রক্তে মাঠ লাল হতে থাকে বলে তথ্যে জানা যায়। আর যে কৃষক নিজের গোলায় ধান তুলতে পারত তার ধান লাঠি আর গুলির সাহায্যে কেড়ে নেওয়া হত। কোন কোন ক্ষেত্রে ধানের গোলা এমনকি ভাগচাষীর বাড়ী আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হত। মাঠের ধান কাটতে গিয়ে এবং গোলার ধান বাঁচাতে গিয়ে বহু কৃষক মারা যায়। আর সেইসঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন বহু কৃষক রমণী।[৮]

কৃষক রমণীরা দল বেঁধে পুরুষদের পাশে লড়াই করেন। আসলে, এই সমস্ত রমণীদের জীবন ছিল শোষিত ও নিষ্পেশিত। নিদারুণ দারিদ্র্যের চাপে নয়, এদের বিবাহিত জীবন পর্যন্ত পরিচালিত হত জমিদারদের খামখেয়ালীপনায়। আধিয়ারের গাছে উৎপাদিত ফসলের মতো তার স্ত্রী কন্যাও জোতদারের সম্পত্তি ছিল। জোতদার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তার বাড়িতে আধিয়ারের স্ত্রী কন্যাকে পাঠাতে হত।[৯] জোতদারদের শাসন, শোষণ, নির্বিচার, নির্যাতন ও ধর্ষণের ফলে কৃষক রমণীদের মনে যে ক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরে জমেছিল তারই বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি তেভাগা আন্দোলনে।[১০]

বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক মালেকা বেগম প্রাক্ তেভাগা যুগের এইরূপ একটি নগ্ন বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন তার লেখনীতে। তিনি দেখিয়েছেন জমিদার, মহাজন, জোতদাররা কৃষকের কাছ থেকে শুধু ফসল কেড়ে নিত না, কৃষকদের বউ, মেয়ের জীবন নিয়ন্ত্রণ করত, ভোগ করত ও নির্যাতন করত এরা। অভাবের তাড়নায় এবং ঋণশোধ করার তাগিদে কৃষক-বাবা মা মেয়েকে তুলে দিতে বাধ্য হত মহাজনদের হাতে। তাই ,দেখা যায় বাংলা তথা ভারতের গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে খেটে খাওয়া রমণীদের এত স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আর কোন আন্দোলনে দেখা যায়নি।

কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় কিষাণ সভার ডাকে তেভাগার দাবিতে মহিলাদের এগিয়ে

আসার নানা সংবাদ পাওয়া যায়। এইরকম একটি উদাহরণ পাওয়া যায় ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে পুরুষোত্তমপুরে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের যে সমাবেশ হয় তাতে অন্যতম বক্তা ছিলেন জুঁইফুল রায়।[১১]

পাশাপাশি এইসময় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে উঠতে শুরু করে।[১২] শহরের মহিলা নেতৃত্বরা এইসময় গ্রামের কৃষক মেয়েদের মধ্যেও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়তে শুরু করেন। নারী হিসাবে শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে সকল শ্রেণীর মেয়েদের সম্মিলিত সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে মেয়েরা সাগ্রহে গ্রহণ করেন। রাণী দাশগুপ্তের লেখা থেকে জানা যায় শহরের কমিউনিস্ট মেয়েরাও গ্রামে এসে মহিলা সমিতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষক মেয়েদের কৃষক সমিতিরও সদস্য করতে থাকেন।[১৩]

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মহিলা কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে হাটসভা করা, প্রচার করা এবং মেয়েদের সচেতন করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। দিনাজপুরের খাঁপুর, পচাগড় প্রভৃতি এলাকায় গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে থেকে তাঁদের জীবনে মিশে গিয়ে কাজ করেছেন মণিকুন্তলা সেন। খাঁপুরে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন রানী মিত্র, যশোদা রানী সরকার প্রমুখ।[১৪] মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তুলতে দিনের পর দিন একগ্রাম থেকে অন্যগ্রামে গেছেন মহিলা নেতৃত্বরা। পুলিশ খবর পেয়ে ধরার চেষ্টা করলে তাদের ঘোমটা দিয়ে চুলোতে বসিয়ে ধান সেদ্ধ করাতেন— যাতে পুলিশ না ধরতে পারে।[১৫]

বিপদের সময় নানা নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতেন মহিলারা — যাতে নেতৃত্বরা পালিয়ে যেতে পারেন। কোন মহিলাকে প্রসূতি সাজিয়ে সকলে তাকে ঘিরে থাকত। আবার কখনো রূপোর মল পায়ে পরিয়ে ঝুড়ি নিয়ে মাঠে অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে শিস কুড়োতে যেতে হত। এই রকম অভিনয় করতে করতে দূরের প্রান্ত দিয়ে পাশের গ্রামে নেত্রীকে পৌঁছে দিত মহিলারা।[১৬] এমনই এক অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় মেদিনীপুরে মেয়েদের সংগঠিত করার কাজে যাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য সেই বিমলা মাজীর কাছ থেকে। মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম থানায় প্রথম থেকেই মেয়েদের সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত ছিলেন বিমলা মাজী। প্রতিটি গ্রামে থাকত সংগ্রাম কমিটি। সেই সংগ্রাম কমিটির অধীনে থাকত কৃষক যুবদের ভলান্টিয়ার বাহিনী ও নারীবাহিনী। ভূপাল পাণ্ডার লেখা থেকে জানা যায় জোতদার-পুলিশের আক্রমণের প্রথম শিকার হয় মহম্মদপুর দাসপাড়ার পঞ্চায়েত খামার। বিমলা মাজীর নেতৃত্বে নারীবাহিনী দা, বঁটি,ঝাঁটাসহ ধূলো নুন লঙ্কার মিশ্রণ ছিটিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রতিরোধের ফলে জোতদার পুলিশ যৌথবাহিনী

পিছু হটতে বাধ্য হয়। নন্দীগ্রামের মহম্মদপুরের নারী বাহিনীর সাফল্য অন্যান্য এলাকার নারীদের উৎসাহিত করে। ভূপাল পাণ্ডা লেখেন— "সর্বত্র পুলিস প্রতিরোধে কৃষক রমণীগণ অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়েছেন। যেমন: পাঁশকুড়ার চকগোপালে চাষীদের খামার ভাঙায় পুলিশ বাহিনীকেও বর্গক্ষত্রীয় মেয়েরা ঐভাবে ঝাঁটাবঁটি নিয়ে প্রতিরোধ করে।"[১৭]

মেয়েরা শুধু যে ভলান্টিয়ার ছিলেন তাই নয়, এঁদের মধ্যে দুর্ধর্ষ ও কৌশলী নেত্রী সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন- দিনাজপুরের রানী শঙ্কাইলের রাজবংশী কৃষক বধূ জয়মণি ছিলেন এরূপ এক নেত্রী। মণি সিংহের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় যে, জয়মণির প্রতাপ ছিল দোর্দণ্ড। তাঁর দলের আক্রমণে পুলিশ অনেকসময় পালাতে বাধ্য হত। দিনাজপুরের আর একজন কৃষক রমনী নেত্রী ছিলেন দীপেশ্বরী! তাঁর নেতৃত্বে ভলান্টিয়ার বাহিনীর আক্রমণে পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়। শিখা বর্মণ, মাতি বর্মনী, জয় বর্মনী - প্রমুখ ছিলেন দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী রমণীরা।

যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার ওয়াখোল গ্রামের সরলবালা পাল ছিলেন আর একজন কৃষক নেত্রী। বণি সিংহের লেখা থেকে জানা যায়—" কৃষক আন্দোলনের একজন দুর্ধর্ষ নেত্রী ছিলেন সরলাদি, নমঃ শূদ্র কৃষক। যশোর জেলার নড়াইল মহকুমায় গুয়াখোলা গ্রামে ছিল তাহার বাড়ি। নড়াইলে তেভাগা আন্দোলন গড়িয়া ওঠে, তাহার কেন্দ্র ছিল বাকড়ি গ্রাম; সরলাদির যেমন ছিল সাহস তেমনি ছিল গায়ের জোর। পুরুষরাও তাঁহার কাছে হার মানিত। সরলাদি ২৫০/৩০০ মেয়ের একটি ঝাঁটা বাহিনী সংগঠিত করিয়াছিলেন। ঝাঁটার মুখে দুই-দুইবার পুলিশ বাহিনীকে মাফ চাহিয়া সরিয়া পড়িতে হইয়াছিল।[১৮]

রংপুরে কৃষক রমণীদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী দল তৈরি হয়েছিল— যা 'গাইন বাহিনী' নামে পরিচিত ছিল। গাইন কথার অর্থ ধান ভানবার মুগুর। জোতদার ও পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এই স্বেচ্ছাসেবী দল গাইন,কাটারি, বঁটি, কাস্তে, ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করত। তাই এই দলের নেত্রীকে 'গাইনী মাসী' বলা হত।[১৯]

জলপাইগুড়ি জেলার দেবীগঞ্জ থানাতে তেভাগার আন্দোলন তীব্র হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের কৃষক নেতা সমর গাঙ্গুলীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় দেবীগঞ্জে 'বুড়িমা'-র নেতৃত্বে মহিলারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। পুলিশ তেভাগার আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করতে এলে মহিলারা রুখে দাঁড়ান। অনুরূপভাবে পচাগড় থানা ও সীমান্তবর্তী সদর থানার মাণিকগঞ্জ, হরিমন্দির প্রভৃতি এলাকায় তেভাগা সংগ্রামে শিখা পালের নেতৃত্বে মহিলারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। ঝাঁটা,

বঁটি, গাইন, লঙ্কার গুড়া নিয়ে পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে মহিলারা বাধা দিলে পুলিশ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। তেভাগা সংগ্রাম যেখানে সংগঠিত হয়েছে সেখানে নারীরা সাহসিকতার সঙ্গে পুলিশ-জোতদারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।[২০]

শুধু মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিই নয় মহিলাদের সংগঠিত করার জন্য কৃষকসভার পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন এলাকার বৈঠক বসত। সাধারণভাবে জমিদারী প্রথা ও টংক প্রথা নিয়ে আলোচনা হত। খুব সোজা করে বোঝানো হলেও অনেক সময় মেয়েরা বুঝতে পারত না বলে দোভাষী রাখা হত। বৈঠকের পাশাপাশি দুপুরের পর মেয়েদের ক্লাস হত। এইরকমই এক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কৃষক নেতা মহম্মদ আবদুল্লাহ রসুলের লেখায়।[২১] তিনি দেখিয়েছেন গোপনে চারটি মেয়ে ক্লাসে আসত। একজন ছিলেন হজং নেতা ললিত সরকারের স্ত্রী মাণিক, আর একজন খেতমজুর কলাবতী। কলাবতী দারুণ লড়াকু ধরনের মেয়ে ছিল। পরে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে তাঁকে কলকাতায় আনা হয়। এই মেয়েদের ক্লাস হত তিনঘন্টা ধরে। খুব সহজ ভাষায় তাদের কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন এবং রাজনীতি বোঝানো হত।

কমিউনিস্ট নেতৃত্বদের শিক্ষাদানের ফলে গ্রামে গ্রামে নারীরা অনেক বেশী সচেতন হতে থাকেন। তাই, দেখা যায় নেতৃত্বদের শুধু পালাতে সাহায্য করা নয়, কর্মীদের খাওয়ানো, লুকিয়ে রাখা, পুলিশ তাণ্ডবের মুখোমুখি হওয়া, ১৪৪ ধারা অমান্য করে লাল ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে মিটিং মিছিল করা, জোতদারের দালালদের শাসানি ও ভয়ের কাছে মাথা নত না করে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, ধৃত-স্বামী পুত্রের স্থান গ্রহণ করে মাঠের ফসল ঘরে আনা, সর্বোপরি নিজেদের প্রাণ দান কোন কিছুতেই মহিলারা পিছপা হন নি। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ঘটনাগুলি সাধারণ মনে হলেও তৎকালীন পরিবেশে কাজগুলি মোটেই সহজতর ছিল না। এই কাজগুলির মধ্য দিয়েই বোঝা যায় এই আন্দোলনের মূল প্রেক্ষিত ছিল শ্রেণী সচেতনতা এবং জোতদার জমিদারের শাসনের হাত থেকে মুক্তি।

প্রাক্ স্বাধীনতাপর্বে শুরু হওয়া এই আন্দোলন স্বাধীনতার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনরায় শুরু হয়। বিশেষত ১৯৪৮-৪৯সালে এই আন্দোলন ২৪ পরগণা, হুগলী ও হাওড়া জেলায় তীব্র আকার ধারণ করে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা নেত্রীরা নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে কৃষকনারীদের সংগঠিত করতে যে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন তা পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়। তথ্য থেকে দেখা যায় দ্বিতীয় পর্যায়ের এই আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বামপন্থী মহিলাদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে অনেক সাধারণ গৃহবধূ যাঁরা কোন

দল বা গণসংগঠনের কর্মী ছিলেন না তাঁরাও সামিল হয়েছিলেন। তাই দেখা যায় কাকদ্বীপ থানার চন্দনপিঁড়ি গ্রামে পুলিশের সাথে লড়াই-এ উত্তমী দাসী, বাতাসী, সরোজিনী, অহল্যা দাসীর মত নিতান্ত তরুণীরা প্রাণ দেন। অনুরূপভাবে হুগলীর আরামবাগ, বিরল, বাতানল, সিঙ্গুর, কানাইডাঙ্গা, বড়কমলাপুর, বড়া, ডুবিরভেরীতে মহিলারা লড়াই করেন। ডুবির ভেরীতে পুলিশের আক্রমণে মোট সাতজন মহিলা নিহত হন। পাঁচুবালা ভৌমিক, দাসীবালা পাল, পুষ্পবালা মাঝি (দাসী), চণ্ডী (কালী)বালা পাখিরা, মুক্তকেশী মাঝি (ডুবিরভেড়ীর 'পঞ্চকন্যা' নামে পরিচিত)এবং ভদ্রেশ্বর সামন্তের মা ও রাজকৃষ্ণের মা। ডুবিরভেড়িতে হত্যাকাণ্ড ঘটার পরে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষকে বল-ভরসা দেওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সন্ধ্যা চ্যাটার্জীকে পাঠান হয়। তাঁর কাজ এবং প্রেরণা নারীদের উৎসাহিত করে বলে জানা যায়। ডুবিরভেড়ির অভিজ্ঞতা থেকে সন্ধ্যা চ্যাটার্জী বলেছেন,'গিয়ে দেখি সবাই এত সন্ত্রস্ত যে কথা বলতে চাইছে না। এমন কি ভালো ভালো কর্মীরাও ভয়ে আশ্রয় দিতে চাইছে না। শেষপর্যন্ত এক পোড়ো বাড়িতে রাত কাটাবার জায়গা পেলাম। সঙ্গে আমার অসুস্থ মেয়ে। সে কেবল কাঁদছে। আমি আনাড়ি মা। আমার নাজেহাল অবস্থা দেখে সঙ্গিনী বলতে থাকে—তুমি কাদের জন্যে এখানে এসেছ? যারা তোমার থাকার জায়গা পর্যন্ত দিচ্ছে না। মেয়ে কেবল কাঁদছে আর ওদিকে পুলিশ টহল দিচ্ছে। মেয়ের কান্না থামাবার জন্যে মেয়ের মুখে কাপড় গুজে দিচ্ছি। আমি তখন বেপরোয়া। মেয়ের কথার চেয়েও বড় চিন্তা আমার কীভাবে পার্টির নির্দেশ পালন করব। কিন্তু সেখানে বিশেষ কিছু করা গেল না।"[২২] এইসমস্ত ঘটনায় মহিলারা ঐক্যবদ্ধভাবে যে প্রতিবাদ জানান তা পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৩] যেমন ১৯.৩.১৯৪৮ তাং ২৫০জন মহিলা ও ১০০জন পুরুষ সমবেতভাবে বড়কমলাপুরে ঘটনার প্রতিবাদ জানান। রাইটার্স বিল্ডিং-এ আগে একটি সভা হয়। সভাতে দৃঢ়ভাবে মহিলা নেত্রী মণিকুন্তলা সেন বক্তব্য রাখেন।[২৪] সভা শেষে হোম মিনিস্টারের সাথে সাক্ষাৎ করে বড় কমলাপুরের ঘটনা পরিদর্শন করার কথা বলেন মহিলারা। কারণ, পুলিশের আক্রমণে গুইরাম মণ্ডল ও কার্ত্তিক ধাড়া নামে দুই চাষীর মৃত্যুর প্রতিবাদে। তাঁরা পোস্টার করেন—

১) "বড়া কমলাপুর হইতে পুলিশ ঘাঁটি উঠাইয়া লও।"

২) "হত্যাকারী পুলিশের শাস্তি চাই"।

স্লোগান দেন —

১) "হত্যাকারী পুলিশের শাস্তি চাই"।

২) “ইনক্লাব জিন্দাবাদ”।

৩) “কিষাণ মজদুর রাজ কায়েম হোক।”[২৫]

পুলিশ রিপোর্টে লেখা হয় 13.3.1948 the members of the communist party at Bora, P.S. Singoor under the leadership of Pramatha Dutta, Monoranjan Hazra, Mohitosh Nandi, Secretary District Krishak Committee -Ajit Basu and Mrs. Sephali Nandi were formenting lawlesness and hooliganism in Bara, Maghirdanga, Kamalapur and other villages, 12.3.48 the Police force was compelled to open fire on an unruly mob resulting in the death of two Persons. on 9.3.48 a procession of about 300persons mostly women led by Mrs. Sephali Nandi came to Serampore Court carrying CPI flags and shouting the usual slogans against the Police, the congress and the Zamindars"[২৬] ১২.৩.১৯৪৮ তারিখে পুলিশের প্রকাশ্যে গুলিতে দুজন ব্যক্তি নিহত হওয়ার প্রতিবাদস্বরূপ হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত বড়া-তে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য প্রমথ দত্ত, মনোরঞ্জন হাজরা, মহীতোষ নন্দী, জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক অজিত বসু এবং মহিলা নেত্রী শেফালী নন্দী বড়া, মাঘীরডাঙ্গা, কমলপুর এবং অন্যান্য গ্রামের সকলকে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। ৯.৩.১৯৪৮ তারিখে ৩০০জন মহিলাকে নিয়ে শেফালী নন্দী শ্রীরামপুর কোর্টে গিয়ে প্রতিবাদ জানান পুলিশ, কংগ্রেস এবং জমিদার এই ত্রয়ী শক্তির বিরুদ্ধে।

বড়কমলাপুরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায় হাওড়া জেলায় বাসিলা অঞ্চলে ১৯৪৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। ঐদিন কৃষক রমণীসহ ৮ জন কৃষক পুলিশের গুলিতে নিহত হন। আন্দোলন তীব্রতর হয়। ১৯৪৯সালের ৯ই সেপ্টেম্বর হাওড়ার সাঁকরাইলের হাটাল গ্রামে পুলিশ এলে মেয়েরা শঙ্খধ্বনি দিয়ে পথরোধ করে দাঁড়ায়। পুলিশ গুলি চালালে মোট আটজন নারী নিহত হন।[২৭] সুধা সাঁতরা, মাখনময়ী পণ্ডিত, পারুলবালা সাঁতরা, সিন্ধুবালা দলুই, বালিকা পাত্র, যশোদা সাঁতরা, অষ্টবালা পণ্ডিত ও ননীবালা পাত্র।[২৮]

তেভাগা আন্দোলনে সাধারণ গ্রামীণ মহিলাদের এত সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নিজেদের জীবন বিপন্ন করে পুলিশ জোতদারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পেছনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে তথ্য থেকে জানা যায়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা নেত্রীরা কৃষক রমণীদের সংগঠিত করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তথ্য থেকে জানা যায় শহর থেকে নেত্রীরা গ্রামে গ্রামে গেছেন, দিনের পর দিন

কৃষক রমণীদের মধ্যে থেকেছেন এবং তাদের মধ্যে কাজ করেছেন। যেমন—মণিকুন্তলা সেন, কল্যাণী দাশগুপ্ত, কল্পনা, অমিয়া দে, সরযূ সরকার, সুষমা দত্ত,অমিয়া ঘোষ, ব্রজকিশোরী কুণ্ডু, মৃণালিনী তলাপাত্র প্রমুখ।[২৯] শুধু মহিলাদের সংগঠিত করা নয় তাদের সাক্ষর করাও ছিল আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রীদের কাজ। দিনাজপুরে এই দায়িত্ব পালন করেন রানী মিত্র, বীণা সেন, অলকা মজুমদার, মণিকুন্তলা সেন প্রমুখ, জলপাইগুড়িতে কল্যাণী দাশগুপ্ত, রংপুরে লিলি দে, রেবা রায়, শান্তি প্রধান, কনক মুখার্জী প্রমুখ, পাবনা ও রাজশাহীতে মায়া সান্যাল, প্রতিমা দাশগুপ্ত, প্রীতি সরকার, পঙ্কজ আচার্য, ইলা মিত্র, যশোহর ও খুলনায় গীতা রায়চৌধুরী, গৌরী মিত্র, মেদিনীপুরে সাধনা পাত্র, বিমলা মাজী, ছায়া বেরা প্রমুখ, বরিশালে মনোরমা বসু, জুঁইফুল বসু প্রমুখ। এছাড়া আরো অনেক মহিলাকর্মী কৃষক রমণীদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন বলে তথ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩০]

কিছু ঘটনার উল্লেখ করা যায়। যেমন ৩০.১০.১৯৪৮ তারিখ নন্দীগ্রামের বালকুঠিয়াতে বিমলা মাজীর নেতৃত্বে মহিলাদের একটি সভায় পুলিশের বিরুদ্ধে কিভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার সিদ্ধান্ত হয়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির এই সভায় পুলিশের চোখে ধূলো, সেলাইন জল ছিটিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত টাকাপুরা এলাকায় ঘুরে ঘুরে গ্রামীন মহিলাদের বিমলা মাজী সংগঠিত করেন বলে জানা যায়। কোন দ্বিধা না করে পুলিশকে আক্রমণ করতে এবং পুলিশের হাতে কোন ব্যক্তি ধরা পড়লে তাকে ছিনিয়ে নেওয়ার কথা বলেন। জানা যায় এক দীর্ঘ সময় ধরে বিমলা মাজী তমলুক, পাঁশকুড়া এবং নন্দীগ্রামে মেয়েদের সংগঠিত করার কাজে বিশেষ উদ্যোগ নেন।[৩১]

উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন অপর্ণা পালচৌধুরী। শ্রীহট্ট জেলায় কুখ্যাত নানকার গোলামী প্রথার বিরুদ্ধে অনিতা পালচৌধুরী, সুষমা দে, অপর্ণা পালচৌধুরী সহ অন্যান্য মহিলারা পুলিশের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করেছিলেন তা বর্ণনা করেছেন তাঁর স্মৃতিকথাতে। তিনি লিখেছেন—"মহেরী,উলোরী, সানেশ্বর প্রভৃতি গ্রামে সমিতির শাখা গড়ে উঠল। মহিলারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমিতির সভ্যা হলেন। মহিলা সমিতিকে কৃষক আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করার জন্য মহিলাদের সংগঠিত করার কাজ জোর কদমে চলল। জমিদারী প্রথার অবসান ও নানকার প্রথা রদের দাবি নিয়ে মহিলারা সংগ্রাম শুরু করলেন। আত্মগোপন করে কাজ করতে হতো।"[৩২]

তিনবছরের সন্তান ও পরিবারের সমস্ত ভার দিদি অরুণা দত্তর কাছে রেখে অপর্ণা পালচৌধুরী সুনাম গঞ্জ থেকে সিলেটের গ্রামে যান মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজ করতো। লাউতা বাহাদুরপুরে কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে কাজ করেন। অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে মহিলাদের সঙ্গে মিশে সমিতি গড়ার কাজ করতেন। নানকার প্রথা বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একজন কৃষককে জমিদারের গুণ্ডা বর্শার আঘাতে খুন করে জলে ভাসিয়ে দিলে ১৯৪৮ সালের ১২ই আগস্ট সানেশ্বর বাজারে মহিলারা সমিতিগতভাবে এক সভা করে। ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে কোন সভা-মিছিল করা নিষিদ্ধ ছিল। তাই মহিলারা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। ১৭ই আগস্ট উলোরী গ্রাম আক্রান্ত হয় পুলিশ বাহিনীর দ্বারা। পুলিশের আক্রমণের বিরুদ্ধে সকলে সমবেতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু পুলিশের গুলিতে একে একে চটিরাম দাস, প্রফুল্ল দাস, পবিত্র দাস, কুটমণি দাস, প্রসন্ন দাস আর ১৪ বছরের কিশোর ছেলে অমূল্য দাস নিহত হন।

মহিলাদের উপর চলে বীভৎস অত্যাচার। সেই অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে অপর্ণা পাল চৌধুরী লিখেছেন —“মাথা তুলেছি দেখবার জন্য। আমাকে দেখে ফেললো সিপাইরা ও অনসারবাহিনীর লোকেরা। আমি আবার শুয়ে পড়েছিলাম। এসেই সিপাইটি বল খেলতে শুরু করলো আমাকে নিয়ে। লাথি মেরে এখান থেকে ওখানে ছুঁড়ে দেয়, আবার দৌড়ে গিয়ে লাথি মারে। তারপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।... আমাকে মৃত ভেবে দুই পায়ে ধরে টেনে নিয়ে কিছুদুর যাওয়ার পর আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। আমি হাত তুলে ইশারা করলাম আমাকে দাঁড়াতে দেবার জন্য। মনে একটা খুব জোর এলো। আমি সিপাইটিকে ধরে উঠে দাঁড়ালাম। ওকে ধরে কয়েক পা যেতে যেতে কয়েক ঘা লাঠির বাড়ি আমার ঘাড়ে, পিঠে, হাতে পড়তে লাগল। ... আমার পেটে বুটের লাথি মেরে আমার গর্ভের সন্তানকে শেষ করে দিয়েছে। আমার কাপড় রক্তাক্ত হয়ে গেল। হাঁটতে পারছি না, বসতে পারছি না। এই অসামর্থ্য শত্রুদের বুঝতে দিলাম না। সোজা হয়ে বসে রইলাম। বসা অবস্থায় আবার আমাকে মারতে শুরু করল।”[৩৩]

বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্যতম মহিলা নেত্রী রাণু চট্টোপাধ্যায়। তাঁর স্মৃতিকথাতেও এই অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। জেলের অভ্যন্তরেও চলে অকথ্য অত্যাচার। এই অত্যাচারের ফলে অপর্ণা পালচৌধুরীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে যায়। তিনি প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েন। বিচারচলাকালীন কোন আইনী সহায়তা না নিয়ে নিজেরাই মামলা পরিচালনা করেন।[৩৪] অপর্ণা পালচৌধুরী, সুষমা দে ও অনিতা পালচৌধুরী সওয়াল করেন। পুলিশি অত্যাচারের স্বরূপ তুলে ধরেন আদালতের

কাছে। অসুস্থ অবস্থায় ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তি পান।[৩৫]

মালদহ রাজশাহী জেলার চাপাইন নবাবগঞ্জের নাচোল এলাকায় কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ছিলেন ইলা মিত্র। খেলাধূলায় তুখোড় জমিদার মহিমচন্দ্রের বাড়ির পুত্রবধূ হয়েও নাচোল এলাকায় তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।[৩৬] নাচোলের কৃষক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আগে গ্রামের নিরক্ষর মেয়েদের শিক্ষিত করে তাদের মানসিক চেতনার উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করেন। কৃষ্ণগোবিন্দপুরের জমিদার পরিবারের আলতাফ মিঞার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা মেয়েদের স্কুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রী হিসাবে ইলা মিত্র তিনজন ছাত্রীকে নিয়ে স্কুল চালনা করেন। পরে ছাত্রীসংখ্যা উন্নীত হয় পঞ্চাশে। মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার এই কাজে পারিবারিক বাধার চেয়েও তাঁকে অনেক বেশি করে মুখোমুখি হতে হয়েছিল সামাজিক বাধার। বিশেষত মুসলিম মেয়েরা ঘরের বাইরে গিয়ে শিক্ষা নিচ্ছে রক্ষণশীল উচ্চবিত্ত মুসলিম-সমাজ এটা সহজে মেনে নিতে পারে নি। নারী শিক্ষার পক্ষে জনমত গঠন করে গ্রামে নারী শিক্ষার সূত্রপাত ঘটান ইলা মিত্র। এরপর নাচোলের কৃষকদের নিয়ে তাঁর লড়াই তাঁকে কিংবদন্তী করেছে। নাচোলে জোতদার-মহাজন ও ইজারাদারদের বিরুদ্ধে আদিবাসী কৃষকদের নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শুরু হয় আন্দোলন। বস্তুত নাচোলের বিদ্রোহ ছিল সুনির্দিষ্ট ২টি পর্বে বিভক্ত। প্রথমটি ছিল প্রচার পর্ব (১৯৪৬-৪৮) দ্বিতীয়টি মূল আন্দোলনপর্ব (১৯৪৯-৫০)। বিদ্রোহ দমন করতে পুলিশী নির্যাতন এবং ইলা মিত্রের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার জনমানসে পাকিস্তান সরকারের স্বেচ্ছাচারী প্রতিকৃতিটি তুলে ধরেছিল। বস্তুত নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ আর ইলা মিত্রের নাম এতো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে ইলা মিত্র হয়ে উঠেন ঐ বিদ্রোহের মূর্ত প্রতিনিধি এবং সকলের প্রিয় 'রানী মা'।[৩৭] ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারী তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে অবধি বন্দী থাকেন। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন জেল হয়। পরে পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক তাঁকে মুক্তি দেন।[৩৮]

তেভাগা আন্দোলনে কিংবদন্তী কিছু নারীর যেমন উল্লেখ পাওয়া যায় তেমনই কিছু সাধারণ -কৃষক রমণীর কথা জানা যায় যাঁরা নিতান্তই রাজনৈতিক দিক থেকে ততটা পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পার্টি ও সমিতিতে নিজেদের স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী রানী দাশগুপ্তার লেখা থেকে এমনই কিছু সাধারণ মহিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন— 'ইটাহার লোকাল কমিটির সদস্য কৃষকের ঘরের লেখাপড়া জানা প্রৌঢ়া কণ্ঠমণি বর্মনী ছিলেন স্থানীয় পার্টি, কৃষক সমিতি ও মহিলা সমিতির অন্যতম নেত্রী।

পরবর্তীকালে আটোয়ারীর দীপশ্বরী, বালিয়াডাঙ্গির জয়মণি, রোহিনী, রানী শঙ্কাইলের ভান্ডলী, বীরগঞ্জের ফুলশ্বরী, সেতাবগঞ্জের ভূতেশ্বরী, ফুলবাড়ির বুধমণি এবং কমরেড রূপনারায়ণের ছোট্ট মেয়ে যমুনা, কালী সরকারের স্ত্রী স্বরাজনন্দিনী এবং পতিরামের কুঞ্জদাস মোহান্তের স্ত্রী বরদাসুন্দরীর মতো কৃষক নেত্রীরা গড়ে উঠেছিলেন।.... বগুড়ার পালানু বর্মনের মায়ের (বুড়িমা) নেতৃত্বে নারী বাহিনী পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন, পুলিশকে আহত করেছিলেন। জলপাইগুড়িতে বুড়িমার নেতৃত্বে মেয়েরাই প্রথম ধান এবং একাধিকবার জোতদারের লাঠিয়াল ও পুলিশের মোকাবিলা করেছিলেন। ১৯৪৭সালের ২ মার্চ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে বুধনি ওঁরাওনি, ফাগুনি খরিয়ান ও এতোয়ারী খরিয়ান সহ ৫জন নারী-পুরুষ নিহত হন। ময়মনসিংহের টংক অঞ্চলে বীরাঙ্গনা রাসমণি পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন।

মেদিনীপুরে সত্যবালা বেরা, শিবরানী মিত্র (দীক্ষিত), বিমলা মাজী, সিন্ধুবালা ভুঁইঞা, ব্রজবালা দলইয়ের নেতৃত্বে কৃষক মেয়েরা ধানকাটা, ভাগচাষী ও চাষিদের পঞ্চায়েত খামারে ধান তোলার সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মেয়েরা ঝাঁটা, লাঠি, দা, বঁটি এবং ধুলোবালির সঙ্গে নুন ও লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে পুলিশ ও গুণ্ডাদলকে প্রতিরোধ করতেন। মেদিনীপুরে ঝাঁটা, লাঠি ও শঙ্খঘন্টার উপর ১৪৪ধারা জারি হয়েছিল।"[৩৯]

তেভাগার দাবিতে হুগলী জেলার ডুবিরভেড়ির এলাকায় গ্রামে গ্রামে পুলিশ ও জোতদারদের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে কৃষক মহিলাদের সংগঠিত করার কাজে অংশগ্রহণ করেন সন্ধ্যা চ্যাটার্জী। এই কাজে কৃষক রমণীদের মধ্যে মানসিকতা গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন তিনি। মিছিলে জমিদারদের গুলিতে কৃষক রমনীরা নিহত হলে সন্ধ্যা চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। এরপর তিনি আত্মগোপন করে সমিতির কাজ করতে থাকেন।[৪০]

তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী কল্যাণী দাশগুপ্ত তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন—"শহরের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ও কমিউনিস্ট পার্টির আমরা মহিলা কর্মীরা—কল্পনা, অমিয়া দে প্রমুখ এদের সাথে যোগাযোগ রেখেছে, সবরকম সাহায্য করেছে এবং সর্বোপরি নিজেরা শিক্ষিত হয়েছে। শহরে থেকেও নানাভাবে কাজ করেছে সরযূ সরকার, সুষমা দত্ত, সুরুচিদি, বীরেন দত্ত'র স্ত্রী নিভা বৌদি, মাসীমা অমিয়া ঘোষ, ব্রজকিশোরী কুণ্ডু, মৃণালিনী তলাপাত্র, ছেলেমানুষ মীরা এবং আরো অনেকে। কলকাতা থেকে এলেন মণিকুন্তলা সেন, পচাগড়ে ক'দিন থাকলেন—হাটসভা, প্রচার ইত্যাদি করে গেলেন।"[৪১]

দিনাজপুরের খাঁপুরে তেভাগা আন্দোলনের সময় যান মণিকুন্তলা সেন। তার আগে

পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে বেশকিছু কৃষক ও কৃষক রমণী মারা যান। তাঁর অভিজ্ঞতাতে লিখেছেন—"দিনের বেলায় দেখলাম গ্রামটা খাঁ খাঁ করছে। পথে কেউ বেরোয় না। ওখানেই পুকুর পাড়ের লড়াইতে পুলিসের গুলিতে একটি মেয়ে খুন হয়। গ্রামের মেয়েরা ওই রক্তমাখা জায়গাটা একটা ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। সেখানে সকালে মেয়েরা ফুল ছড়িয়ে দেয়, বিকালে প্রদীপ দেয়। যে বাড়িতে আমি ছিলাম সেখানে একদিন সকালবেলা ছেলেদের খোঁজে পুলিস এল। মেয়েরা শঙ্খের আওয়াজ পেয়ে আমাকে ওদের একটা শাড়ি পরিয়ে উঠোনে চুলোর পাশে বসিয়ে দিল। চুলোতে তখন ধান সেদ্ধ হচ্ছিল আর আমি সেই চুলোতে ঠেলে দিচ্ছিলাম শুকনো পাতা। আমার একগলা ঘোমটা দেখে পুলিস আর কিছু খোঁজ করল না। ঘরে এবং এদিক-ওদিক ছেলেরা আছে কিনা দেখে শুনে চলে গেল।"[৪২]

শুধু দিনাজপুর নয়, তেভাগা আন্দোলনের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন মণিকুন্তলা সেন তা তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। তাঁর লেখনী থেকে মহিলাদের লড়াই-এ বিভিন্ন কৌশলের কথাও জানা যায়। লিখেছেন—"এই ধানের লড়াইতে প্রথম থেকেই কৃষক মেয়েরা দল বেঁধে পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে। একদিকে লাঠি-বন্দুক নিয়ে পুলিশ ও ভাড়াটে গুণ্ডার দল, অন্যদিকে খালি হাতে কৃষক জনতা। এই অসম লড়াইতে কৃষকদের বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব নয়। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের নিশ্চিহ্ন করার একটা বন্য উন্মত্ততা পুলিসদের যেন পেয়ে বসেছিল। বিপদ বুঝে এবার মেয়েদের সামনের সারিতে দাঁড়াতে হল তাদের আদিম অস্ত্র দা-বটি-ঝাঁটা, লঙ্কার গুড়ো প্রভৃতি নিয়ে। 'পুলিস আসছে' টের পেলে মেয়েরাই শঙ্খধ্বনি করে গ্রামবাসীদের কাছে সংকেত পৌঁছে দিত। ছেলেরা তখন জঙ্গলে চলে যেত। আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজটাও করত ওই মেয়েরাই। মেয়েদের সঙ্গে পুলিসের মুখোমুখি লড়াই হয়েছে। ধানের গোলায় আগুন দিলে মেয়েরাই ঝাঁপিয়ে পড়ে নেভাতে যেত। তারা মার খেত অত্যাচারে জর্জরিত হত, আবার যা পেত তাই দিয়ে মারত - তবু পুরুষদের সামনে আসতে দিত না।"[৪৩] কমল চ্যাটার্জী বলছেন মেয়েদের নানা অভিনব কায়দার কথা—'একদিন রাত্রিবেলায় কমলাপুরের এক পাকা বাড়িতে বসে মিটিং করছি আমরা পনেরো-ষোলো জন। রোয়াকের দুধারে রয়েছে এক ঘড়া জল আর একটা গরুর ডাবা। অতর্কিতে পুলিশ হানা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটা দেওয়া এক বৌ জলের ঘড়াটা উল্টে দিল—আর এক বৌ দিল গরুর জাবনা ভরা ডাবাটা উল্টে। উঠোনটা হয়ে গেল পেছল। পুলিশ ঢোকার সঙ্গে খেল এক আছাড়। দ্বিতীয় পুলিশ পড়ল প্রথম পুলিশের ঘাড়ে, আর তৃতীয় পুলিশ দ্বিতীয় জনের ওপর। এই ফাঁকে

আমরা পালালাম। শুধু পড়ে রইল পুলিশের জন্যে দশ বার জোড়া জুতো।'[৪৪]

তিনি বলছেন মেয়েরা এভাবে বাঁচিয়েছে শেফালী নন্দীকে। পুলিশ এসেছে আর শেফালীকে নিয়ে মেয়েরা পুকুরে নামল। তাকে মাঝখানে রেখে চারজন মেয়ে প্রায় আদুড় গায়ে স্নান করতে লাগল। ঘাটে যে মেয়েটি বাসন মাজছিল, সে নির্বিকারভাবে বাসন মেজে চলল। পুলিশকে দেখে লগ্নীদি বিকট গলায় গালাগাল করতে থাকে—পুলিশের কি মা-বোন জ্ঞানও নেই! মেয়েরা যেখানে স্নান করছে— কোন লজ্জায় তারা সেখানে আসে।

শুধু নব নব কৌশল আবিষ্কার করা নয় নারীরা আরো বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে নিজেদের যুক্ত রেখেছিলেন। তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী রানী দাশগুপ্তা লিখেছেন—"গ্রেপ্তার এড়িয়ে পার্টি ও সমিতির সংগঠনকে রক্ষা করা ও শক্তি পুনর্বিন্যাসের জন্য নেতা ও কর্মীদের আত্মগোপন করতে হয়। এঁদের জন্য গোপন আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা, এদের খাওয়া-দাওয়া ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা, গোপন পার্টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন এলাকার মধ্যে এবং শহরের পার্টি ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, চিঠি-কাগজপত্র আদানপ্রদান, ইত্যাদি যাবতীয় দায়িত্ব মেয়ে কমরেডরা নিজের হাতে তুলে নেন। হাটের পসরার সঙ্গে চিঠিপত্র, পত্রিকা এমন কি হ্যাণ্ডবিল, পোস্টার পর্যন্ত শহর থেকে গ্রামের কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে আনা-নেওয়া চালাতে থাকেন তাঁরা অপূর্ব শৃঙ্খলা ও দক্ষতার সঙ্গে। অথচ এই মেয়েদের শতকরা নিরানব্বই ছিলেন নিরক্ষর।

গ্রামে শুধু গোপন আশ্রয়কেন্দ্র সন্ধান করা নয়, সেই আশ্রয় কেন্দ্রের অতন্দ্র প্রহরীও ছিলেন মেয়েরা এবং তাঁদের পরিচালিত বালক বাহিনী। সারারাত্রি ধরে গোপন আশ্রয় কেন্দ্রে পার্টি ও কৃষক সমিতির সভা হয়েছে। নিদ্রাবিহীন চোখে মেয়েরাই প্রহরায় থেকেছেন।"[৪৫]

মেদিনীপুর জেলার তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী বিমলা মাজী সাক্ষাৎকারে মহিলাদের অভিনব পদ্ধতির নানা কথা জানিয়েছেন। "নতুন নতুন পদ্ধতিও আবিষ্কার করে ফেলত বিপদকালে। অভিনব পদ্ধতি সব। একবার পুলিশ এসে গেছে। একটি মেয়েকে প্রসূতি সাজিয়ে ঘিরে বসল পাড়ার মেয়েরা। আলতা মিশিয়ে লাল রঙের ঔষধ তৈরি হলো। প্রচণ্ড ঝগড়াঝাঁটি করে আটকে রাখল পুলিশকে। সেই ফাঁকে আমি সরে পড়লাম।... একবার পুলিশ এসে গেছে। খবর পেয়ে মেয়েরা আমাকে গহনা পরিয়ে দিল। রূপোর এ্যাই মোটা বল—সে আমার পায়ে উঠবে কেন? জাঁতি দিয়ে কেটে, বাঁকিয়ে পরিয়ে দিল আমাকে। ৪টি ঝুড়িতে ধানের শিষ নিয়ে আরও তিনজন মেয়ে বেরিয়ে পড়ল আমাকে নিয়ে। ফসল তোলা মাঠে ঝরে পড়া শিস

কুড়োতে। দ্রুত সরে পড়ার উপায় নাই। ধান কুড়াবার অভিনয় করতে করতে দূরতম প্রান্ত দিয়ে পাশের গ্রামে পৌঁছে দিল তারা আমাকে।"[৪৬]

বাংলায় তেভাগা আন্দোলন জোরদার হওয়ার পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল কমিউনিস্ট পার্টি, কৃষক সমিতি ও মহিলা সমিতি গরীব ভাগচাষী মুসলিম কৃষক ও কৃষক রমণীদের একটি অংশকে আন্দোলনে সমবেত করতে সক্ষম হয়েছিল। যেমন- কিশোরগঞ্জে চাতলা ও বাঘাটা এলাকায় জনৈকা মহিলা গুণ্ডাবাহিনীর হাতে খুন হন। প্রতিবাদে সাতদিনের মধ্যে শতাধিক মুসলিম ও ৪৭টি হিন্দু ভাগচাষী পরিবার জোতদারের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।[৪৭]

দিনাজপুরের মহিলা সংগঠক রানী দাশগুপ্ত তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন যে, শুধু হিন্দু মুসলিম ঐক্যই নয় সমাজের সবস্তরের জাতি উপজাতি কৃষকদের সামাজিক ব্যবধান দূর করতে সক্ষম হয়েছিল তেভাগা-আন্দোলন—যা ইতিপূর্বে কোন আন্দোলন এই কাজ করতে পারেনি। তাই, বলা যায় যে, নিম্নবর্গের নারী সমাজকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে কিছুটা সচেতন ও সক্রিয় করেছিল তেভাগা আন্দোলন।

বামপন্থী নেত্রীরা কিভাবে মুসলিম মহিলাদের কুসংস্কার ভেঙ্গে বাড়ীর বাইরে এনে সচেতন করার চেষ্টা করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিমলা মাজীর কথাতে "মেয়েদের সংগঠিত করে তেভাগার লড়াইতে সামিল করাবার দায়িত্ব আমার। মনে আছে, প্রথমে বৈঠকে এসেছিল পাঁচজন মুসলমান মহিলা। খুবই গরীব। শায়া বা ব্লাউজ পরত না তারা। শুধু শাড়িটাই পরত। কিন্তু গলায় হাঁসুলি, পায়ে মল, খাড়ু, কোমরে বিছা, গোট, রূপার মোটা মোটা বালা পরত তারা। সোনা নয়, রূপার গহনা পরার রেওয়াজ ছিল। আর রেওয়াজ ছিল একহাত ঘোমটা টানার। সে ঘোমটা এক একজনের বুক ছাড়িয়ে পেটের উপর নেমে আসত। পাঁচটি মেয়ের কারও মুখ দেখতে পেলাম না আমি। শুধু দেখলাম, আমার বর্ণনা শুনে, তাদের ঘোমটা ঢাকা মাথাগুলো নড়ে নড়ে উঠছে।[৪৮]

মুসলিম রমণীদের আন্দোলনে সামিল করার পাশাপাশি কমিউনিস্ট আদর্শে উদ্বুদ্ধ মহিলা নেত্রী ও কর্মীরা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাধ্যমে কৃষক রমণীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন বলে তথ্য থেকে জানা যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত হয়েও সুশিক্ষিত মহিলা নেত্রীরা গ্রামাঞ্চলে গেছেন, দিনের পর দিন কৃষকদের মধ্যে বসবাস করেছেন, তাদের মধ্যে কাজ করেছেন, রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। যার ফলে কৃষক রমণীদের মনে সাহস ও আত্মপ্রত্যয় সঞ্চার করতে পেরেছিল।[৪৯] তাই দেখা যায় ১৯৪৬সালের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার

পরেও তেভাগা সংগ্রাম ২২টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল যেখানে হিন্দু মুসলমান ভাগচাষী ঐক্যবদ্ধ হয়ে হিন্দু মুসলমান জোতদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে সমর্থ হন।[৫০]

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, তেভাগা আন্দোলনের দুটি পর্বে অর্থাৎ ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে-১৯৪৭খ্রিষ্টাব্দ এবং ১৯৪৮খ্রিষ্টাব্দে-১৯৫০খ্রিষ্টাব্দে গ্রামীন নারীসমাজকে বিকশিত করেছিল। সে সমস্ত জায়গায় আন্দোলন তীব্র হয়েছে সেখানেই নারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তেভাগা আন্দোলনে নারী সমাজের ভূমিকা এবং তাদের উপর এই আন্দোলন কি প্রভাব ফেলেছিল তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে সেই সময়কার বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্পাদক ভবানী সেন লিখেছেন—"তেভাগা আন্দোলন নতুন নতুন সামাজিক শক্তিকে সামনে নিয়ে এসেছে এবং গ্রামীণ মানবতার এক নবজাগরণের সূচনা করেছে। সবচেয়ে অবদমিত, পদদলিত, পশ্চাদপদ ও নিরক্ষর কৃষক রমণী ঋণ রক্ষায়, তাদের ঘরবাড়ি-সম্মান রক্ষায় আর রক্তপতাকা রক্ষায় এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করে। রামমোহন রায় যখন রেনেসাঁর শিখা প্রজ্জ্বলিত করেন,তারপর থেকে নারীমুক্তি-মহানগরগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার গ্রামের নারী সমাজকে এই প্রথম জাগিয়ে তুলেছে তেভাগা আন্দোলন। কৃষক বীরাঙ্গনা, মহিলা বক্তা ও প্রচারাভিযানকারীরা এবং গ্রামের মহিলারা যারা এই তেভাগা সংগ্রামে প্রায়শই পুরুষদের নেতৃত্ব দিত, বাংলার সমাজজীবনে এক নতুন রেনেসাঁর ইঙ্গিতবহ।"[৫১]

তেভাগা আন্দোলনের মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং তাদের মুক্তির আস্বাদ গ্রহণের চেষ্টা এই আন্দোলনকে যে অন্য মাত্রা দিয়েছিল তা বলা যায়। তাই, মহিলা নেত্রী রেণু চক্রবর্তী লিখেছেন—"যুগযুগান্তের ঘুম ভেঙ্গে কিষাণ মেয়েরা চোখ মেলেছে নতুন যুগের ভোরে। বুক ভরে নেবে এই ভোরের বাতাস। ভোর এনেছে ১৯৪৬-৪৭ এর মহান গৌরব দীপ্ততে তেভাগা আন্দোলন।

এই প্রচণ্ড তেভাগা আন্দোলন দেখিলে দিল শ্রেণীসংগ্রাম হিন্দু-মুসলমান আধিয়ারদের ঐক্যের ভিত কিভাবে পাকা করে দিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়-নেতৃত্বই রইল বিভক্ত।"[৫২] অর্থাৎ তেভাগা আন্দোলনে মহিলাদের উত্থান সম্পর্কে এত উচ্ছসিত প্রশংসা করলেও এই আন্দোলন পুরোপুরি সফল না হওয়ার পেছনে তিনি নেতৃত্বের ভূমিকাকেই দায়ী করেছেন।

তেভাগা আন্দোলন ছাড়াও কৃষক সমাজের উন্নতির জন্য মহিলারা আরো নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেন বলে তথ্যে পাওয়া যায়। যেমন - ১৯৪৮ খ্রি. ফেব্রুয়ারি বাসে মেদিনীপুরের মহিলা নেত্রী ঊষা চক্রবর্তী সভা করেন জমিদারী ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটানোর জন্য। এছাড়াও মেথরদের নিয়ে বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে একটি সাধারণ হরতাল করেন মেদিনীপুর শহরে। পাশাপাশি

গ্রামীন এলাকায় গিয়ে কিষাণ সমিতিকে তিনি সংগঠিত করেন বলে পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়। পুলিশ রিপোর্টে লেখা হয়- "In April 1947 She (Usha Chakraborty) was taken in as a member of the D.C. and was placed in charge of the MARS. The same year, she organised several meeting to carry on an agitation for the abolition of Zamindaris system and formed for holding a general strike of the scavenger and sweepers in Mid. town. She also toured in the rural areas for re-organising Kisan Units and organised passing of the security Bill. In February, 1948 she attended Party meetings at which the members discussed the formation of "Red Guard" organisation in the dist. abolition of Zamindari System, collection of funds for the party congress and other important matters."[৫৩]

২০.১.১৯৪৮ তাং বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়রের থানার হাতালনারায়ণপুরে বাঁকুড়া জেলা কৃষক সমিতির সম্মেলনে যোগ দেন বিমলা মাজী। সঙ্গে ছিলেন সি.পি.আই দলের দেবেন দাস মুন্সী সহ আরো কয়েকজন। পুলিশ রিপোর্টে লেখা আছে - "Source no.-1 Bimala Manjhi reported to be the secretary of Midnapore K.S. attended the District Krishak Samiti Conference (Bankura) held at Hatalnarayanpur, PS.-Patrasayer, Dist.-Bankura on 20.1.48.[৫৪] ৯.৩.১৯৪৮ তাং তমলুক থানার যাতনকুর (Jatankur) একটি সভা করে কোন ক্ষতিপূরণ ছাড়াই জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপের দাবী তোলেন এবং কৃষকদের স্বার্থবিরোধী কোন নীতি সরকার নিলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেন।[৫৫] বাঁকুড়া জেলার মহিলা নেত্রী ভক্তি ঘোষ ২৯.০৩.১৯৪৭ তাং বাঁকুড়ার শিবপুকুরে বিড়ি কারখানার শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসে কৃষক কর্মীদের নিয়ে জেলাভিত্তিক সভা করেন। কলকাতা থেকে আসেন নৃপেন সেন। এছাড়া, প্রমথ ঘোষ, উদয়ভানু ঘোষ (ভক্তি ঘোষের স্বামী) এবং অন্যান্য সি.পি.আই কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, তেভাগা আন্দোলন, ভাগচাষী এবং কৃষকদের নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৫৬]

৯.৯.১৯৫২ তাং হাতাল কৃষকসভা ৪০০জন মহিলার উপস্থিতিতে শহীদ দিবস উদযাপন করে। উপস্থিত ছিলেন মণিকুন্তলা সেন, শৈলবালা দে, শৈলবালা দাসী, সদানন্দ ব্যানার্জী, সন্তোষ ব্যানার্জী প্রমুখ। মণিকুন্তলা সেন তীব্র ভাষায় কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করে বলেন যে, সরকার ক্ষুধার্ত জনগণের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছেন। কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে এখন থেকে

সরকারকে কেউ ধান বিক্রি করবে না।[৫৭]

বামপন্থী নারীরা এইভাবে কৃষক আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করার চেষ্টা করেন। কৃষক রমণীদের বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসার পথ দেখান। তাঁদের সেই চেষ্টা খানিকটা হলেও তেভাগা আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। পাশাপাশি এই আন্দোলন সাধারণ নারীদের মুক্তির স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করেছে। শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নারীদের মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ না থেকে অতি সাধারণ নারীদের মধ্যে তা প্রসারিত হয়েছে। তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে নারীরা চেষ্টা করেছেন কৃষকদের জীবনের সাথে যুক্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে।

ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ আন্দোলনে মহিলারা:

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন। আর এই আন্দোলনে বামপন্থী মহিলাদের অংশগ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী তখন ট্রাম কোম্পানী ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী ভাড়া এক পয়সা বৃদ্ধি করে। এরই প্রতিবাদে শুরু হয় ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন - যা এক পয়সার আন্দোলন নামেই পরিচিত।[৫৮]

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ৪ঠা ও ৫ই সেপ্টেম্বর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) প্রাদেশিক কমিটির সভায় গৃহীত কলকাতায় ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি পর্যালোচনা থেকে ট্রামভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে কিছুটা অবগত হওয়া যায়। ট্রামের একচেটিয়া মালিক ছিল এক ব্রিটিশ সংস্থা ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানী লিমিটেড। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ১লা জুলাই থেকে ট্রামওয়ে কোম্পানী ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়া এক পয়সা হারে বৃদ্ধি করে। এই ঘোষণার পর ২৭শে জুন বামপন্থী ও রাজনৈতিক দলগুলি [ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সহ পি.এস.পি., ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কসিস্ট), আর.এস.পি] এক সভায় মিলিত হয়। সেইসভায় আলোচ্য বিষয় ছিল কিভাবে প্রস্তাবিত ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ করা হবে এবং আন্দোলনের কর্মপন্থা কী হবে তা নির্ধারণ করা। সেই সভাতেই ট্রাম ও বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি (ট্রাম অ্যাণ্ড বাস ফেয়ার এনহান্সমেন্ট রেজিসটেন্স কমিটি) গঠিত হয়। পরবর্তীকালে সেই কমিটি 'রিজিসটেন্স্ কমিটি বা প্রতিরোধ কমিটি নামে পরিচিত হয়।[৫৯]

ট্রামওয়ে কোম্পানী জানায় যে, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি পরিবর্তন ও উন্নতিসাধনের অতিরিক্ত ব্যয় সংস্থানের কারণেই ভাড়াবৃদ্ধি একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। কিন্তু ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

বিবৃতি দিয়ে প্রকাশ করে কোম্পানীর এই অজুহাত মিথ্যা। ইউনিয়ন দেখায় যে, কোম্পানী কিভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ মজুত ভাণ্ডার হিসেবে সঞ্চয় করে রেখেছে— মেরামতি, পুনর্বিন্যাস বা পুনঃস্থাপনের মতো কাজের জন্য বিপুল অর্থও তাদের হাতে রয়েছে।

জানা যায় প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে জনগণ ১লা ও ২রা জুলাই বর্ধিত হারে ভাড়া দেয়নি। ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এই আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থন জানানোর জন্য ট্রামকর্মীরা সাধারণত বর্ধিত হারে ভাড়া আদায়ের জন্য কোনও পীড়াপীড়ি করেনি। কিন্তু ২রা জুলাই রাতে সংবাদমাধ্যমের কাছে বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায় জানালেন যে, ট্রামভাড়া বৃদ্ধিকে তাঁরা সমর্থন করেন এবং তা চালু করার ক্ষেত্রে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণের ইঙ্গিতও দেন।[৬০]

৩রা জুলাই থেকে পুলিশি আক্রমণ শুরু হয়। যারাই বর্ধিত হারে ভাড়া দিতে অস্বীকার করে তাদের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে থাকে। ৩রা জুলাই পুলিশি আক্রমণ এবং বিভিন্ন দলের নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ৪ঠা জুলাই প্রতিরোধ কমিটি হরতাল পালনের ডাক দেয় এবং ট্রাম বয়কট করে। ৭ই জুলাই ছাত্রছাত্রীরা ট্রামওয়ে কোম্পানীর সদর দপ্তরের সামনে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ৯ই জুলাই ছাত্রছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিং অভিমুখে মিছিলে সামিল হলে পুলিশ আক্রমণ করে। পুলিশের লাঠিচার্জে বেশ কিছু সংখ্যার ছাত্র ও পথচারী মানুষ গুরুতর আহত হন। পুলিশের আক্রমণের প্রতিবাদে ১৫ই জুলাই ধর্মঘটের ডাক দেয় প্রতিরোধ কমিটি। এই ধর্মঘটে যাদবপুরের বেশকিছু মানুষ বিশেষত উদ্বাস্তু মানুষরা যাদবপুর স্টেশনে লোকাল ট্রেন অবরোধ করতে এলে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের সেই গুলিতে সন্ন্যাসী সর্দার নামে এক আন্দোলনকারী নিহত হয়। তবে, এই ধর্মঘটে ট্রামওয়ে ওয়াকার্স ইউনিয়ন তাদের কর্মচারীদের সামিল করতে পারে নি।

১৫ই থেকে ১৮ই জুলাই চারদিন পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ তীব্র হয়। মধ্য কলকাতার পঞ্চাশোর্ধ শিক্ষক শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পুলিশ মেরে ফেলে। ভবানীপ্রসাদ ঘোষ নামে এক আঠারো বছরের তরুণকে গুলি করে হত্যা করে। এই প্রতিরোধ আন্দোলনে জনগণ এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করে বলে তথ্য থেকে জানা যায়। পুলিশের গতিরোধ করার জন্য পাড়ার ছেলেরা রাস্তার আলো নিভানোর দায়িত্ব নেয়। বাল্ব ভেঙ্গে কিংবা তার কেটে দিয়ে গোটা পাড়া এমন অন্ধকার করে দিত যে সেই অন্ধকার ভেদ করে পুলিশ এগোবার তেমন সাহস পেত না। এইসময় সরকারের পক্ষ থেকে সভা-সমাবেশ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[৬১]

পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ট্রামওয়ে কর্মীদের একটা অংশ প্রতিরোধ আন্দোলনে

যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই অংশের কর্মীদের নিয়ে জয়েন্ট স্ট্রাইক কমিটি গঠিত হয় এবং তারা প্রতিরোধ আন্দোলনের দাবিসনদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়।

আন্দোলনের ফলে সরকার ১৯শে জুলাই ঘোষণা করে যে, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবটি একটি ন্যায়পীঠে (ট্রাইবুনালে) পাঠানো হবে এবং যতদিন পর্যন্ত তার কোন মীমাংসা না হয়, ততদিন পুরনো ভাড়াই বলবৎ থাকবে। তবে সরকার ১৪৪ ধারা তুলে নিতে অস্বীকার করে এবং ধৃত বন্দীদের মুক্তি দিতে অসম্মত হয়। প্রায় চার হাজার মানুষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল যার মধ্যে বিশ জনকে আটক করা হয়েছিল নিবারক নিরোধ আইনে। ২রা আগষ্ট বিধানচন্দ্র রায় প্রতিরোধ কমিটির এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনায় বসে প্রায় সকল বন্দীকেই মুক্তি দেন। ভাড়াবৃদ্ধি সম্পর্কে বলা হয় ন্যায়পীঠ যদি ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবও করে তাহলেও তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত নিয়েই তা প্রয়োগ করার কথা ভাববেন।

ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির পক্ষ থেকে সমস্ত কর্মীদের অংশগ্রহণের জন্য একটি স্পেশাল নোট তৈরি করে। তাতে মহিলাদের এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান হয়। নোটে বলা হয়— " মহিলা কমরেডরা ট্রাম শ্রমিকদের মা- বোনদের একত্রিত করিয়া পিকেট লাইনে আসিয়া দাঁড়ান। অমৃতবাজার যুগান্তর ধর্মঘটে তাঁহারা যে বিপ্লবী পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবার ট্রামের ধর্মঘটে তাহাদিগকে সে পথে আরো দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হোন।"[৬২]

ট্রাম আন্দোলনকে সফল করার জন্য প্রচার, পিকেটিং ও অর্থ সংগ্রহ, পাড়া ও ক্লাবে জনমত গঠন, পুলিশের ঘাঁটিতে গিয়ে সাধারণ পুলিশকে পক্ষে টানা, পোস্টার, ইস্তাহার ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয় বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষ থেকে। দাবি তোলা হয় ট্রাম শ্রমিকদের মূল দাবি মানতে হবে; সমস্ত ট্রাম শ্রমিক নেতাকে ছাড়তে হবে, ট্রামের ভাড়া বাড়ানো চলবে না; কালাকানুন তুলে নাও; ১৪৪ ধারা তুলে নাও, পুলিশ রাজ ধ্বংস হোক, বিদেশী ট্রাম কোম্পানী জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত কর; আপসপন্থী ও ভেদপন্থী দালালদের ধর্মঘট ভাঙ্গার চেষ্টা ব্যর্থ কর; ট্রামের কমিউনিস্ট সোস্যালিস্ট বিপ্লবী শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ ইত্যাদি।[৬৩]

কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মীরাও যুক্ত হন বলে জানা যায়।[৬৪] 'ঘরে বাইরে' তে প্রকাশিত কলিকাতার সংবাদ থেকেও জানা যায় এই আন্দোলনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির যুক্ত হওয়ার কথা। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা যখন অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত তখন বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে মহিলারাও

পাড়ায় পাড়ায় বৈঠকসভা প্রচার শুরু করেন।[৬৫] পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে মণিকুন্তলা সেন ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয়।[৬৬]

মহিলারা সভার মধ্য দিয়ে প্রচার করেন ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত। রেশনের চালের দাম ছিল   । তা বেড়ে দাঁড়ায়   । তেলের দর বৃদ্ধি সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। বেকারীবৃদ্ধি পাচ্ছে। তার উপর বিদেশী ট্রাম কোম্পানীর ভাড়া বৃদ্ধি। ফলে সাধারণ গৃহিনীরা যাঁরা রাজনীতির ধার ধারেন না যাঁরা জানেন শুধু তাঁদের গৃহ-সেই গৃহের জীবনও বিপন্ন হচ্ছে। তাই সকলকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য মহিলারা প্রচার করেন। এই প্রচারের ফল কি হয়েছিল তা 'ঘরে বাইরে' তে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়।

সংবাদে লেখা হয়—"তাই, ১লা জুলাই থেকে তারাও সারা জুলাই মাস পর্যন্ত কলকাতার সংগ্রামী জনসাধারণের সাথে একই মিছিলে সামিল হয়েছিল। পুলিশী অত্যাচার নগ্ন মূর্তিতে নেমে আসে কলকাতার বুকের উপর। শিশু, নারী, বৃদ্ধ, কাহাকেও তাহারা রেহাই দেয় নাই। গৃহস্থ বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে কুলনারীদের অপমান করতেও এই সরকারের পুলিশ কুণ্ঠিত হয় নাই। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মীরা সেইসব বাড়ী গিয়ে অনুসন্ধান করে দেখেছেন পুলিশী তাণ্ডবের লীলা- কাঁচের আলমারী ভেঙ্গে জিনিসপত্র তছনছ করা হয়েছে রুগ্ন শিশুকে চুলের মুটি ধরে টেনে উঠান হয়েছে। মেয়েরা প্রতিবাদ করলে তাদের গায়ে হাত দিতেও তারা পিছপা হয় নাই। ঘরের ছেলেদের মারতে মারতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছে। আমরা পাড়ায় গেছি, সভা ডেকেছি, কাগজে বিবৃতি দিয়েছে এই পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে আর যে সব ছেলেদের বিনা অপরাধে জেলে আটকিয়ে রেখেছে তাদের বিনা শর্তে ছেড়ে দেবার দাবিতে আমরা সাধারণ মেয়েদের মধ্যে জনমত সংগঠন করেছি।"[৬৭]

ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহিলা নেত্রী প্রভা চ্যাটার্জী কিভাবে যুক্ত হয়েছিলেন এই আন্দোলনে তা তাঁর লেখনী থেকে জানা যায়। তিনি 'ঘরে বাইরে' লেখেন—"ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ আন্দোলনে যাঁরা আহত হয়েছেন যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের বাড়িতে গেলাম। প্রথমেই গেলাম যাদবপুর, ঢুকলাম গোবিন্দ দাসের বাড়ীতে। ১২ বছরের বালক নীরবে দাঁড়ালো এসে। তাঁর ডান হাতে গুলি লেগেছিল, হাতটি কেটে ফেলতে হয়েছে গায়ে হাফ সার্ট আর তার একটি হাত নেই— করুণ নেত্রে সে দাঁড়িয়ে রইল ওই হাতশূন্য জামার হাতার দিকে চেয়ে। কোন্ ভাষায় ওকে সান্ত্বনা দেব? ৬ মাসের রেখে মা মারা যান বাপ পুনরায় বিয়ে করে ছেলের খোঁজ খবর নেন না— দরিদ্র দিদির পরিবারে গলগ্রহের মতো মানুষ। ক্লাস- সিক্স

পর্যন্ত পড়েই একটি ছোট কারখানায় কাজ শিখেছিল।.........

তারপর গেলাম পুলিশেরগুলিতে নিহত সন্ন্যাসী সর্দারের মায়ের কাছে- পুত্রহারা মায়ের আর্তনাদে আকাশ বাতাস মথিত হয়ে উঠলো—তাঁকে সান্তনা দেবার মতো ভাষা আমাদের নেই। এতো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়—এ যে হত্যা -২৩, ২৪ বছরের কর্মঠ যুবকের হৃৎপিণ্ডটাকে এরা গুলিতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। বিধবা মায়ের উপযুক্ত সন্তান ৩টি ছেলের মধ্যেই এই ছেলেটিই চাকরী করছিল আজ পুত্রশোক বুকে নিয়েও তাকে ভাবতে হচ্ছে কি করে কাটবে এই দিনগুলো এই বৃদ্ধ বয়সে কে তাকে খাওয়াবে।....

ভবানী প্রসাদ ২২ বছরের যুবক বিধবা মায়ের একটি মাত্র সন্তান। নয়নের মণি এই ছেলেকে পেটে নিয়ে তিনি বিধবা হন। পরের বাড়ি বাসন মেজে তিনি বড় করেছিলেন ভবানীকে। লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করবেন এই আশা বুকে নিয়ে তিনি বৃদ্ধ বয়সেও পরিশ্রম করে চলছিলেন। মাতৃজীবনের দীর্ঘ ২৩বছরের সাধনা ধূলিসাৎ করে দিল সরকারী পুলিশের বুলেট।[৬৮]

ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। ফলে তেভাগা আন্দোলনের মত ব্যাপ্তি এই আন্দোলনের ছিলনা। তাই, সারা বাংলা জুড়ে এর প্রভাব পড়ে নি। তাছাড়া,আন্দোলন শুরুর আগে, এমনকি কয়েকদিন ধরে আন্দোলন চলার পরেও বামপন্থী দলগুলির কোনও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না এই আন্দোলনের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির রিপোর্টেও তাই উল্লেখ করা হয়েছে—"আমরা আন্দোলনটির বাঁধনহারা প্রকাশে ও তীব্রতায় হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম এবং এমন এক আন্দোলনেরজন্য সাংগঠনিক বা রাজনৈতিক দিক দিয়ে একেবারেই অপ্রস্তুত ছিলাম।"[৬৯] স্বাভাবিকভাবেই গণসংগঠনগুলির কর্মসূচীর মধ্যেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বামপন্থী মহিলাদের কর্মসূচীর মধ্যে তাই প্রাধান্য পেয়েছে সভা, প্রচার এবং জনমত গঠন। আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়ানোও তাঁদের কর্মসূচীর অন্যতম অঙ্গ ছিল।

বঙ্গবিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং বামপন্থী মহিলারাঃ

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে বামপন্থী মহিলারা জাতীয় ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। আন্দোলনটি হল বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন। বিহারের প্রধানমন্ত্রী (রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের তখন প্রধানমন্ত্রী বলা হত) শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও বাংলার প্রধানমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বাংলা ও বিহারকে সংযুক্ত করে একটি প্রদেশে পরিণত করার প্রস্তাব করেন।[৭০]

তাঁরা একটি যুক্ত বিবৃতিতে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির আহ্বান জানান। তাঁদের এই চুক্তি 'রায়-সিংহ চুক্তি' নামে পরিচিত।[৭১]

সারা ভারতের বেশীরভাগ মানুষ যখন ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবিতে সরব, কেন্দ্রীয় সরকার যখন সেই আন্দোলনের চাপে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন নিয়োগে বাধ্য হয়েছে এবং কমিশন সে বিষয়ে তাদের প্রতিবেদন পেশ করার পর কেন্দ্রীয় সরকার যখন কিছু সংশোধনীসহ তা গ্রহণও করেছে— তখন বঙ্গ বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব জনচিত্তকে বিশেষভাবে আহত করে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে তীব্র গণ আন্দোলন। কেন্দ্রীয় সরকার, জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং প্রস্তাবকদ্বয় যদিও এই প্রস্তাবের সাফল্য সম্পর্কে অত্যন্ত নিশ্চিত ছিলেন, তা সত্ত্বেও আন্দোলনের ব্যাপকতার কারণে মাত্র তিনমাসের মধ্যেই তাঁদের পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল।

১৯৫৬খ্রিস্টাব্দে ২৩ শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে প্রদত্ত রায় সিংহের যৌথবিবৃতির মাধ্যমে বঙ্গ বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবের ঘোষণা ২৪ শে জানুয়ারী প্রভাতী সংবাদপত্রে প্রচারিত হলে মানুষ প্রথমে ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্ময়াবিভূত হয়ে পড়েন। বিস্ময়ের রেশ কাটতে না কাটতেই মানুষ প্রায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই রাস্তায় নেমে পড়েন।[৭২] গড়ে ওঠে সংযুক্ত বিরোধী কমিটি যার নেতৃত্বে ছিলেন মোহিত মৈত্র। এই কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে। পরের দিন থেকেই শুরু হয় আন্দোলন।[৭৩]

৩১ শে জানুয়ারী বিধান চন্দ্র রায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সংযুক্তি প্রস্তাবের বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে বলেন যে, প্রস্তাবিত নতুন রাজ্যের নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সংযুক্ত রাজ্য (United States of West Bengal and Bihar)। নতুন রাজ্যে একজন রাজ্যপাল, একটি ক্যাবিনেট, একটি আইনসভা ইত্যাদি থাকবে, তবে এক এলাকা থেকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হলে অপর এলাকা থেকে উপমুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। কলকাতা রাজধানী হিসাবে স্বীকৃত হলেও পাটনা হবে দ্বিতীয় রাজধানী। প্রস্তাবিত রাজ্যটি হবে দ্বিভাষিক বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই সরকারী কাজ পরিচালিত হবে।[৭৪]

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সংযুক্তি প্রস্তাব প্রত্যাহত হয়। তা সত্ত্বেও সংযুক্তি প্রস্তাব বলবৎ থাকায় ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে জেলায় জেলায় আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী নেওয়া হয়। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র উদ্বাস্তুসহ মহিলারা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। আন্দোলন তীব্র হলে আন্দোলনকারীদের সরকারের পক্ষ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথম পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে ২২২জন শ্রমিক, ৩৬১জন ছাত্র, ১৫৮ জন মহিলা ও ৭৭৫ জন উদ্বাস্তু মানুষ কারাবরণ করেন।[৭৫]

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বিভিন্ন জেলায় এবং পাড়ায় পাড়ায় যে সম্মেলন হয় তাতে সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়। ১৯৫৬সালের ২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারি চন্দননগরে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির যে অষ্টম সম্মেলন হয় তাতে সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়। সভানেত্রীর ভাষণে শোভা হুই বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে আহ্বান করে বলেন—"বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালাতে হবে। তা না হলে আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য লুপ্ত হবে। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি লুপ্ত হলে কি নিয়ে আমরা বিশ্বের কাছে দাঁড়াব? বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সমগ্র জীবন ধরে যে ভাষার সাধনা করে গেছেন সেই ভাষা বিলুপ্ত হতে আমরা কিছুতেই দেব না। আমরা মেয়ে-পুরুষ মিলিত হয়ে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছি এবং দাবি করছি অবিলম্বে সরকার এই সর্বনাশা প্রস্তাব প্রত্যাহার করুন।"[৭৬] পাশাপাশি সম্মেলনে সংযুক্তির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ হতে সত্যাগ্রহ করে আইন অমান্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সারা পশ্চিমবাংলায় সংযুক্তির বিরুদ্ধে এক লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হবে।[৭৭] মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কলকাতা জেলার অষ্টম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এই সম্মেলনেও ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[৭৮]

সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বঙ্গ বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলনে দলে দলে মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন পাড়ায় গ্রামে ও শহরে সাধারণ প্রতিবাদ সভায় যোগদান করা ছাড়াও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মীরা প্রতিবাদ সভা করেন এবং সংযুক্তির বিরুদ্ধে সই সংগ্রহ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। মহিলা সংস্কৃতির সম্মেলনের বেলঘরিয়া শাখার পক্ষ থেকে ১লা মার্চ ২০০ শত মহিলার এক প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রা করা হয় এবং ৩রা মার্চ ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির আইন অমান্য আন্দোলনে কিরণশশী গুহ ও শান্তিসুধা সেনগুপ্তা যোগদান করে কারাবরণ করেন।[৭৯]

১লা ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের আরম্ভেই বিরোধী পক্ষের সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।[৮০] আবার বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানিয়ে এবং ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবী জানিয়ে ২৪শে ফেব্রুয়ারি কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্য সব জায়গায় শান্তিপূর্ণ সর্বাত্মক হরতাল পালন হয়। এইদিন পশ্চিমবঙ্গের ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠন কমিটির উদ্যোগে

ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে বলে জানা যায়।[৮১]

সারা রাজ্যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কয়েকশত সদস্য সত্যাগ্রহে যোগ দেন। সমিতির উদ্যোগে বঙ্গ-বিহার প্রযুক্তির বিরুদ্ধে ৫০হাজার স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়।[৮২] আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন বয়স্কা চারুলতা দেবী, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বোসের বৃদ্ধা ভগ্নী চারুশীলা দেবী থেকে অনেক কৃষক রমণী।[৮৩] কলকাতা, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, হুগলী, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, নদীয়া, কোচবিহার, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার মহিলা কর্মী ও নেত্রীরা যোগ দেন। ১৫ই মার্চ মহিলাদের একটি বিশেষ দল কলকাতা হতে আইন অমান্য করতে সরকারী দপ্তর অভিমুখে যাত্রা করেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারি ব্যারাকপুর মহকুমার এস.ডি.ও-র কাছে ইছাপুর থেকে যে মিছিল যায় তাতে স্থানীয় মহিলা সমিতির নেতৃত্বে মহিলারা এই মিছিলে যোগদান করেন। এরপর সেবাগ্রামে মহিলাদের একটি সভা হয়— যেখানে স্থানীয় ভাষাভিত্তিক কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। এই সভা হতে সংযুক্তির বিরুদ্ধে স্বাক্ষর ও মহিলা সত্যাগ্রহী সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ব্যারাকপুর হতে শ্রীমতী গৌরী দাশগুপ্তা কলকাতায় মহিলা সত্যাগ্রহী দলে যোগদান করেন ও কারাবরণ করেন। ব্যারাকপুর কোর্টে আইন অমান্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন সর্বপ্রথম নর্থ ব্যারাকপুর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে তিনজন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। ব্যারাকপুরে এঁরাই প্রথম মহিলা সত্যাগ্রহী দল।[৮৪]

বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে তাতে বাগনানের মহিলারা এক হাজার সই সংগ্রহ করেন। ৭-ই এপ্রিল ৪জন মহিলা সত্যাগ্রহী উলুবেড়িয়া কোর্টে আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। ২১শে এপ্রিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে ৩৩জন মহিলার একটি দল ৮ মাইল পথ পরিভ্রমণ করে উলুবেড়িয়া কোর্টে আইন অমান্য করেন। হুগলী জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মায়া চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চুঁচুড়া কোর্টে হুগলী জেলার মহিলা সত্যাগ্রহীরাও আইন অমান্য করেন। ১৩.৩.১৯৫৬ তাং বৌবাজারে আসা একটি চিঠি পুলিশ ফাইলে রক্ষিত আছে। চিঠিটি পাঠিয়েছেন হুগলী জেলার মহিলা নেত্রী ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা মুক্তা কুমার। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রাদেশিক সম্পাদিকা বেলা লাহিড়ীকে লেখা এই চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন তাঁদের জেলাতেও আইন অমান্য হচ্ছে।[৮৫]

বিধানসভায় প্রতিবাদ জানানো, আইন-অমান্যের পাশাপাশি নানা সভাতেও বঙ্গ-বিহার

সংযুক্তির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে। যেমন- ১.২.১৯৫৬ তারিখে বিকেলে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে আইনজীবি অতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় সংযুক্তির পদক্ষেপের বিরুদ্ধে। এই সভাতেও মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। শ্রীমতি অলকা মজুমদার কংগ্রেস নেতাদের দোষারোপ করে বলেন, ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের যে প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিয়েছিলেন—তা তাঁরা পালন করেন নি। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ এই সংযুক্তি পদক্ষেপের বিরুদ্ধতা করবে। এই প্রস্তাব প্রতিরোধে এগিয়ে আসার জন্য পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে যে সমস্ত বাংলার বিশিষ্টজনেরা আহ্বান জানান তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বামপন্থী মহিলা নেত্রী অনিলা দেবী।[৮৬]

পশ্চিমবঙ্গ-বিহার একীকরণের বিরুদ্ধে এবং ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবিতে ১১ই ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে পশ্চিমবঙ্গ বিহার একীকরণ বিরোধী সারা বাঙ্গলা সম্মেলন হয়। ১৪৬৪জন জনপ্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন গণ সংগঠনের সঙ্গে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এই মহা সম্মেলনের মূল প্রস্তাবে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ‘‘ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবীতে এবং বঙ্গবিহার ও সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী সর্বশক্তি দিয়া তীব্র জনআন্দোলন গড়িয়া তুলিবার ও কঠোর সংগ্রামে অগ্রসর হইবার জন্য’’ আহ্বান জানান হয়।[৮৭]

বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলনে নানা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের পাশাপাশি লেখনীর মধ্য দিয়ে মহিলারা জনমত গঠনের চেষ্টাও করেন বলে তথ্য থেকে জানা যায়। যেমন বামপন্থী মহিলা নেত্রী সাংসদ মণিকুন্তলা সেন ‘ঘরে বাইরে’ তে লেখেন—‘‘বলাবাহুল্য দেশবাসী ইহার সঠিক জবাব দিবেন। বাংলা বিহারবাসীর প্রতি যে জবরদস্তি ও অসম্মান তাহারা দেখাইতেছেন, বাংলা ও বিহারবাসীরা একত্র হইয়াই তাহার জবাব দিবেন। ১৯০৫ সনে একদিন ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ করিতে চাহিয়া এই বাঙ্গালীর হাতেই পরাস্ত হইয়াছিল। সেই বাংলাকে বিলোপ করিবার কংগ্রেস প্রস্তাবও নিঃসন্দেহে এই বাঙ্গালীর হাতেই পরাজিত হইবে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সারা বাংলাব্যাপী আবাল বৃদ্ধবনিতার প্রতিরোধের বান ডাকিয়াছিল একদিন। আজ আবার সেই বন্যারই আওয়াজ উঠিয়াছে বাংলার প্রতিটি গৃহকোণ হইতে। জায়া, ভগ্নী, জননীরাও সেই প্রতিরোধের সমুদ্র যাত্রায় পা বাড়াইয়াছেন। শুধু পুষ্পচন্দন ও মঙ্গলশঙ্খে আইন অমান্যকারী ভ্রাতাদের আশীর্বাদের ভূমিকাতেই নহে আজ বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষার পবিত্র আহ্বানে সহযাত্রীর বেশে নারীদেরও অগণিত সংখ্যায় রাজপথে দাঁড়াইয়া যোগ্য অংশগ্রহণ দেশবাসী প্রত্যক্ষ করিবে।’’[৮৮]

মণিকুন্তলা সেনের লেখা থেকে পশ্চিমবাংলায় আন্দোলনের আভাসও পাওয়া যায়।

তিনি লেখেন — "সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে আইন অমান্য আন্দোলন চলিতেছে তাহা শুধু কলিকাতা নয় সমগ্র পশ্চিমবাংলা জুড়িয়া ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে। মফঃস্বল শহরের মানুষ ও গ্রামাঞ্চলের কৃষকরাও এই আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য দলে দলে প্রস্তুত হইতেছেন। বর্ষয়সী কৃষক মেয়েরা পর্যন্ত আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সংযুক্তি বিরোধী কমিটির সাম্প্রতিক ঘোষণায় জানা যায় শ্রী নেহেরু ও ডাঃ রায় যদি গত ২৪শে তারিখের শান্তিপূর্ণ সর্বাত্মক হরতালের মধ্যেও পশ্চিমবাংলার জনমতের নির্ভুল প্রকাশকে একরূপ জোর করিয়াই অস্বীকার করিতে চান তাহা হইলে গণসত্যাগ্রহ বা ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়াই বাংলার জনমত পুনরায় বিঘোষিত হইবে।"[৮৯]

১৮ই মার্চ ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিটি এর গণ সংগঠনগুলির আহ্বানে কলকাতা ময়দানে প্রায় অর্ধ লক্ষ নরনারীর এক বিরাট সভা থেকে ঘোষণা করা হয় যে, সরকার যদি বাংলা বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব চাপিয়ে দিতে চায় তাহলে তা ব্যর্থ করার জন্য গণ-আন্দোলন ও গণ-আইন অমান্য আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। ঐ সভায় জ্যোতি বসু বলেন যে, "বিধানসভায় ডাঃ রায় উত্তর-পশ্চিম কলকাতার লোকসভা কেন্দ্রে আসন্ন উপনির্বাচনের উল্লেখ করে সংযুক্তিকরণের ইস্যুতে আমাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। আমরা সমস্ত বামপন্থী দল এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।"[৯০] অর্থাৎ ডা: রায় এই নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটলে সংযুক্তি প্রস্তাব প্রত্যাহারের কথা দেন। কার্যত এই নির্বাচনের মাধ্যমে সংযুক্তি প্রস্তাবেরও ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল। উপনির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের পটভূমিতে পরদিন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন।

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে সংঘটিত বঙ্গ-বিহার, সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন নানাদিক থেকেই বিশিষ্টতার দাবি রাখে। সমাজের সর্বস্তরে সমবেতভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ আন্দোলনকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। শুধু কলকাতা নয় জেলা মহকুমা এমনকি গ্রামাঞ্চলেও এই আন্দোলনের প্রসার ঘটেছিল। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবোধের জাগরণ ঘটেছিল বলা যায়। বাঙালী জাতীয়তার প্রকাশ এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠলেও প্রতিবেশী রাজ্যের ভূখণ্ডকে নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার মতো স্পর্শকাতর দাবিতে আন্দোলন পরিচালিত হলেও সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার প্রশ্ন বা বাঙালী-বিহারী সংঘাতের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারেনি। এ বিষয়ে আন্দোলন পরিচালনাকারী রাজনৈতিক দল এবং গণসংগঠনগুলির নেতৃত্বের সচেতনতা উল্লেখযোগ্য ছিল বলা যায়। আর তাতে যৎসামান্য হলেও

মহিলাদের অংশগ্রহণ এই আন্দোলনকে একটি অন্যমাত্রা দেয়। আর সকলের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে আন্দোলন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতে পেরেছিল।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ও বামপন্থী মহিলাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড:

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস সরকারের পরাজয় হয় এবং প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। এই নির্বাচনে কয়েকজন বামপন্থী মহিলা কর্মী যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে যেমন কাজ করেন তেমনই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই নির্বাচনে তিনজন বামপন্থী মহিলা গীতা মুখার্জি, ইলা মিত্র ও নন্দরানী ডল জয়লাভ করেন।

ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত মহিলা সমিতিগুলির পক্ষ থেকে পঞ্চাশজন মহিলার একটি প্রতিনিধিদল নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে তাঁদের সমর্থন ও অভিনন্দন জানিয়ে আসেন।[৯১] প্রতিনিধিদলে ছিলেন ফেডারেশনের সভানেত্রী অরুণা মুন্সী, শান্তা দেব, সুধা রায়, সুরুচি সেনগুপ্ত, জ্যোৎস্না মজুমদার, প্রণতি দে, জ্যোতি চক্রবর্তী প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে মহিলারা একটি অভিনন্দনবাণী লেখেন "বাংলাদেশের যুক্তফন্ট মন্ত্রীসভার প্রতি মহিলা সমাজের অকুণ্ঠ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। ... ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের তরফ থেকে আপনাদের মন্ত্রিসভার সকল ন্যায্য প্রয়াসে সর্বতোমুখী সমর্থনের প্রতিশ্রুতি আপনারা গ্রহণ করুন।[৯২]

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ১৯৬৭ সালের ২৫মে নকশালবাড়ীতে পুলিসের গুলিতে আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে ৭জন নারী, ২জন শিশুসহ মোট ১০ জন নিহত হন। নকশাল বাড়িতে কৃষক হত্যা ও নারী হত্যার বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় ও বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি ও বিভিন্ন গণসংগঠন এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে। শিলিগুড়িতে মহিলা সমিতির ডাকে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ হয় বলে জানা যায়।

১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে প্রফুল্ল ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী করে অন্তবর্তীকালীন পি.ডি.এফ (Progressive Democratic Front) সরকার গড়ে ওঠে। এই সরকারের সঙ্গে থেকে যায় সি.পি.আই., আর.এস.পি., ফরওয়ার্ড ব্লক। ৩০শে নভেম্বর এই মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত সরকার ভেঙ্গে যাওয়ার প্রতিবাদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভের সৃষ্টি

হয়। বিক্ষোভের জেরে ডালহৌসি অঞ্চলে ১৪৪ধারা জারি করে রাখে বলে জানা যায়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিসহ অন্যান্য বামপন্থী সমিতির প্রায় এক হাজার মহিলা আইন অমান্য করেন। স্থানাভাবে পাঁচশত মত জেলে রেখে আর সবাইকে পুলিশ বাসে করে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসে বলে তথ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯৩]

যুক্তফ্রন্ট থেকে ১৩ জানুয়ারি মহিলা দিবস ঘোষণা করা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির মধ্যে মতাদর্শগতভাবে যে অনৈক্য পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছিল তারফলে মহিলা দিবসে কর্মসূচী পালন নিয়ে দুটি পক্ষের মধ্যে ভিন্নমত দেখা দেয় বলে জানা যায়। একপক্ষ মহিলা সমিতির নামে আইন অমান্য করতে চান। আর একটি পক্ষ এর বিরোধিতা করেন। সেজন্য কলকাতায় মহিলা সমিতির নামের পরিবর্তে মহিলারা রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাসেবিকা হিসাবে আইন অমান্য করেন। মহিলা দিবসে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির রাজ্য কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদিকা জ্যোতি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ৫৫জন মহিলা আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। ঐদিন হুগলী, বর্ধমান, ২৪পরগণা, মালদা প্রভৃতি জেলায় মহিলা সমিতির নামেই মহিলাদের আইন অমান্য করায় সংবাদ পাওয়া যায়।[৯৪] ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে আইন অমান্য শুরু হয়। দ্বিতীয় দফায় মহিলা নেত্রী কণিকা গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে ৭৭জন মহিলা আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন।

পাশাপাশি, পি.ডি.এফ সরকারের কয়েক মাসের শাসনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার চিত্র বর্ণনা করে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সদস্যরা একটি রিপোর্ট তৈরি করেন। কলকাতা এবং বিভিন্ন জেলার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই রিপোর্টটি তৈরি করা হয় বলে জানা যায়। এই রিপোর্টটির উপর গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে মহিলা সমিতি প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠান।

সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের প্রতিবাদের ফলে ১৯৬৮ খ্রি. ২১ফেব্রুয়ারি পি.ডি.এফ সরকারকে সরিয়ে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। রাষ্ট্রপতি শাসন ঘোষণার সময় রাজ্যপাল ৬ মাসের মধ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।[৯৫] কিন্তু রাজবন্দীদের মুক্তি না দেওয়ায় ১৯৬৮খ্রিষ্টাব্দে ১৭ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির উদ্যোগে প্রগতি মহিলা সংঘ, নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘ, নেতাজী নগর মহিলা সমিতি প্রভৃতি ১০টি মহিলা সমিতি রাজ্যপালের কাছে একটি স্মারকলিপি দেন বন্দীমুক্তি ও মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি জানিয়ে। পাশাপাশি নারী নির্যাতনের ঘটনায় মহিলারা সংঘবদ্ধ হয়।

যেমন দক্ষিণ কলকাতায় ১৯৬৮খ্রিষ্টাব্দে জুন মাসে স্থানীয় মহিলানেত্রী মনোরমা চৌধুরীকে রাত্রে বাড়িতে ঢুকে মারপিট করে। আজাদগড় সমিতির সম্পাদিকা লক্ষ্মী রায়ের উপরও আক্রমণ হয়। এইসমস্ত কারণে মহিলারা স্মারকলিপি দেন।[৯৬] স্মারকলিপিতে লেখা হয়—

"রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে আপনি বিগত ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ থেকে পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন শীঘ্রই হবে বলে নির্বাচন কমিশনার ঘোষণা করেছেন। সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা আপনার কর্তব্য। নির্বাচন কমিশনারের ঘোষণা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাত্র ৪ মাস বাকি।

আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে এখনও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কারাগারে ৬০জন রাজনৈতিক বন্দী বিনা বিচারে আটক রয়েছেন। উল্লিখিত বন্দী সংখ্যার মধ্যে ৩৪জন রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পেয়ে নিরাপত্তা আইনের 'গ' ধারায় রয়েছেন (P.D. Act 'C' Category)। ২৬ জন বন্দীকে রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা না দিয়ে শুধুমাত্র প্রতিহিংসামূলক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য তাঁদের সমাজবিরোধী ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা আইনের 'ক' ধারায় বন্দী করা হয়েছে।

এই ৬০ জন রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে ১৪জন ছাত্র, ৫জন কৃষক, শিক্ষক মধ্যবিত্ত কর্মচারী ইত্যাদি ৪০জন, শ্রমিক ৫জন রয়েছেন। আরও নানা অজুহাতে নতুন নতুন গ্রেপ্তার অব্যাহত গতিতে চলেছে। আশা করি এ সমস্ত তথ্যই আপনি অবগত আছেন। সুকুমার ছাত্রদের বিনাবিচারে বন্দী রেখে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে বিপর্যস্ত করা ও শিক্ষা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করা অত্যন্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক।

বিনা বিচারে আটক আইন ভারতের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার জন্য প্রয়োগ করা হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। বিনা বিচারে আটক সমস্ত বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি আপনার নিকট আমরা জানাচ্ছি।

নকশালবাড়ী কৃষক আন্দোলন উপলক্ষ করে দুই শতাধিক মামলা আদালতে রুজু করা হয়েছে; আপনার নিকট আমাদের দাবি নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনে ধৃত সমস্ত বন্দীদের মোকর্দ্দমা প্রত্যাহার করে নিয়ে তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দিন। নির্বাচনকালীন সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির অন্যতম উপায় হিসাবে আপনার নিকট আমরা এই দাবিগুলি পেশ করছি।[৯৭]

এইসময় কারিগরি উন্নতির ফলে ছাঁটাই, সাসপেনশন চালু হলে শ্রমিকরা কাজ হারায়। কলকাতা জীবনবীমা কর্পোরেশনে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার বসাবার চেষ্টা হলে শ্রমিকরা প্রতিবাদ

করতে থাকে। মহিলারাও আন্দোলনে অংশ নেয় সভা, মিছিল, কনভেনশন করে। কারণ ‘যন্ত্রদানব’ তাঁদের পরিবারের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে। তাই দেখা যায় ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ২০শে জুলাই এল.আই. সি. দপ্তরের সামনে মহিলারা দীর্ঘসময় অবস্থান করে। এল.আই.সি-র কর্মচারীদের পরিবারের মহিলাদের নিয়ে মহিলা সমিতির নেত্রীরা কম্পিউটার মেশিন প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়ে পূর্বাঞ্চলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেন। দুর্গাপুরে এই আন্দোলন তীব্র হয়। দুর্গাপুর হিন্দুস্থান স্টীলে গোপনে সরকার কম্পিউটার মেশিন বসালে ১৯৬৮খ্রিষ্টাব্দে ৭ই নভেম্বর ‘মহিলা দিবসে’ মহিলারা মিছিল করে ডি.এস.পি.র কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য বিকাল ৪টায় আশিস ময়দানে জমায়েত হন। শোভাযাত্রা থেকে ধ্বনি ওঠে ‘অটোমেশন-এন্টিমেশন’ ‘আনল কারা—সাম্রাজ্যবাদের দালাল যারা’, ‘এ দালালদের চিনে নিন—এই মাটিতে কবর দিন’ ‘ছাঁটাই, লক আউট প্রত্যাহার করো’ ‘অটোমেশন ফিরিয়ে দাও’। রাজ্য কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদিকা জ্যোতি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে মহিলাদের একটি বড় মিছিল দীর্ঘ মাইল পথ অতিক্রম করে। ডি.এস.পি দেখা না করায় পুলিশের হাতে সমাবেশের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।[১৮]

এইসময় বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মচ্যুত করলে মহিলা সমিতির কর্মীরা এগিয়ে যান বলে জানা যায়। ‘কুকমি’ গুঁড়ো মশলার কারখানা বন্ধ করে ১৫০জন মহিলা কাজ হারায়। নারী শ্রমিকদের সঙ্গে মহিলা সমিতির কর্মীরাও আন্দোলনে যোগ দেন। আন্দোলনের চাপে মালিকরা কারখানা খুলতে বাধ্য হয়। চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের নার্স ও কর্মীদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে মহিলা সমিতির কর্মীরা তাদের সাথে যুক্ত হন। এইভাবে শ্রমজীবী মহিলাদের নানা দাবি দাওয়াকে সমর্থন জানিয়ে বামপন্থী মহিলারা তাদের আন্দোলনকে সমর্থন করেন। ফলে শ্রমজীবী মহিলাদের মধ্যে বামপন্থী মহিলাদের প্রভাব বাড়তে থাকে।

রাষ্ট্রপতি শাসন ও বামপন্থী মহিলাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ:

১৯৬৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবাংলায় মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়। নির্বাচনে ৭জন মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হন। তারমধ্যে ৬জন ই ছিলেন যুক্তফ্রন্টের এবং তার মধ্যে দুজন ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) সদস্য। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পটভূমিকায় মহিলা সমিতির মধ্যে ইতিপূর্বে যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল তা প্রকট হওয়ায় সমিতির কাজ কর্ম দুর্বল হয়ে যায়। কারণ কর্মসূচী কি হবে এবং কিভাবে তা বাস্তবায়িত হবে তার নিয়ে কর্মীদের মধ্যে মতের তফাৎ ঘটে। তবে মতভেদ দেখা দিলেও বিভিন্ন

কর্মসূচী গ্রহণ এবং তা রূপায়ণে মহিলা সমিতির কর্মীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গড়ে ওঠার পর টিটাগড়, তেলিনীপাড়া প্রভৃতি শ্রমিক অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য মহিলা সমিতির কর্মীরা প্রচার চালান বলে তথ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের জনগণের সমর্থনে মহিলা সমিতির কর্মীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেসকে সমর্থনের প্রশ্নে মহিলা সমিতির ভাঙ্গন স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ হিসাবে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের কথা ঘোষণা করে অজয় মুখার্জী যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার চেষ্টা করলে মহিলা সমিতির একাংশ বাংলা কংগ্রেসের বিরোধিতা করার জন্য ১৯৬৯ সালের ২৩শে নভেম্বর রাজ্য কাউন্সিল অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ করে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে আর একটি পক্ষ বাংলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করতে রাজী হয়নি। ফলে সমিতি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

১৯৭০ সালের ১৬ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী পদত্যাগ করলে পতন হয় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের। ১৯৭০ সালের ১৯শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। জানা যায় রাষ্ট্রপতি শাসনে দলীয় কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে বেশ কিছু মহিলা কর্মী আক্রান্ত হন এবং প্রতিবাদে আন্দোলন সংগঠিত করেন। যেমন- ১৯৭০ সালের ৪ঠা নভেম্বর মহিলা নেত্রী দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতি পারুল বসুকে শ্রেণীকক্ষে ঢুকে ছুরিকাঘাত করে। ১৯৭১ সালের ২২শে মে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভানেত্রী জ্যোতি চক্রবর্তী (কাকীমা) কে আক্রমণ করে।[৯৯] ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে বেলেঘাটার বস্তিতে আক্রমণ করলে স্থানীয় মহিলা সমিতি ডেপুটেশন নিয়ে ফুলবাগান থানায় গেলে পুলিশ তাদের উপর লাঠিচার্জ করলে কিছু মহিলা আহত হন বলে জানা যায়। এই ঘটনাগুলির প্রতিকার জানিয়ে কলকাতা জেলা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ডেপুটেশন দেয়।

যাদবপুর-টালিগঞ্জ আঞ্চলিক মহিলা সমিতির সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী অর্চনা ভট্টাচার্যকে প্রহার করে। রামহরি ঘোষ লেনে বোমার আঘাতে আক্রান্ত হন উমা আঢ্য। প্রাণে বাঁচলেও তাঁর ডান পা কেটে বাদ দিতে হয়। ১৯৭১খ্রিষ্টাব্দে ১৭ই ডিসেম্বর মহিলা সমিতির কর্মী মাধবী মজুমদার আক্রান্ত হন। অনুরূপভাবে নেতাজীনগর, গান্ধী কলোনী, আদর্শ সংহতি ও শ্রী কলোনীর উপর আক্রমণ হয়। ১৯৭১খ্রিষ্টাব্দে ২৩শে মার্চ কসবা তিলজলা এলাকায় মহিলা সমিতির কর্মী শ্রীমতী আশা মণ্ডল আক্রান্ত হন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে ২৭শে আগষ্ট রাজারহাটে স্থানীয় মহিলা সমিতির সম্পাদিকা অপর্ণা গুপ্তকে আক্রমণ করে। ১৯৭১খ্রিষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর সোদপুর হাউসিং

এস্টেটের শিক্ষিকা ও সমিতির নেত্রী কমল সেনগুপ্ত এবং ইলা সরকারের বাড়িতে আক্রমণ হয়। পাণিহাটি মহিলা সমিতির আঞ্চলিক সভানেত্রী শ্রী কল্যাণী ব্যানার্জীকে পুলিশ আক্রমণ করে প্রায় প্রত্যেকটি জেলাতেই মহিলাদের আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ হাওড়া জেলার মহিলা নেত্রী তরুলতা বাগ, মায়া ধর, রত্না ভট্টাচার্য, হাসি মজুমদার আক্রান্ত হন। বর্ধমানে মহিলা নেত্রী রাজলক্ষ্মী মুখার্জী (১৯৭০ সালের ১০ই জুন), আসানসোল মহকুমার মহিলা নেত্রী অনিমা চক্রবর্তী আক্রান্ত হন বলে তথ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। জানা যায় দুর্গাপুর শিল্পনগরী বেশী আক্রান্ত হয়। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ২২শে এপ্রিল দুর্গাপুরের স্থানীয় মহিলা নেত্রী ঝর্ণা দাশগুপ্ত আক্রান্ত হন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার পাশলা গ্রামে খাস জমির ধান কাটাকে কেন্দ্র করে জোতদার কৃষক সংঘর্ষ বাঁধলে স্থানীয় মহিলা সমিতি কৃষকদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। ফলে জোতদারের গুলিতে স্থানীয় মহিলা নেত্রী ঠাকুর দাসী আহত হন। নদীয়া জেলায় আক্রান্ত হন মহিলা সমিতির নেত্রী মনু দেব, নবদ্বীপের কৃষ্ণা সেন, চাকদহের ছায়া দত্ত ও মীরা সেন আক্রান্ত হন। বীরভূম জেলার মহিলা সমিতির নেত্রী সুজাতা লুনাবৎ আক্রান্ত হন। কুচবিহার জেলায় স্থানীয় মহিলা নেত্রী শিক্ষিকা লতিকা নিয়োগী ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ গুলিবিদ্ধ হন। অনুরূপভাবে মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, দার্জিলিং জেলাতেও আক্রমণের ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়।[১০০]

রাষ্ট্রপতি শাসনে যে সমস্ত বামপন্থী মহিলা কর্মী ও নেত্রী খুন হন তাঁরা হলেন কলকাতার বীথি দে, রুক্মিনী দাস, শিপ্রা সাহা , রাইবালা দাম, ২৪পরগণার অঞ্জলি ঘোষ, সরমা ব্যানার্জি প্রমুখ।[১০১] রাষ্ট্রপতি শাসনে মহিলারা আক্রান্ত হওয়ার প্রতিবাদে এবং রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়। যেমন- ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে ৩রা এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতৃত্বে মহিলাদের একটি মিছিল কলকাতা শহর পরিক্রমা করে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেয়। স্মারকলিপিতে রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি করা হয়।[১০২] ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে ২৮জুন কলকাতা এ.বি.টি.এ হলে মহিলাদের একটি বিশেষ কনভেনশন হয়। কনভেনশনে রাষ্ট্রপতি শাসনে দমনপীড়নের নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি খোলা চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে রাষ্ট্রপতি শাসন বাতিল করে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করার জন্য আবেদন জানানো হয়। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে ২৪নভেম্বর গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভানেত্রী জ্যোতি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল দিল্লীতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেন। প্রতিনিধিদল অবিলম্বে সি.আর.পি প্রত্যাহার ও মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি জানায়।

১৯৭১খ্রিষ্টাব্দে ২২শে মে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভানেত্রী জ্যোতি চক্রবর্তীর উপর আক্রমণের প্রতিবাদে ১৯৭১খ্রিষ্টাব্দে ২৭মে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির আহ্বানে কলকাতা শহীদ মিনার ময়দানে এক সমাবেশ হয়। বিভিন্ন জেলায় মহিলাদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদ জানানো হয় এই সমাবেশ। সমাবেশের কথা বিস্তৃতভাবে লেখা হয় 'একসাথে' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে।[১০৩]

সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় ১৯৭১ সালের ১০ই মার্চ পশ্চিমবাংলার বিধানসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়। নির্বাচনে একটি 'গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন' সরকার তৈরি হয়। ৮৭দিনের এই সরকারের অবসান ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ২৮জুন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ২৯শে জুন আবার রাষ্ট্রপতি শাসন শুরু হয়। অর্থাৎ বিগত এক বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে তিনবার রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হয়। তৃতীয় রাজ্যের রাষ্ট্রপতি শাসনের মহিলা সংগঠনগুলি যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলে বলে জানা যায়। তাই দেখা যায় ১৯৭২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে মহিলাদের একটি কনভেনশন হয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি; মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ এবং নিখিলবঙ্গ মহিলা সঙ্ঘ যৌথভাবে এই কনভেনশনের আহ্বান করে। সন্ত্রাসের শাসনের অবসান, মিসা ও পি.ডি.এ আইন প্রত্যাহার সহ একাধিক দাবি উত্থাপন করা হয় কনভেনশন থেকে।

কংগ্রেস সরকার ও বামপন্থী মহিলাদের আন্দোলন:

১৯৭২সালের মার্চ মাসে নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন হয়।[১০৪] এইসময় থেকে মহিলা সংগঠনগুলি মূলত যৌথভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করে ও আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকে। ১৯৭২ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিসহ একাধিক দাবিতে পাঁচটি বামপন্থী মহিলা সংগঠন সম্মিলিতভাবে সমাবেশ ও মিছিল করে। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ, মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ, অগ্রণী মহিলা পরিষদ ও অগ্রগামী মহিলা সমিতি যৌথভাবে এই সমাবেশ ও মিছিল সংগঠিত করে।[১০৫] ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ নভেম্বর কলকাতা শহীদ মিনার ময়দানে ২৬টি গণসংগঠনের সঙ্গে পাঁচটি বামপন্থী মহিলা সংগঠন একত্রে এক সমাবেশ সংগঠিত করে। বেকারির বিরুদ্ধে ও বেকারদের কাজের দাবিতে এই সমাবেশ হয়।

কংগ্রেস সরকারের আমলে মহিলাদের নানা কর্মসূচীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন -

১৯৭৩সালের ২৭শে জুলাই সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জেলায় মহিলা সমিতির কর্মীরা পিকেটিং করেন বলে জানা যায়। পি.ডি.এর শরিক দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা বীণা গুহ-র বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, গড়িয়াহাট মোড়ে পিকেটরত কমিউনিস্ট নেত্রী রেণু চক্রবর্তীর গায়ে হাত তোলা হয়। কালিঘাট ট্রাম ডিপোর সামনে বাণী দাশগুপ্ত, বিদ্যা মুনসীর নেত্রীত্বে পরিচালিত পিকেটরত ২৪জন মহিলার উপর আক্রমণ করা হয়। মহিলা নেত্রী রেণু গাঙ্গুলিও এই আক্রমণের শিকার হন বলে জানা যায়। পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপোয় মহিলাকর্মী গিরিবালা হোমরায়, শেফালি ভট্টাচার্য, স্বর্ণ ভট্টাচার্যই ট্রাম লাইন থেকে সরিয়ে দেয়। খড়দহে সন্ধ্যা ব্যানার্জী ও মঞ্জু দাশগুপ্ত সহ অন্যান্য মহিলারা নিগৃহীতা হন।[১০৬]

খাদ্যের দাবিতে মহিলারা এই সময় নানা কর্মসূচী নেন। ১৯৭৩ সালের ১লা আগষ্ট বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড ব্লকে সাধারণ মহিলাদের নিয়ে বর্ধমান জেলা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভাপতি আশালতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনামিকা পালের নেতৃত্ব মহিলারা বি.ডি.ও-এর কাছে ডেপুটেশন দেন।[১০৭] ১৯৭৩ সালের ২রা আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি হুগলী জেলা কমিটির শ্রীরামপুরের অন্তর্গত বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটির মহিলারা মহকুমা শাসকের কাছে এক ডেপুটেশন দেন। জেলা সম্পাদিকা মুক্তা কুমারের নেত্রীত্বে পারুল দাশগুপ্তা, শুভ্রা সান্যাল, দীপ্তি ঘোষ, যুথিকা ব্যানার্জী এই ৫জনের একটি প্রতিনিধিদল মহকুমা শাসককে এক স্মারকলিপি দেন। স্থানীয় মহিলা কর্মীদের বিরুদ্ধে অসত্য মামলা প্রত্যাহার সহ অন্যান্য দাবিতে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়।[১০৮] ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ২০শে আগষ্ট বেলা ৩টায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে এক সমাবেশ আহূত হয়। সমিতির সভানেত্রী জ্যোতি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ১৩জন জনের একটি প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের কাছে একটি স্মারকলিপি দেন।

১৯৭৩খ্রিষ্টাব্দে ২০শে আগস্ট বর্ধমান জেলা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পরিচালনায় দশ দফা দাবিতে বর্ধমান জেলাশাসকের নিকট তিন শতাধিক মহিলা ডেপুটেশন দেন বলে জানা যায়। জেলা সম্পাদিকা অর্চনা গুহ ও সহ-সভানেত্রী রানী কোঙার বক্তব্য রাখেন। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ২০শে আগস্ট নদীয়া জেলা কমিটির ডাকে কৃষ্ণনগর টাউন হলে মহিলারা সমবেত হন। জেলা শাসক ব্যস্ত থাকায় অতিরিক্ত জেলা শাসকের সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করেন। আড়ংঘাটা, রানাঘাট, তাহেরপুর বাদকুল্লা, শান্তিপুর, চাপড়া, শিমূলতলা ও কৃষ্ণনগর প্রভৃতি এলাকা থেকে মহিলাদের আসার সংবাদ পাওয়া যায়।[১০৯]

১৯৭৩সালের ২৪শে জুন মেদিনীপুর জেলার গোধুলিয়া গ্রামে এগারোজন মহিলার উপর পুলিশের অত্যাচারের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন গীতা মুখার্জী। ২৮শে আগস্ট বিধানসভায় দাবি করেন যে, ঘটনার তদন্ত করার জন্য সংসদীয় কমিটি গঠন করা হোক।[১১০] ১৯৭৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর অল বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন আয়োজিত চটকল নারী শ্রমিকদের এক কনভেনশনে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সম্পাদিকা পঙ্কজ আচার্য কনভেনশনকে অভিনন্দন জানান। মহিলা নেত্রী কমল সেনগুপ্ত কনভেনশনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করে।[১১১]

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ২১শে সেপ্টেম্বর সরকারের বিভিন্ন নীতির প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির ডাকে সহস্রাধিক মহিলা জেলা শাসকের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মহিলাদের এই সমাবেশে ভাষণ দেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদিকা স্বেতা চন্দ্র। সমিতির পক্ষ থেকে স্বেতা চন্দ্র, ঝর্ণা রায়, গীতা চৌধুরী ও বেলা সরকারকে নিয়ে গঠিত এক প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে বিভিন্ন দাবি নিয়ে আলোচনা করেন।[১১২] খাদ্যের দাবিসহ বিভিন্ন দাবিতে রাধামোহনপুর, শালবনী, চন্দ্রকোণা রোড, গোয়ালতোড়, মেদিনীপুর, খড়্গাপুর, ঝাড়গ্রাম- এই সাতটি ব্লকে মহিলা মিছিল ও ডেপুটেশন দেয়। একইভাবে কলকাতা, হাওড়া, ২৪পরগণা, হুগলী, বাঁকুড়াতেও মহিলা সমিতির নেতৃত্বে মিছিল ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।[১১৩] ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর শ্যামপুর থানায় গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির উদ্যোগে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত এক মিছিল ও পথসভা হয়।[১১৪]

১৯৭৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতৃত্বে শিয়ালদহে একটি পথসভা হয়।[১১৫] ১০ই ডিসেম্বর গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির হাওড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে হাওড়া স্টেশন এলাকায় বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে মহিলাদের এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদিকা পঙ্কজ আচার্য, হাওড়া জেলা কমিটির সভানেত্রী নিরুপমা চ্যাটার্জী এবং প্রাদেশিক নেত্রী রাণু ভট্টাচার্য এই পথসভার সরকারের সমালোচনা করে বক্তৃতা করেন।[১১৬]

খাদ্যদ্রব্য ও কাজের দাবিতে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই মহিলারা আন্দোলন সংগঠিত করেন। জানুয়ারি মাসে জলপাইগুড়িতে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি সোস্যালিস্ট পার্টির মহিলা কর্মী ও এস.ইউ.সির মহিলা কর্মীরা সমবেতভাবে মিছিল করেন ও ডেপুটেশন দেন।[১১৭] ২৫শে জানুয়ারি গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি মেদিনীপুর জেলাকমিটির উদ্যোগে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়।[১১৮] বিভিন্ন জেলায় আন্দোলনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয়ভাবে ১৯৭৪ সালের

১১-১২ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ডাকে খাদ্যের দাবিতে রাজভবনের সামনে ২৪ঘন্টার গণ অবস্থান বিশেষ উল্লেখ্য। খাদ্যসংকটের সঙ্গে ভূমিসংস্কার ও বেকার সমস্যা সমাধানের দাবি জানানো হয়। অবস্থানে বক্তব্য রাখেন জ্যোতি বসু, কেরালার মহিলা নেত্রী সুশীলা গোপালন, প্রমোদ দাশগুপ্ত সহ মহিলা সমিতির সভানেত্রী জ্যোতি চক্রবর্তী, কার্যকরী সভানেত্রী কনক মুখার্জি, সাধারণ সম্পাদিকা পঙ্কজ আচার্য প্রমুখ। অবস্থানে জেলা নেত্রীদের মধ্যে যাঁরা বক্তব্য রাখেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিভা ঘোষ, নিরূপমা চ্যাটার্জী, নন্দরানী ডল, বিমলা রণদিভে, মাধুরী দাশগুপ্তা, কণিকা গাঙ্গুলী, কমল সেনগুপ্ত, অর্চনা গুহ, রানী কোঙার, বেলা বসাক, মায়া ব্যানার্জী, মুক্তা কুমার, অন্নপূর্ণা চ্যাটার্জী, পুষ্প মণ্ডল, মহামায়া সরকার, মমতাজ বেগম, শিপ্রা ভৌমিক, বন্দনা ভট্টাচার্য, ঝর্ণা রায়, মিনতি মুখার্জী প্রমুখ। এই অবস্থানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল অবস্থানকারী মহিলাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল খেতমজুর মহিলা।[১১৯]

১৯৭৪ সালে খাদ্যের দাবিতে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য গণ আন্দোলনগুলিকে সুসংহত করার জন্য সরকার বিরোধী বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি ১৯৭৪সালের ৪-৫ এপ্রিল ১৭ দফা দাবিসনদ গ্রহণ করে। এই ঘোষণায় সাড়া দিয়ে ৩মে ১৯৭৪ সালে গণ প্রতিবাদ দিবস ও আইন অমান্য পালন করে বামপন্থী দলগুলি। তাই, ঐদিন মহিলারা আইন অমান্য করে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী হন বলে জানা যায়। ২৫৪ জন মহিলা ৪ঠা মে মুক্তি পান। নেত্রীদের মধ্যে ৪ঠা মে যাঁরা মুক্তি পান তাঁরা হলেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কনক মুখার্জি, পঙ্কজ আচার্য, প্রভা চ্যাটার্জী, সাধনা ঘোষ, সতী দাশগুপ্ত, কমলা দাস, সরোজিনী শেঠ প্রমুখ। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির গীতা মুখার্জি, বিদ্যামুন্সী, আর.এস.পি.-র গীতা সেন এবং এস.ইউ.সি-র সাধনা রায়চৌধুরী প্রমুখ। বারাসত কোর্টে আইন অমান্য করে যাঁরা গ্রেপ্তার হন তাঁদের মধ্যে ১২জন মহিলা জেলে আটক থাকেন।[১২০] ৫ই মে তুফানগঞ্জ মহকুমা কমিটির ডাকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সাতশো মহিলার বিক্ষোভ মিছিল হয় এবং মহকুমা শাসকের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে।[১২১]

খাদ্যের দাবিতে ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি চটকল শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলন করেন বামপন্থী মহিলারা।[১২২] কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করলে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নৈহাটি আঞ্চলিক কমিটির নেতৃত্বে স্থানীয় চটকল মজদুর ইউনিয়নের নেতা রণজিৎ কুণ্ডুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করেন এবং শেষপর্যন্ত পুলিশ দড়ি খুলে দিতে বাধ্য হয়।[১২৩] ১২ই ফেব্রুয়ারি চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘযের সমর্থন জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ

গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কলকাতা জেলা কমিটি কলকাতায় এক মিছিল ও সমাবেশ করে।[১২৪] অনুরূপভাবে, ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে শিয়ালদহ স্টেশনে মহিলাদের পথসভা হয়। পথসভায় বক্তৃতা দেন মহিলা নেত্রী বিমল রণদিভে, কমল সেনগুপ্ত, কমলা দাস, কমলা চৌধুরী, ইলা সরকার ও রেখা গোস্বামী।[১২৫] ৯ই ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট ও চটকল নারী শ্রমিকদের প্রতি সংহতি জানাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা পঙ্কজ আচার্য, সহ-সভানেত্রী মাধুরী দাশগুপ্তা, সম্পাদিকা প্রভা চ্যাটার্জী, রানু ভট্টাচার্য, হুগলী জেলার গোঁদলপাড়া, তেলেনীপাড়া ও ভদ্রেশ্বরে যান। হুগলী জেলা সমিতির সম্পাদকমণ্ডীর সদস্যা ইলা মুখার্জি, স্থানীয় মহিলা নেত্রীরা এবং বহু চটকল নারী শ্রমিকও এই কর্মসূচীতে অংশ নেন বলে জানা যায়।[১২৬]

রেলশ্রমিকদের আন্দোলনকে শুধুমাত্র সমর্থন জানানো নয়,তার পাশাপাশি রেল শ্রমিকদের পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানো ও তাঁদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ ও প্রচারের কাজ সংগঠিত করেন বামপন্থী মহিলারা । জানা যায়, ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ই মে নিউ জলপাইগুড়িতে মহিলাদের এক বিরাট মিছিল বের হয় রেল কলোনিগুলির উপর আক্রমণের প্রতিবাদে। মিছিল থেকে দুজন মহিলাকে পুলিশ ভ্যানে তুলে নিলে মহিলারা প্রতিবাদ করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করলে ১৬ই মে নিউ জলপাইগুড়িতে হরতাল পালিত হয়।[১২৭] ১৮ই মে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে খড়্গাপুরে ২৪জন রেলশ্রমিককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মহিলারা খড়্গাপুর লোকাল থানার নিকট মিছিল করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। রেল ধর্মঘটের সমর্থনে ১৮ই মে কলকাতায় দশটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সাথে মহিলাদের গণসংগঠনগুলি মিছিলে সামিল হয়।[১২৮] খড়্গাপুর ডিভিশনে ব্যাপক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে রেলশ্রমিকরা ধর্মঘট করে এবং ধর্মঘটীদের মধ্য থেকে চারশত(৪০০) জনকে গ্রেফতার করে। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে কনক মুখোপাধ্যায়, মাধুরী দাশগুপ্ত, বিমলা রণদিভে, পঙ্কজ আচার্য, রাণু ভট্টাচার্য, প্রভা চ্যাটার্জী, কমলা দাস, কণিকা গাঙ্গুলি প্রমুখ মহিলা নেত্রীবৃন্দের একটি প্রতিনিধিদল ১৯শে মে কাঁচরাপাড়া-নৈহাটির রেলকলোনিগুলির কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করেন। পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর নিকট তার বার্তা পাঠানো হয়।[১২৯] ২২শে মে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি কলকাতা জেলা কমিটির নেতৃত্বে ও বেহালা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে রেল ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল ও পথসভা হয়।

১৯৭৪ সালের ২৩শে মে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির প্রতিনিধিরা পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির অফিসে এক বৈঠকে মিলিত হন বলে জানা

যায়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ অগ্রগামী মহিলা সমিতি, মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ এবং নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘের প্রতিনিধিরা। সভায় ২৬শে মে রেলওয়ে শ্রমিকদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপনের জন্য সংহতি দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত হয়।[১৩০]

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ৭ই জুন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় আলোচনা করে এক বিবৃতিতে জানানো হয় যে, রেল ধর্মঘট এগারো দিন অতিবাহিত হবার পর শ্রমিকদের উপর অত্যাচার অব্যাহত থাকায় সংগ্রামী রেলকর্মীদের প্রতি সংহতি জানাবার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে মহিলাদের সভা, সমাবেশ, মিছিল, অর্থ সংগ্রহ অভিযান প্রভৃতি সংগঠিত করার কর্মসূচী হয় বলে তথ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৪ই জুন রেল শ্রমিক কর্মচারীদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও দমন পীড়নের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ডাকে কলকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া-হুগলী থেকে আসা মহিলারা ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব রেলওয়ে হেড অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং ছয় দফা দাবি নিয়ে জেনারেল ম্যানেজারের সাথে দেখা করেন মহিলা প্রতিনিধি মঞ্জরি গুপ্ত ও প্রভা চ্যাটার্জী। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিমলা রণদিভে, নিরুপমা চ্যাটার্জী, মাধুরী দাশগুপ্তা, কণিকা গাঙ্গুলী, প্রভা চ্যাটার্জী, কমল সেনগুপ্ত প্রমুখ।[১৩১]

১৯৭৪ সালের ২১শে জুন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির খড়্গপুর শাখার উদ্যোগে দেড় শতাধিক মহিলার এক কনভেনশন হয়। কনভেনশনে রেল কর্মচারীদের উপর সর্বপ্রকার দমন পীড়ন বন্ধ, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবি এবং আইনগত সাহায্য সংগ্রাম পরিচালনার এবং ক্ষতিগ্রস্ত রেলকর্মচারীদের সাহায্যে তহবিল সংগ্রহের জন্য তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদিকা নন্দরানী ডল, রাজ্য নেতৃত্ব প্রভা চ্যাটার্জী এবং মূল বক্তব্য রাখেন বিমলা রণদিভে প্রমুখ।[১৩২] রেল ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের উপর দমনপীড়নের প্রতিবাদে বিভিন্ন গণসংগঠনের সাথে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি বনগাঁ শাখার উদ্যোগে একটি কনভেনশন হয়।

৮ই মে থেকে ২৭মে পর্যন্ত ২০দিন ব্যাপী বিশ লক্ষ রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটকে সমর্থন জানায় পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কাউন্সিল সভা। রেলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবিও করে সমিতি।[১৩৩] আসানসোলে মহকুমা শাখার পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতৃত্বে ১২ই জুলাই এক গণ ডেপুটেশন দেওয়া হয় মহকুমার শাসকের কাছে। মিসা আইনে ধৃত

শ্রমিক কর্মচারীদের মুক্তির দাবিতে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়।[১৩৪]

রেলকর্মী ধর্মঘটের শুরু থেকেই গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি অর্থসংগ্রহ, সভা-সমাবেশ মিছিল সংগঠিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রীবৃন্দ পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে রেলকর্মীদের উপর থেকে দমন পীড়ন প্রত্যাহারের দাবি জানায়। সমিতি রেলকর্মীদের সমর্থনে সংহতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করায় এন.সি.সি. ফার্ণাণ্ডেজ সমিতিকে অভিনন্দন জানান।[১৩৫]

১৯৭৫ সালের জুন মাসে জরুরী অবস্থা জারি করা হলে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ও অন্যান্য বামপন্থী মহিলা সমিতির নিয়মিত প্রচার আন্দোলনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, সভা-সমিতি, মিছিল সমাবেশের অবাধ গতি ছিল না। ফলে এইসময় রাজনৈতিক আন্দোলনে মহিলারা বিশেষ কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন নি বলে জানা যায়। তাই তাঁরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালটিকে রাষ্ট্রসংঘ 'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করে এবং এই উপলক্ষে বিভিন্ন আলোচনাচক্র সংগঠিত হয় মহিলাদের উদ্যোগে।

এইভাবে দেখা যায় কংগ্রেস সরকারের আমলে মহিলারা নানা ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত রেখেছিলেন এবং অন্যান্য মহিলাদের সমবেত করেছিলেন। আবার এই আন্দোলনগুলিতে মহিলারা এককভাবে যুক্ত না থেকে সমস্ত বামপন্থী নারী সংগঠনগুলি যৌথভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন— যা একটি ইতিবাচক দিক বলা যায়। বামপন্থী নারী সংগঠনে ভাঙ্গনের পর্বে আন্দোলনগুলি যেভাবে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, এইপর্বে নারী সংগঠনগুলি যৌথ উদ্যোগ নেওয়ায় আন্দোলনগুলিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন:

স্বাধীনতার পূর্বে 'বন্দী মুক্তি কমিটি' নামে এক সর্বদলীয় কমিটি গড়ে উঠেছিল। উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বন্দীদের মুক্তিদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা। পরে পরিবর্তিত হয়ে 'ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি' নাম নিয়ে পশ্চিমবাংলায় গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে এই কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে নিরাপত্তা বিল পাশ হবার পর ব্যক্তি স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব হয়। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ই জানুয়ারি এই বিল পাশ হয়।[১৩৬] এই আইনের মূল বিষয় ছিল বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করা, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা, সভা ও শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা

ধর্মঘটকে বে-আইনী করা প্রভৃতি বিশেষ ক্ষমতা সরকারী কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া। এই আইনের ব্যবহার করে সরকার কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার অধীনস্থ সমস্ত শাখা ও গণসংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করে। 'স্বাধীনতা' 'গণশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়।[১৩৭] তাই, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ই মে কমিটিকে পুনর্গঠিত করার জন্য বিভিন্ন দলের লোকেদের নিয়ে একটি সভার আহ্বান করা হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে এই কমিটি পুনর্গঠিত করা হয়। যেমন সভাপতি-অতুলচন্দ্র গুপ্ত (অ্যাডভোকেট), কার্যকরী সভাপতি ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক), যুগ্ম সম্পাদক-প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত (আজাদ হিন্দ ফৌজ) ও যাদবেশ্বর ভট্টাচার্য (কবিরাজ), কোষাধ্যক্ষ ফণীন্দ্রনাথ শেঠ (সভাপতি, ৩নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটি), সভ্য জে.সি.গুপ্ত (এম.এল.এ), জ্যোতি বসু (এম.এল.এ), সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (সম্পাদক, স্বরাজ), জনাব আবুল মনসুর আহমদ (সম্পাদক, ইত্তেহাদ), বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, যুগান্তর), দেবনাথ দাস (আজাদ হিন্দ ফৌজ), নীরেন দে (বার-এট-ল), গীতা মল্লিক (সম্পাদিকা,মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি), অধ্যাপক মহীমোহন বসু, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমোদ ঘোষাল প্রমুখ।[১৩৮]

১৮ই মে তারিখে ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিল। বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে সব অভিযোগ করা হয়েছিল, সেগুলি যেন তথ্য সহকারে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। জানা যায় পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিকে রোগশয্যা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁদের মুক্তির দাবি করেছিল এই বিবৃতি।

২৬শে মে তারিখে সাংবাদিক শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ব্যক্তি-স্বাধীনতা কমিটি কর্তৃক আহুত একটি সাধারণ জনসভায় এই বিবৃতিটি গৃহীত হয়। ২৭মে তারিখে 'স্বরাজ' পত্রিকার এক বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, ২৬মে লালদীঘি অঞ্চলে মহিলা বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়। বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি, ব্যক্তি স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে ৪০/৫০জন মহিলা লালদীঘির সরকারী দপ্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীকিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। কিন্তু এইরূপ প্রস্তাব কিরণ শঙ্কর রায় প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়তে বাধ্য হয়। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে এবং অবাঞ্ছনীয় অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে বিবেচনা করে ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটির সভাপতি শ্রী ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী হীরেণ মুখার্জী ও গীতা মল্লিক ঘটনার কাছে উপস্থিত হয়ে মহিলাদের অনুরোধ করলে তাঁরা শান্ত ভাবে স্থানত্যাগ করেন।

১৯৪৮ সালের ২৬শে জুলাই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কলকাতার বিশিষ্ট আইনজীবী, সাহিত্যিক, শিল্পী প্রায় শতাধিক ক্লাব, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক, ছাত্র, মহিলা সংগঠন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা সমবেত হন। অন্যান্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রী নেত্রী অলকা মজুমদার, মহিলা নেত্রী শোভা হুই, গীতা মল্লিক, অনিলা দেবী প্রমুখ। এই সম্মেলনে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করে রাখার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের নিন্দা করা হয়। এই সম্মেলনে মহিলা সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন কলকাতা জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভানেত্রী শোভা হুই এবং সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন অনিলা দেবী। প্রস্তাবে মহিলাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের তীব্র নিন্দা করা হয়। কাশীপুর অঞ্চলে মেয়েদের গৃহহীন করা, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রী গীতা মুখার্জি, ভারতী বাগচী, মণিকুন্তলা সেন, সুহাসিনী গাঙ্গুলী সহ মহিলা নেত্রীদের গ্রেপ্তার করা, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের উপর দমননীতির প্রয়োগ, মহিলা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কর্মীদের বাড়িতে গিয়ে পুলিশের অত্যাচার ইত্যাদির নিন্দা করে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।[১৩৯]

২৯.৮.১৯৪৮ তারিখ 'নূতন সংবাদে' প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, ২৮শে আগস্ট দিনটিকে 'নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স বিরোধী দিবস' রূপে পালন করার জন্য ২০০টি শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আহ্বান জানান হয়। শ্রমিকরা সমস্ত বামপন্থী দলকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেন। মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে দশ হাজার লোকের এক জমায়েত হয়। সভায় আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রমোদ সেনগুপ্ত ও দেবনাথ দাস, ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী, ট্রাম শ্রমিক নেতা কালী ব্যানার্জী, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অনিলা দেবী, পোর্ট ট্রাস্ট শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা সীতারাম, ছাত্র ফেডারেশনের অলকা মজুমদার, বি.এল.পি.আই-এর হারাধন চ্যাটার্জী, সোস্যালিস্ট ইউনিট সেন্টারের শিবদাস ঘোষ, বড়া কমলাপুরের নির্যাতিত কৃষকদের পক্ষ থেকে গোপাল দাস, অমৃতবাজার পত্রিকার ধর্মঘটী সাংবাদিক সরোজ দত্ত, 'যুগান্তর' প্রেস কর্মচারী সুরেশচন্দ্র মৈত্র প্রমুখ বক্তারা ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর আঘাতের প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তৃতা করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১১টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৪০]

ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির নেতৃত্বে মহিলারা যেমন বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করতে থাকেন তেমনই নিজেদের সংগঠনের উদ্যোগেও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি রক্ষার আন্দোলনেও সংগঠিত করতে থাকেন। তাই দেখা যায়, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলন গুলিতেও এ বিষয়ে নানা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। যেমন ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ১০-১২ই নভেম্বর

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পঞ্চম সম্মেলনে যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল তারমধ্যে অন্যতম ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার ও নারীর বিশেষ অধিকারগুলি রক্ষার প্রস্তাব। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ৩-৪ মে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ষষ্ঠ সম্মেলনেও নারীদের সামাজিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবির উপর প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ২০-২২ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির চতুর্দশ সম্মেলনে ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবির উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলনগুলিতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রস্তাব উত্থাপন ও গ্রহণ করার পাশাপাশি মহিলারা বিভিন্ন কনভেনশনও করেন। যেমন ১৯৭২খ্রিষ্টাব্দে ১৩মে কলকাতার এ.বি.টি.এ হলে চারটি বামপন্থী মহিলা সংগঠনের উদ্যোগে একটি কনভেনশন হয়। এই কনভেনশনের অন্যতম বিষয় ছিল পশ্চিমবাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা। এই কনভেনশন থেকে জেলায় জেলায় সভা-সমাবেশ-মিছিল ও কনভেনশন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত হয়। এরপর ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ২৯মে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির প্রতিনিধিরা দিল্লীতে সংসদভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন কনক মুখোপাধ্যায়। প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন— ‘‘আপনার অবগতির জন্য পরিস্থিতির ভয়াবহতার স্বাক্ষরস্বরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি : ... এই সময়ের মধ্যে ১১জন নারীকে নির্বাচনের পূর্বে ৯জনকে এবং নির্বাচনের পরে ২জনকে - গুণ্ডারা ও সি.আর.পি-র কর্মীরা হত্যা করেছে। তাঁদের মধ্যে আছেন। ১) কলকাতার বীথি দে, যাঁকে ১৯৭১ সালের ২৯মার্চ গুণ্ডারা হত্যা করে; ২) ১৯৭১ সালের ৮ এপ্রিল ২৪পরগণার দমদমে তাঁর ছেলেরা কোথায় আছে সে খবর না বলার জন্য গুণ্ডারা অঞ্জলি ঘোষকে হত্যা করেছে; ৩) ২৪পরগণা জেলার যাদবপুরে গত ২৭ এপ্রিল, ১৯৭১ সি.আর.পি কল্যাণী ঘোষকে হত্যা করেছে; ৪) ১৮মে, ১৯৭১ ২৪ পরগণার বরানগরে সরমা ব্যানার্জীকে গুণ্ডারা হত্যা করেছে; ৫) ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ২৪ পরগণার খড়দহের ১৪ বছরের ছাত্রী মালতী মজুমদারকে গুণ্ডারা খুন করেছে; ৬) ৬ নভেম্বর, ১৯৭১ কলকাতার উত্তর বেলেঘাটায় ১৩বছরের বালিকা শিপ্রা সাহাকে সি আর পি রা খুন করে; ৭) ২২ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বিক্রমগড়ের রুক্মিনী দাসকে গুণ্ডারা খুন করে; ৮) ১৩মার্চ ১৯৭২ ২৪ পরগণার নোয়াপাড়ার রানু ব্যানার্জীকে গুণ্ডারা খুন করে; ১০) ১৩ এপ্রিল, ১৯৭২ কাটোয়ার পূর্ণিমা ব্যানার্জীকে গুণ্ডারা খুন করে; ১১) ১৯৭১ অক্টোবর মাসে দক্ষিণদাঁড়ি এলাকায় একজন মুসলিম বৃদ্ধা মহিলাকে পুড়িয়ে মারা হয়।

এই ১১জন মহিলা ছাড়া আরও দুইটি বালিকাকে— বরানগরের ১০ বছরের মেয়ে স্বর্ণ দাস ও খড়দহের ৮ বছরের মেয়ে শুক্লা দে কে গুণ্ডারা খুন করে। ... এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে দাবি করছি... ৯) সংবিধানে উল্লেখিত জনগণের মৌলিক গণতান্তিক অধিকারগুলি সুনিশ্চিত করতে হবে।"[১৪১]

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সহ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য পাঁচটি কেন্দ্রীয় বামপন্থী মহিলা সমিতি পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ, মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ, অগ্রণী মহিলা পরিষদ ও অগ্রগামী মহিলা সমিতি একটি মিছিল ও সমাবেশ সংগঠিত করে। মিছিলের পর মহিলাদের একটি প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের দাবিপত্র পেশ করেন।[১৪২]

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে বলে জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৬-১৭নভেম্বর দিল্লীতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য একটি সর্বভারতীয় জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। আবার ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ নভেম্বর শৈবাল গুপ্তের সভাপতিত্বে কলকাতায় একটি কনভেনশন হয়। বামপন্থী মহিলা সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা কনভেনশনে যোগ দেন বলে তথ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কনভেনশন থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য জনমত গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়।

এইভাবে দেখা যায় স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে মহিলারা নিজেদের যুক্ত করেন। তাঁদের কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে মিছিল, সভা, সমাবেশের পাশাপাশি জনমত গড়ে তোলার উপরও জোর দেন।

বন্দীমুক্তি আন্দোলনে বামপন্থী মহিলারাঃ

স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বন্দীমুক্তি আন্দোলন। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা আইনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিসহ সাতটি প্রতিষ্ঠানকে সরকার অবৈধ ঘোষণা করে এবং সরকার বিরোধী বক্তব্যের জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মুখপত্র 'ঘরে বাইরে', 'জয়া', 'মুক্তির পথে নারী' একে একে বেআইনী ঘোষিত হয় ও বাজেয়াপ্ত করা হয়। বেশকিছু মহিলা কর্মী ও নেত্রীদের কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে আটক করা হয়। পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ২০.১১.১৯৪৮ তাং আশা সামন্ত, ২.৩.১৯৪৯ তাং

কমলা মুখার্জী, ২৯.৪.১৯৪৯ তাং ভক্তি ঘোষ, ৫.৫.১৯৪৯ তাং অলকা মজুমদার ১৮.৬.১৯৪৯ তাং মণিকুন্তলা সেনকে গ্রেপ্তার করা হয়।[১৪৩] এছাড়া, পঙ্কজ আচার্য, অনিমা মুন্সী, বেলা লাহিড়ী, গীতা মুখার্জী, অনিলা দেবী রায়চৌধুরী, আরতি পাকড়াশি, প্রমুখ মহিলা নেত্রীও কারারুদ্ধ হন।[১৪৪] তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়— "They were taking active interest in the activities of S.D.P.C. a united front of several leftist parties West Bengal including C.P.I., R.S.P., R.C.P.I., P.S.P and F.B (Marxist), the object of which is to bring about chaos and disorder by resorting to illegal and violet activities."[১৪৫] কনক মুখার্জির লেখা থেকে জানা যায় শতাধিক মহিলাকর্মী ও নেত্রীকে কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে আটকে রাখা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য ছিলেন- মণিকুন্তলা সেন,কমলা মুখার্জি, কনক মুখার্জি, অনিলা দেবী, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়, নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়, নলিনী দেবী, অলকা মজুমদার, মীরা চ্যাটার্জী, প্রীতি লাহিড়ী, ভক্তি ঘোষ, সুলেখা সান্যাল, অশ্রু হালিম, ডলি বসু, অনিমা মুন্সী, তরু দেবী, মমতা সেন, ঊষা, আরতি, অঞ্জলি, জ্যোৎস্না, শোভনা, জ্যোতি, রেখা, নীলিমা সেন, রেবা রায়চৌধুরী, বাণী দাশগুপ্তা প্রমুখ। জেলখানার অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদার দাবিতে জেলখানার ভেতরে ও বাইরে আন্দোলন শুরু হয়।

কারান্তরালে বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের কোনো রাজনৈতিক মর্যাদা দেওয়া হোত না। তাই, রাজবন্দীদের ন্যূনতম দাবি আদায়ের জন্য এবং তাঁদের মুক্তির দাবিতে রাজবন্দীদের মা ও বোনেরা গঠন করেন রাজবন্দীদের মায়েদের কমিটি। সভানেত্রী হন বিমলা দেবী ও সম্পাদিকা হন উমা সেন। ১৯৫০ সালের ২১শে এপ্রিল এবং ঐ বছরই ২৬শে মে রাজবন্দীদের মুক্তি চেয়ে এই কমিটি আবেদন প্রচার করে।[১৪৬] রাজবন্দীরা জেলের ভিতরে আন্দোলন করলে ৮ই প্রেসিডেন্সি জেলেও ৯জন দমদম জেলে গুলি চলে। তারই প্রতিবাদে এবং রাজবন্দীর মর্যাদার দাবিতে জেলখানার বাইরে আন্দোলন শুরু হয়। আর এই আন্দোলনকে বন্ধ করার জন্য সরকার প্রকাশ্য সভা সমাবেশ মিছিল নিষিদ্ধ করে এবং ১৪৪ ধারা জারি করে।[১৪৭] এই ঘটনার প্রতিবাদে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের ডাক দেয়। স্থির হয় কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মহিলা ও বুদ্ধিজীবীরা ১৪৪ ধারা অমান্য করে এক একদিন প্রতিবাদ দিবস পালন করবে প্রয়োজনমত প্রতিরোধ গড়ে তুলবে পুলিশি হামলার বিরুদ্ধে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯৪৯ সালের ২৭শে এপ্রিল প্রতিবাদ দিবস পালন করা হবে।

২৭শে এপ্রিল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে একটি

সভা ডাকা হয়।[১৪৮] বক্তা ছিলেন অনিলা দেবী। সাতাশে এপ্রিল সভায় একদিকে যেমন গ্রাম থেকে আসেন কৃষক, ক্ষেতমজুর মহিলারা তেমনই শহর থেকে আসেন শিক্ষিকা নার্স বুদ্ধিজীবী মহিলারা। আসেন রাজবন্দীদের মা বোনেরা। সভাশেষে মিছিল শুরু হয়। মিছিলে স্লোগান ওঠে রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর গুলি চালনায় বিচার চাই"। পশ্চিমবাংলার জেলখানায় অনশনরত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মী বন্দীদের রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দিতেহবে"। "বিনা বিচারে আটক রাখা চলবে না," "বিনা শর্তে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই" ইত্যাদি। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেই মিছিল করা হয়।[১৪৯] মিছিল বৌবাজার স্ট্রিটের দিকে যায়। বৌবাজার কলেজ স্ট্রিটের সংযোগস্থলে সশস্ত্র পুলিশের কাছে বাধা পায়। প্রথম সারিতে মাধুরী দাশগুপ্ত, নীলিমা সেন এবং অন্যান্য মহিলারা পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন। হঠাৎ গুলিবর্ষণে একটা যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হয় বলে জানা যায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন চারজন বামপন্থী মহিলা লতিকা সেন, প্রতিভা রায়চৌধুরী, গীতা সরকার ও অমিয়া দত্ত এবং ছাত্র বিমান ব্যানার্জী।

আনন্দবাজার পত্রিকায় পরিবেশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, "গত বুধবার অপরাহ্নে বৌবাজার স্ট্রিট অঞ্চলে শোচনীয় হাঙ্গামার ফলে ৪জন মহিলা, ১জন পুলিশ কনস্টেবলসহ মোট ৭জন নিহত এবং ৫/৬জন আহত হয়। এই ঘটনায় পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে এবং গুলি চালায়। হাঙ্গামার ফলে কয়েকটি বোমাও নিক্ষিপ্ত হয়। প্রকাশ যে ওইদিন অপরাহ্নে (৫টা) ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নামে একটি মহিলা সভা অনুষ্ঠিত হয়; ওই সভায় অনশনব্রতী নিরাপত্তা বন্দীগণের দাবীর প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোভাব নিন্দা করিয়া বক্তৃতা হয়।

সভান্তে মহিলাগণ এক শোভাযাত্রা সহকারে বৌবাজার স্ট্রীট ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। ওই সভায় উপস্থিত কিছু সংখ্যক পুরুষও ওই শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। কিন্তু শহরে ১৪৪ ধারা জারী থাকায় পুলিশ শোভাযাত্রার অগ্রগতি বাধা দেয় এবং শোভাযাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ে...

হতাহতের তালিকা :

কলকাতা মেডিকেল কলেজ

১) লতিকা সেন (৩০) ৩/১ ল্যান্সডাউন রোড - হাসপাতালে ভর্তির পরে মৃত্যু

২) অমিয়া দত্ত (৩২) ৩ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড - ঐ

৩) গীতা সরকার (২৫) নার্স, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ - ঐ

৪) প্রতিভা গাঙ্গুলী (৩০) ১২৯, ধর্মতলা স্ট্রীট - মৃত অবস্থায় আনীত

৫) অজ্ঞাতনামা পুরুষ (৪০) ঐ

৬) যমুনা দাস মাহাতো (৩২) পুলিশ-হাসপাতালে ভর্তির পর মৃত্যু

৭) মৃণালিনী দেবী (২২) নার্স, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ - অবস্থা আশঙ্কাজনক

৮) দয়ারাম তেওয়ারী (৪২) ঐ

৯) অজ্ঞাতনামা পুরুষ , কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ - ঐ

১০) অজ্ঞাতনামা পুরুষ (২৫) মৃত অবস্থায় আনীত

১১) ক্যাম্বেল হাসপাতাল সরকারী বাসের একজন ড্রাইভার - প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।”[১৫০]

২৭শে এপ্রিল মহিলারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন এই ভেবে যে, তাঁরা সবকিছুকে উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে মিছিল করে মানুষকে রাজবন্দীদের দুরবস্থার কথা, তাঁদের অনশনের কথা, রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদার দাবির কথা জানিয়ে জনমত গড়ে তুলবেন। তাই সভার পর মিছিল করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের দাবীর মর্যাদা দেবেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নিরস্ত্র মহিলা মিছিলে পুলিশ গুলি চালনার কথা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতেও পারেন নি।[১৫১] তাই অভিনেতা কালী ব্যানার্জীর স্ত্রী প্রীতি ব্যানার্জী হতভম্ব হয়ে বলে চলেছিলেন —“মেয়েদের মিছিল কিসের জন্য”?[১৫২] প্রভা চ্যাটার্জি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন— “নিরস্ত্র মহিলা মিছিলের ওপর গুলি চালাবে, আমি ভাবতেও পারিনি।”[১৫৩] অনিলা দেবী লিখেছেন “সভ্য স্বাধীন দেশে নিরস্ত্র মা-বোনেদের মিছিল বোমা-গুলিতে আক্রান্ত হবে - এ যে ছিল স্বপ্নাতীত”।[১৫৪]

আসলে দাবী আদায়ের জন্য মহিলারা সেদিন ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই, দেখা যায় অন্যান্যদের সাথে অনেক বামপন্থী নেত্রী ২৭শে এপ্রিলের সভাতে উপস্থিত হন। যেমন - অনিলা দেবী, প্রভা চ্যাটার্জী, মাধুরী দাশগুপ্ত, শিখা গুহ, প্রীতি ব্যানার্জী, মৃণালিনী দেবী, কমলা দাস, নীলিমা সেন, অভিনেত্রী সাধনা রায়চৌধুরীর মা, মনোরমা বসু প্রমুখ। ২৭শে এপ্রিলের এই ঘটনার প্রতিবাদে ২৮শ এপ্রিল থেকে কারাগারে বন্দীরা অনশন শুরু করেন।

বন্দীমুক্তির দাবিতে আন্দোলনের পাশাপাশি মহিলারা সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও বন্দীমুক্তির আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। যেমন ১৯৪৯ সালের ১০-১২ নভেম্বর কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পঞ্চম সম্মেলনে বন্দীমুক্তি আন্দোলনের উপর আলোচনা ও প্রস্তাব

গ্রহণ করা হয়।[১৫৫] ১৯৫২ খ্রি. ৩-৪ মে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ষষ্ঠ সম্মেলনেও একই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ বন্দীমুক্তির আন্দোলন চলতেই থাকে।

বন্দীমুক্তির আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে আস্তে আস্তে রাজবন্দীদের মুক্ত করা হয়। পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিটেন্টডের ২৫.১.১৯৫১ তারিখের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ২২শে জানুয়ারি ১৯৫১খ্রিষ্টাব্দে হাইকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে ২৩শে জানুয়ারি ১৯৫১খ্রিষ্টাব্দে যাঁদের মুক্ত করা হয় তাঁরা হলেন—

SL No.	Name with their father/husband name	Address	Govt. order for their detention dates
1.	Sm Kanak Mukherjee W/O- Sri Soroj Mukherjee	Calcutta	4705- H.S.dt/ 26.2.50
2.	Sandhyarani Chatterjee W/O- Sri Kamal Chatterjee	Hooghly	4582-H.S. dt/ 26.2.50
3.	Sm. Anjoli Shome, D/O Late Benode Lal Shome	Naihati 24 Paragana	4708-H.S.dt./ 26.2.50
4.	Sm. Priti Roy, W/O Sri Barin Roy	Calcutta	4704-H.S. dt./ 26.2.50
5.	Sm.Anjoli Banerjee, D/O L. Dr. Gostha Behari Banerjee	Colonelgola Midnapore	4822- H.S. dt./ 26.2.50
6.	Sm.Tripti Das Gupta D/O Sri Kamini Kumar Dasgupta	24 Paraganas	4710- H.S. dt./ 26.2.50
7.	Sm.Kamala Mukherjee, W/O	Calcutta	4588- H.S. dt./

	Dr. Nirode Mukherjee		26.2.50
8.	Sm.Anima Munshi, W/O Sri Madhab Munshi	Calcutta	4608- H.S. dt./ 26.2.50
9.	Sm. Sovona Dutta, D/O Sri Hrishikesh Dutta	24 Parganas	4581- H.S. dt./ 26.2.50
10.	Sm Arati Gupta, D/O L. Sitanath Gupta	Calcutta	4608- H.S. dt./ 26.2.50
11.	Sm.Bimala Maji, W/O Sri Ananta Deb Majhi	Chapbasan Tamluk,Midnapore	D.M. Midnapore Order No. 21dt./12.6.50[১৫৬]

পুলিশ ফাইল থেকে আরো কিছু বামপন্থী নারীর বন্দী হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়।

SL No.	Name	No & Date of detention order	Date of order revoking the detention order
1.	Pankoja Acharjee	142dt. 27.9.53	243 dt. 29.9.53
2.	Anima Munshi	241dt. 27.9.53	240 dt. 29.9.53
3.	Bela Lahiri	147dt. 27.9.53	241 dt. 29.9.53
4.	Gita Mukherjee	150dt. 27.9.53	239 dt. 29.9.53
5.	Anila Devi Roy Chowdhury	198dt. 27.9.53	237 dt. 29.9.53
6.	Arati Pakrashi	189dt. 27.9.53	244 dt. 29.9.53[১৫৭]

১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে খাদ্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বেশ কিছু বামপন্থী কর্মী ও নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করা হয়। মহিলা সমিতির কর্মীরা আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। ১৯৬২ খ্রি. চীন-

ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময়ও ভারতরক্ষা আইনে বেশ কিছু মহিলা নেত্রী ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা পঙ্কজ আচার্য ও 'ঘরে বাইরে' পত্রিকার সম্পাদিকা কনক মুখোপাধ্যায় ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন। মহিলা সমিতি ও কৃষক আন্দোলনের নেত্রী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় এবং দার্জিলিং চা-শ্রমিক নেত্রী রণমায়া রাইনী, আসামের মহিলা নেত্রী ডা: কল্যাণী মিশ্র, তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ইলা মিত্রও ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী হন।[১৫৮]

চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পরেও অনেক রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি না হওয়ায় বন্দীমুক্তির জন্য এবং জরুরী অবস্থা ও ভারতরক্ষা আইন প্রত্যাহারের জন্য গণ আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে । ১৯৬৪ সালের ২২ নভেম্বর দমদম জেলে বন্দীরা রাজবন্দীদের ন্যায়সঙ্গত সুযোগ-সুবিধা দাবি করে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ২৮ নভেম্বর বন্দীমুক্তির দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় মিছিল ও সমাবেশ হয়। ১৯৬৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে একটি কনভেনশন হয়। কনভেনশনের আহ্বায়ক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সম্পাদিকা জ্যোতি চক্রবর্তী।[১৫৯]

১৯৬৬সালে খাদ্য আন্দোলনের সময়েও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে মহিলারা সংগঠিতভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। ১৯৬৬ সালের ২৮শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা ফেডারেশনের আহ্বানে বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিল ও মনুমেন্ট ময়দানে একটি সমাবেশ হয়। সমাবেশে পৌরহিত্য করেন অনিলা দেবী। এছাড়া, জ্যোতি চক্রবর্তী, পঙ্কজ আচার্য, নিরুপমা চ্যাটার্জী, সুধা রায়, গীতা মুখার্জী ইলা মিত্র, প্রমুখ নেত্রী বক্তব্য রাখেন বলে জানা যায়। সমাবেশ শেষে রাজ্যপালের কাছে তাঁরা একটি স্মারকলিপি দেন। 'ঘরে বাইরে' -তেও এ ব্যাপারে লেখালেখি হতে থাকে।[১৬০]

১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে পি.ডি.এফ সরকারের সময়ে রাজ্যব্যাপী বন্দীমুক্তি আন্দোলন তীব্র হয় বলে জানা যায়। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার সময় ঘোষণা করা হয় ৬মাসের মধ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন করা হবে এবং রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু অল্প সংখ্যক রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হলে বন্দীমুক্তি আন্দোলন জোরদার হয়। জেলায় জেলায় মিটিং মিছিল ও বন্দীমুক্তির দাবিতে ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির উদ্যোগে কলকাতায় মনুমেন্ট ময়দান থেকে একটি মিছিল রাজ্যপাল ভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়ে আসে। প্রগতি মহিলা সংঘ, নিখিলবঙ্গ মহিলা

সংঘ, নেতাজীনগর মহিলা সমিতি সহ ১০টি মহিলা সংগঠন যৌথভাবে এই স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপিতে বিনাবিচারে আটক ৬০জন রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবি করে বলা হয়—"... বিনা বিচারে আটক আইন ভারতের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার জন্য প্রয়োগ করা হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। বিনা বিচারে আটক সমস্ত বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি আপনার নিকট আমরা জানাচ্ছি।"[১৬১]

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর রাষ্ট্রপতি শাসনের সময় রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে মহিলা সমিতির উদ্যোগে সারা রাজ্যব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত হয় বলে জানা যায়। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়ে দাবি করে—"ধৃত রাজনৈতিক ও গণসংগঠনের কর্মীদের মুক্তি দিতে হবে।"[১৬২] ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ মে কলকাতার এ.বি.টি.এ হলে চারটি বামপন্থী মহিলা সংগঠনের উদ্যোগে একটি কনভেনশন হয় বন্দীমুক্তির দাবিতে ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে। এই দাবিগুলির ভিত্তিতে জেলায় জেলায় সভা সমাবেশ মিছিল ও কনভেনশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২৯মে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কর্মীরা দিল্লীতে সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপিতে তাঁরা দাবি করেন ".... রাজনৈতিক দলের ও গণসংগঠনের যেসব কর্মীদের গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে, তাদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। যেসব রাজনৈতিক বন্দীদের কুড্ডালোর জেলে পাঠানো হয়েছে, তাদের অবিলম্বে পশ্চিমবাংলায় ফিরিয়ে আনতে হবে এবং যতদিন না তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয় ততদিন জেলে প্রথম শ্রেণির বন্দীর মর্যাদা দিতে হবে।"[১৬৩] ১৯৭৫ খ্রি. অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার সময় রাজবন্দীদের মুক্তি এবং মুক্তি সাপেক্ষে বন্দীদের রাজনৈতিক মর্যাদাদানের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত হয়। জানা যায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির কর্মীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কলকাতার রাজপথ পরিক্রমা করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেন।

১৯৭৭ সালের ১১ ও ১৪ জুন অষ্টম বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়। তথ্য থেকে জানা যায় যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দিলে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কর্মী ভারতী তরফদার (যাঁকে ১৯৬৯ সালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়) কে মুক্তি দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে ১৯৭৭ সালের ২রা জুলাই শহীদ মিনার ময়দানে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে এক সমাবেশে ভারতী তরফদারকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এই সমাবেশে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি

ছাড়াও আরো অনেক গণসংগঠনের পক্ষ থেকে ভারতী তরফদারকে অভিনন্দন জানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভানেত্রী জ্যোতি চক্রবর্তীর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে কনক মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ আচার্য, নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মহিলা নেত্রীরা বক্তব্য রাখেন।

এইভাবে দেখা যায় স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির মধ্যে বন্দীমুক্তির আন্দোলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বামপন্থী মহিলারা কারাগারে বন্দী থাকার সময় কারাভ্যন্তরে যেমন রাজবন্দীর মর্যাদার দাবিতে লড়াই করেন তেমনি কারাগারের বাইরেও এই আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁরা বারে বারে বন্দীমুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই আন্দোলনে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন।

মন্তব্য:

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৪৭-১৯৭৭ এই পর্বে বামপন্থী মহিলারা রাজনৈতিক কারণগুলিকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ নেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তাঁদের আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল তেভাগা আন্দোলন। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মহিলারা কৃষকদের পাশে দাঁড়ান, কৃষক রমনীদের জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাঁদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার চেষ্টাও করেন। এরফলে কৃষক রমণীরা বাইরে বেরিয়ে দৃঢ়তার সাথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস পান। এতে কৃষক রমণীদের মনোবল যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনই তেভাগা আন্দোলনে অন্যমাত্রা যুক্ত হয়। বামপন্থী মহিলাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য কৃষক ও শ্রমজীবী মহিলাদের সংগঠনে বেশী করে যুক্ত করা।

ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে বামপন্থী মহিলারা যুক্ত হন। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় সমসাময়িক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলিতেও মহিলারা সরব হয়েছিলেন। ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক ছিল। অর্থাৎ সারা বাংলায় এই আন্দোলন সংগঠিত হয় নি। কিন্তু যেহেতু ট্রামভাড়া বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে যুক্ত ছিল তাই এই আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে বামপন্থী মহিলারা সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছিলেন বলা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে সভা করে সাধারণ মানুষকে বোঝান, প্রচার, জনমত গঠন সর্বোপরি আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করার মত

কর্মসূচী গ্রহণ করেন মহিলারা।

আলোচ্য পর্বে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন। ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের মত এই আন্দোলন শুধু কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল না, এই আন্দোলন জেলা-মহকুমা এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তথ্য থেকে এই আন্দোলনে মহিলাদের বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের কথা জানা যায়। সরকারের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য মহিলারা দলে দলে আইন অমান্য করেন। এরমধ্য দিয়ে বামপন্থী মহিলারা সাধারণ মহিলাদের মধ্যে সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে একটি ছবি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

১৯৬৭ সাল থেকে পশ্চিমবাংলায় এক অস্থির সময়কাল। বারে বারে সরকারের পরিবর্তন ও রাষ্ট্রপতি শাসন পশ্চিমবাংলার মানুষের রাজনৈতিক জীবনকে উদ্বেলিত করেছে মাঝেমধ্যেই। এই অস্থিরতার মধ্যেও রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্থায়ী সরকার গঠন করার মত দাবি নিয়ে বামপন্থী মহিলারা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। এইসময় কারিগরি ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ছাঁটাই, সাসপেনশন চালু হলে কর্মহীন শ্রমিক ও তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ান মহিলারা। তাছাড়া, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, খাদ্যের দাবিতে, জনসাধারণ ও মহিলাদের উপর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে মহিলারা আন্দোলনে সামিল হন এবং বিভিন্ন সময়ে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কাছেও স্মারকলিপি দেন।

আলোচ্যপর্বে শুধুমাত্র রেলশ্রমিকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানানো নয়, তাদের আন্দোলনে সামিল হওয়া, রেলশ্রমিকদের পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানো, তাঁদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করার মত কর্মসূচী নেন মহিলারা।

স্বাধীনতার পর সংগঠিত আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন। আর এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য গড়ে ওঠা ‘ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি’ ও এই কমিটির নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন বামপন্থী মহিলারা। ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের সংগঠনের উদ্যোগেও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি রক্ষার আন্দোলনেও সংগঠিত করতে থাকেন মহিলারা।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলির মধ্যে বন্দীমুক্তি আন্দোলন ছিল অন্যতম। ১৯৪৮খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা আইনে বন্দীদের ন্যূনতম দাবি আদায়ের জন্য এবং তাঁদের মুক্তির দাবিতে মহিলারা সংঘবদ্ধ হন। কারাগারে বন্দী মহিলারা নিজেদের দাবি

আদায়ের জন্য কারাভ্যন্তরে যেমন লড়াই করেন তেমনই কারাগারের বাইরে থাকা মহিলারাও রাজবন্দীর মর্যাদা ও মুক্তির দাবিতে লড়াই সংগঠিত করেন।

তাই বলা যায় যে, ১৯৪৭-১৯৭৭ এই পর্বে মহিলারা সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন ও তা বাস্তবায়িত করতে গিয়ে সমস্ত স্তরের মহিলাদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। তবে, এই পর্বে বামপন্থী নারী সংগঠনে ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিতেও এই মতানৈক্যের প্রভাব পড়ে। অবশ্য জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে বামপন্থী সংগঠনগুলি যৌথভাবে কর্মসূচী পালন করে। আলোচনার শেষে বলা যায় যে সমস্ত সময়কাল জুড়ে বামপন্থী নারীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, কখনো প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন এবং বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯৪

২। দাশ সুস্নাত, অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম, পৃ. ১০

৩। সেন মণিকুন্তলা, সেদিনের কথা। দিনাজপুর জেলার খাঁপুরে তেভাগার লড়াইয়ে কাজ করতে গিয়ে রানী মিত্রের সঙ্গে থেকে প্রত্যক্ষ যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন এই গ্রন্থে সে সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়

৪। শব্দের মিছিল, মেদিনীপুর জেলায় তেভাগা আন্দোলন, পৃ. ১০

৫। কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য; ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪

৬। বসু জ্যোতি, যতদূর মনে পড়ে; ৩৬-৩৭ পৃ.

৭। বন্দ্যোপাধ্যায় কল্যাণী, রাজনীতি ও নারীশক্তি, পৃ.

৮। সেন মণিকুন্তলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১

৯। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান; চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪২৬, 'তেভাগার লড়াইয়ে কৃষক মেয়েদের ভূমিকা' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন রানী দাশগুপ্ত। এই নিবন্ধ থেকে জোতদারের বিরুদ্ধে মহিলাদের ক্ষোভের কারণ সম্পর্কে জানা যায়

১০। বন্দ্যোপাধ্যায় কল্যাণী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

১১। শব্দের মিছিল, মেদিনীপুর জেলায় তেভাগা আন্দোলন, পৃ. ১১

১২। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত - ইতিহাস অনুসন্ধান -৩, ১৯৮৮ - ব্রতভী সেনের লেখা নিবন্ধ থেকে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

১৩। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, ৪র্থ খণ্ড

১৪। সেন মণিকুন্তলা, সেদিনের কথা, পৃ. ১৫১

১৫। সেন মণিকুন্তলা, সেদিনের কথা, পৃ. ১৫২

১৬। শব্দের মিছিল - মেদিনীপুর জেলার তেভাগা আন্দোলন, পৃ. ৬১

১৭। তেভাগা সংগ্রাম রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, (ভূপাল পাণ্ডার প্রবন্ধ) পৃ. ৭১

১৮। তেভাগা সংগ্রাম রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, (মণি-সিংহের প্রবন্ধ) পৃ.৪৮

১৯। দাশ সুস্নাত, অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম; পৃ. ১৮৪

২০। দাশ সুস্নাত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪

২১। রসুল মহম্মদ আবদুল্লাহ; গ্রামে গ্রামান্তরে, পৃ. ৭৩

২২। সেনগুপ্ত অমলেন্দু; উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব; প্রতিভাস ২০০৬, পৃ. ৩০৭.

২৩। দাশ সুস্নাত, অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম; পৃ. ১৮৭ ও চট্টোপাধ্যায় তুষার, স্বাধীনতা সংগ্রামে, হুগলী জেলা, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৮০-২৪ শে ডিসেম্বর, পৃ. ১৭২

২৪। পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬, Report of Deputy Inspector General of Police Intelligence Branch, CID, 2.4.48.

২৫। পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬

২৬। পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬

২৭। চ্যাটার্জি প্রভা, 'তেভাগা আন্দোলনের দিনগুলিতে' একসাথে, শারদ সংখ্যা ১৩৯১, পৃ. ৯২-৯৩

২৮। দাশ সুস্নাত, অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম, পৃ. ১৮৮

২৯। দেশহিতৈষী, ১৩৯৮, পৃ. ১২৩

৩০। দেশহিতৈষী, ২০০৬, পৃ.২০৩

৩১। পুলিশ ফাইল নং ১৬২৮/৪৯। Report of Superintendent of Police (D.C.Sen), Midnapur dated 12.6.50

৩২। পালচৌধুরী অপর্ণা, নারী আন্দোলনের স্মৃতিকথা, পৃ. ২৮। বাংলাদেশে কুখ্যাত নানকার গোলামী প্রথার ও তার ফলে সৃষ্টি আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তৃত জানার জন্য এই গ্রন্থটি বিশেষ

উল্লেখযোগ্য

৩৩। পালচৌধুরী অপর্ণা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩২-৩৩

৩৪। চট্টোপাধ্যায় রাণু, বাংলাদেশের স্মৃতি। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ১৯৮৪ নভেম্বর, পৃ. ২৬ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেত্রী রাণু চট্টোপাধ্যায়। তাঁর স্মৃতিকথা থেকে বাংলাদেশের নারী আন্দোলন ও সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

৩৫। গুপ্ত শ্যামলী, বঙ্গমহিলা চরিতাভিধান, সাহিত্যলোক, ২০০৯, পৃ. ২৮

৩৬। গুপ্ত শ্যামলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৩৭। কামাল মেসবাহ ও ঈশানী চক্রবর্তী, নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ, সমকালীন রাজনীতি ও ইলা মিত্র প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, মে ২০০৬

৩৮। মুখোপাধ্যায় কনক, স্মরণ করি, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি। পৃ. ৫৪-৫৮। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির হীরক জয়ন্তী (১৯৪৩-২০০৩) উপলক্ষে প্রকাশিত এবং ১৯৪৯, সাতাশে এপ্রিলের মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত লতিকা-প্রতিভা-অমিয়া-গীতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে লেখা এই গ্রন্থটি থেকে সাতাশজন বামপন্থী নারীকর্মী ও নেত্রীদের গৌরবজনক ভূমিকা ও জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৩৯। দাশগুপ্ত রানী, 'তেভাগার লড়াই-এ কৃষক মেয়েদের ভূমিকা', তেভাগা সংগ্রাম রজত-জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, কলকাতা, ১৯৭৩

৪০। একসাথে, ফাল্গুন, ১৪১৯, পৃ. ২৫

৪১। পশ্চিমবঙ্গ, তেভাগা সংখ্যা, ১৪০৪, পৃ.৪০

৪২। সেন মণিকুন্তলা, সেদিনের কথা, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৬৩

৪৩। সেন মণিকুন্তলা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৬২-১৬৩

৪৪। সেনগুপ্ত অমলেন্দু; উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব; প্রতিভাস, ২০০৬, পৃ. ২৭৭

৪৫। দাশগুপ্ত রানী, 'তেভাগার লড়াই-এ কৃষক মেয়েদের ভূমিকা', তেভাগা সংগ্রাম রজত-জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, কলকাতা, ১৯৭৩

৪৬। শব্দের মিছিল, মেদিনীপুর জেলায় তেভাগা আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, পঞ্চদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (যুগ্ম) জানুয়ারি-মার্চ, এপ্রিল-জুন ৯৮, পৃ. ৬০-৬১

৪৭। ইসলাম আমিনুল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু মুসলমান ঐক্য, পৃ.৪

৪৮। শব্দের মিছিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯-৬০

৪৯। কবিরাজ নরহরি, তেভাগা আন্দোলন, কৃষক সংগ্রামের এক দিকচিহ্ন প্রবন্ধ।

৫০। চৌধুরী বিনয়, অতীতের কথা, কিছু অভিজ্ঞতা, পৃ. ১২০

৫১। সেন ভবানী, বাংলায় তেভাগা আন্দোলন, তেভাগা সংগ্রাম, রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, ১৯৭৩

৫২। চক্রবর্তী রেণু, ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা (১৯৪০-১৯৫০),অনুবাদ - পুষ্পময়ী বোস ও মণিকুন্তলা সেন। মণীষা, পৃ. ৭৯

৫৩। পুলিশ ফাইল নং ৭৮৯/৪৬, ২৬.৩.১৯৪৮ তাং ঊষা চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তারের সময় একটি বিস্তারিত বিবরণী তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়—যা থেকে এই সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়।

৫৪। পুলিশ ফাইল নং ১৬২৮/৪৯, Report of a D.I.B Officer 16.2.1948

৫৫। পুলিশ ফাইল নং ১৬২৮/৪৯, I.B.No. 2251/C.S. - 23.4.49

৫৬। পুলিশ ফাইল নং ৭৭৭/৪২, ভক্তি ঘোষকে গ্রেপ্তার করার পর যে Brief History তৈরি করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

৫৭। পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬

৫৮। ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, ছাত্রসংগ্রাম, পৃ. ৫২-৫৪

৫৯। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৭৭ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর (১৯৫৩) কলকাতায় ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি পর্যালোচনা হয় এবং তা সভায় গৃহীত হয়। এই পর্যালোচনা থেকে এই আন্দোলন সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

৬০। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৭৭-৪৭৯

৬১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৩

৬২। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, প্রোসেক্ট স্পেশাল নোট-নং ৪৩ বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান- পঞ্চম খণ্ড ৬৫৯-৬৬১

৬৩। পূর্বোক্ত

৬৪। মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা একসাথে, ২০০৫, পৃ. ১১০

৬৫। ঘরে বাইরে, ১৩৫৯/৬০, দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা

৬৬। পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬

৬৭। ঘরে বাইরে, ১৩৫৯/৬০, দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা

৬৮। চ্যাটার্জী প্রভা, 'দায়ী কে' - ঘরে বাইরে, ১৩৫৯/৬০ দ্বিতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা

৬৯। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৯৩

৭০। ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩

৭১। মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ. ১৩৮

৭২। সমাজ জিজ্ঞাসা, ৪র্থ বর্ষ , ১ম ও পয় সংখ্যা ২০০৩, বিদ্যাসাগর সেন্টার ফর সোস্যাল সায়েন্সেস, মেদিনীপুর, পৃ. ২১-২২

৭৩। বসু জ্যোতি, যতদূর মনে পড়ে, পৃ. ১০৯

৭৪। 'B.C. Roy Unable To Get His Own Party To Okey Merger Plan", New Age, 12 February, 1956

৭৫। Gupta Bhupesh. "The West Bengal Anti-Merger Movement - A Shining Land Mark", New age (monthly), v (7), July 1956, pp-7

৭৬। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪০

৭৭। ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩; পৃ. ৩৩

৭৮। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, নবম খণ্ড, পৃ. ২১-২২

৭৯। ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩

৮০। ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩

৮১। ঘরে বাইরে ১৩৬২-৬৩

৮২। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮

৮৩। ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩

৮৪। ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩

৮৫। পুলিঠি ফাইল নং ৮৯৮/৪৪(১) পৃ. ২৯. 13.3.1956 , Bowbazar P.O. Bearing a Postal Seal of issue Howrah R.M.S

৮৬। কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৬

৮৭। কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ২০০৪, পৃ. ২১৩

৮৮। সেন মণিকুন্তলা, 'বঙ্গ বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবের প্রত্যাহার চাই' - ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩

৮৯। সেন মণিকুন্তলা, পূর্বোক্ত, ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩

৯০। সেন মণিকুন্তলা, পূর্বোক্ত, ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩

৯১। মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, একসাথে ২০০৫, পৃ.১৬৮

৯২। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

৯৩। চক্রবর্তী জ্যোতি, রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ১৯৮৮, জানুয়ারী, পৃ.৭০-৭১

৯৪। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২

৯৫। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২

৯৬। চক্রবর্তী জ্যোতি, রাষ্ট্রপতি শাসনে পশ্চিমবাংলার শান্তিশৃঙ্খলা, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫-জ্যোতি চক্রবর্তী রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ১৯৮৮, পৃ. ২২-২৮ রাজ্য যুগ্ম সাধারণ সম্পাদিকা থাকায় তাঁর লেখনীতে রাজ্যের সেইসময়কার ঘটনা সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়।

৯৭। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩

৯৮। চক্রবর্তী জ্যোতি, রাষ্ট্রপতি শাসনে পশ্চিমবাংলার শান্তিশৃঙ্খলা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৫, জ্যোতি চক্রবর্তী রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ১৯৮৮, পৃ. ২৭-২৮

৯৯। চক্রবর্তী জ্যোতি, রক্তের অক্ষরে আশ্বিন ১৩৭৮, জ্যোতি চক্রবর্তী রচনা সংগ্রহ; পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৯-৫১ জ্যোতি চক্রবর্তীকে আক্রমণ করার পর তাঁর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে তিনি তা ব্যক্ত করেন এই লেখনীতে।

১০০। নারীহত্যা-নারী নির্যাতন-পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, পঞ্চম খণ্ড পৃ. ৪৫-৫৮, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত এই রিপোর্ট থেকে রাষ্ট্রপতি শাসনে বিভিন্ন জেলায় আক্রান্ত মহিলাদের বিস্তৃত বিবরণ ও আন্দোলন সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।

১০১। মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ. ১৯৬-১৯৭

১০২। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩

১০৩। 'রক্ত অশ্রু প্রতিজ্ঞা: সম্পাদকীয়', একসাথে, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮, জুন ১৯৭১

১০৪। 'বামপন্থী ফ্রন্টের কর্মনীতি, মার্চ ১৯৭২, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন, দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৫৯

১০৫। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

১০৬। গণশক্তি, ১৯৭৩ খ্রি. ৩রা আগষ্ট

১০৭। গণশক্তি, ১৯৭৩ খ্রি. ৬ই আগষ্ট

১০৮। গণশক্তি; ১৯৭৩ খ্রি. ৬ই আগষ্ট

১০৯। গণশক্তি, ২৩ আগষ্ট

১১০। গণশক্তি, ১৯৭৩ খ্রি. ২৯শে আগষ্ট

১১১। গণশক্তি, ১৯৭৩, ৪ঠা সেপ্টেম্বর

১১২। গণশক্তি, ১৯৭৩, ২৫শে সেপ্টেম্বর

১১৩। গণশক্তি, ১৯৭৩ খ্রি. ৩রা অক্টোবর

১১৪। গণশক্তি, ১৯৭৩ খ্রি. ২৭শে ডিসেম্বর

১১৫। গণশক্তি, ১৯৭৩ খ্রি. ৬ই ডিসেম্বর

১১৬। গণশক্তি, ১৯৭৩ খ্রি. ১২ই ডিসেম্বর

১১৭। গণশক্তি, ১৯৭৩ খ্রি. ২৩শে জানুয়ারি

১১৮। গণশক্তি, ১৯৭৩ খ্রি. ২৮শে জানুয়ারি

১১৯। গণশক্তি, ১৯৭৪ খ্রি. ১২ ও ১৩ ই মার্চ, মুখোপাধ্যায় কনক , পূর্বোক্ত, পৃ.২২১, আচার্য পঙ্কজ - নির্বাচিত রচনা, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ১৯৮৩, জুন পৃ. ৬১

১২০। গণশক্তি, ১৯৭৪, ৫ই মে

১২১। গণশক্তি, ১৯৭৪, ৮ই মে

১২২। মুখোপাধ্যায় কনক , পূর্বোক্ত, পৃ.২২১

১২৩। গণশক্তি, ১৯৭৪, ৭ই ফেব্রুয়ারি

১২৪। গণশক্তি, ১৯৭৪, ১৩ই ফেব্রুয়ারি

১২৫। গণশক্তি, ১৯৭৪, ১৪ই ফেব্রুয়ারি

১২৬। গণশক্তি, ১৯৭৪, ১৫ই ফেব্রুয়ারি

১২৭। গণশক্তি, ১৯৭৪, ১৮ই মে

১২৮। গণশক্তি, ১৯৭৪, ১৯ শে মে

১২৯। গণশক্তি, ১৯৭৪, ২২শে মে

১৩০। গণশক্তি, ১৯৭৪, ২৫শে মে

১৩১। গণশক্তি, ১৯৭৪, ১৫ই জুন

১৩২। নন্দরানী ডলের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ১৭.৫.২০১৫ তারিখ। গণশক্তি,১৯৭৪,২৯শে জুন।

১৩৩। গণশক্তি, ১৯৭৪, ৯ই জুলাই

১৩৪। গণশক্তি, ১৯৭৪, ১৯শে জুলাই

১৩৫। গণশক্তি, ১৯৭৪, ২১শে জুলাই

১৩৬। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০

১৩৭। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৬৭

১৩৮। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৬৭

১৩৯। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৭-১২১

১৪০। নূতন সংবাদ, ২৯.৮.১৯৫৮

১৪১। মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ. ২০৫-২০৭

১৪২। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, ২০৮

১৪৩। পুলিশ ফাইল নং -৮৯৮/৪৪

১৪৪।পুলিশ ফাইল নং - ৩৮৫২/৪৯

১৪৫।পুলিশ ফাইল নং- ৩৮৫২/৪৯

১৪৬। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

১৪৭। চ্যাটার্জী প্রভা, ঐতিহাসিক ২৭শে এপ্রিল, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, সাতাশে এপ্রিল, পৃ. ২১-২২। ১৯৪৯ সালের ২৭শে এপ্রিল রাজবন্দীদের মর্যাদা ও মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করতে চারজন বামপন্থী নারী মৃত্যুবরণ করেন। এই অবিস্মরণীয় দিনটিকে স্মরণে রেখেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

১৪৮। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনুসন্ধান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৪১

১৪৯। গণশক্তি, ২০১৩, ২৭শে এপ্রিল, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৪১, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.১৮৭

১৫০। সেনগুপ্ত অমলেন্দু, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, পৃ. ২৮১-২৮২

১৫১। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনুসন্ধান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৯৭

১৫২। সাতাশে এপ্রিল, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি; পৃ. ৩০

১৫৩। সাতাশে এপ্রিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১৫৪। দেবী অনিলা, যে স্মৃতি ভোলার নয়; সাতাশে এপ্রিল, পৃ. ১৭-১৯

১৫৫। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫

১৫৬। ফাইল নং 1628/49- Copy of Memo No. 167/1(4) S.B. dated 25.1.51 from the Superintendend , Presidency Jail to the Asst. Secy. to the Govt. of West Bengal Home (Special) Dept.

১৫৭। পুলিশ ফাইল নং ৩৮৫২/৪৯

১৫৮। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪

১৫৯। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

১৬০। ঘরে বাইরে, শারদীয় সংখ্যা ১৩৭৩, মানুষের স্বপক্ষে সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য

১৬১। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩

১৬২। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫

১৬৩। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ.২০৭

তৃতীয় অধ্যায়

আর্থ সামাজিক উন্নতির জন্য বামপন্থী মহিলাদের কাজ: (১৯৪৭-১৯৭৭)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় যে সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার মোকাবিলা করার জন্য ও দুঃস্থ জনগণের সাহায্য করার কাজে মহিলারা ঐক্যবদ্ধ হন— যাঁদের মধ্যে বামপন্থী মহিলাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ও কর্মোদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি সমাজে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্যও বামপন্থী মহিলারা বিভিন্নরকম কাজে নিজেদের যুক্ত করেন। তার সাথে সাথে শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তাঁদের বক্তব্যে ও আলোচনায় স্থান পায়।

বাস্তুহারা সমস্যা ও বামপন্থী মহিলাদের প্রচেষ্টা:

দেশ বিভাজন ও স্বাধীনতার পর প্রধান সমস্যা ছিল বাস্তুহারা সমস্যা। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দ্বিখণ্ডিত হবার যন্ত্রণা নিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। ভারতে এই দিনটি একই সাথে আনন্দ ও বিষাদের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়। বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার আনন্দ মানুষ পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেনি। নিদারুণ সাম্প্রদায়িক হিংসা ও বহু মানুষকে গৃহহীন করা সেই আনন্দকে অনেকখানি ম্লান করে দিয়েছিল। মানুষ গৃহহীন হওয়ায় এবং বাসস্থানের আশায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়ায় ভারতে এক নতুন শ্রেণির সৃষ্টি হয় — যাঁদের 'উদ্বাস্তু' নামে অভিহিত করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে উদ্বাস্তুদের আসা শুরু হয় মূলতঃ ১৯৪৬ সালে নোয়াখালি দাঙ্গার পর থেকে এবং এই আসার স্রোত অব্যাহত ছিল ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। মূলত প্রতিবেশীদের মানসিক অত্যাচার ও পরিবারের সম্মান রক্ষার তাগিদে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন বলে জানা যায়। পাকিস্তান প্রায় একটি ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হলে হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে থাকে। ফলে পাকিস্তানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হিন্দুরা ভয়ের পরিবেশে নিজেদের নিঃসঙ্গ মনে করতে থাকেন। আবার অনেকে জীবিকাহীন হয়ে জীবিকার প্রয়োজনে ভারতে চলে আসতে থাকেন। পরিকল্পনাহীনভাবে আসা এই মানুষগুলোকে স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল নবগঠিত ভারত রাষ্ট্রের কাছে এক নতুন সংকল্প।[১]

তথ্য থেকে জানা যায় প্রথম দফায় ৩৫লক্ষ নরনারী এবং পরে আরো কয়েক দফায় উদ্বাস্তু আসার ফলে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৭৫ লক্ষের উপর।[২] পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু মানুষগুলো প্রথমে শিয়ালদহ স্টেশনে এসে জড়ো হত। তারপর প্রতিটি পরিবারকে রিলিফ ও রিহ্যাবিটেশন ডিপার্টমেন্টের অফিস থেকে সার্টিফিকেট নেওয়ার পর রিফিউজি ক্যাম্পে নেওয়া হত। শিয়ালদহ স্টেশনের সাউথ সেকশনে ৩৯ x ৩৬ স্কোয়ার ফুট জায়গা দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হত। এখানে রিফিউজি ক্যাম্পে যাওয়ার আগে উদ্বাস্তুদের থাকতে হত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে চিঁড়ে, গুড় দেওয়া হত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিদিন ৩০০জন মানুষকে পুনর্বাসন দিলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। কারণ, অনেক বেশি মানুষ প্রতিদিন শিয়ালদহ স্টেশনে এসে জড়ো হতেন। ফলে, অস্থায়ীভাবে স্টেশনের প্রধান অংশ ও সাউথ সেকশনে উদ্বাস্তুরা থাকতে বাধ্য হতেন।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রতিদিন ১০০০-৩০০০ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকেন। এইসময় পূর্ববঙ্গে থাকা সংখ্যালঘু হিন্দু মহিলাদের উন্নয়নের জন্য লীলা রায় গড়ে তোলেন 'পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা সংহতি'। কিন্তু পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনতে তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হন এবং আসেন পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু হয়ে। এইসময় সরকারী তরফে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে দেওয়া হত মাসে ১৫ টাকা বা সমতুল্য খাবার এবং একজন বাচ্চার জন্য মাসে ১০ টাকা বা সমতুল্য খাবার।[৩] তথ্য থেকেজানা যায় ১৯৪৯ সালে উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ৭০,০০০ হাজার উদ্বাস্তু ছিল যাদের মধ্যে ৭,৫০০জনকে পুনর্বাসন দেওয়ার মতো অবস্থাও ছিল না।

ফলে বাস্তুহারা সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে এক গুরুতর আকার ধারণ করল। এই সমস্যা সমাধানে মহিলাদের ভূমিকা কেমন ছিল তা বামপন্থী মহিলানেত্রী রেণু চক্রবর্তীর লেখনী থেকেই জানা যায়। তিনি লিখেছেন — " দেশভাগের ফলে দলে দলে মানুষ চলে আসছিল নতুন গড়া পাকিস্তান থেকে। বঙ্গদেশ, পূর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লীর পক্ষে এই বাস্তুহারা সমস্যাই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। যারা সব কিছু পেছনে ফেলে আসছে তাদের আশ্রয় দিয়ে খাদ্য দিয়ে বাঁচাতে হবে। কিন্তু আমলাতন্ত্র আশ্চর্য উদাসীন। প্রতিপদে লড়তে হচ্ছিল এই নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে,বাস্তুহারারা নিজেরাও করছিলেন সংগ্রাম। মহিলারা ছিলেন এই সংগ্রামের পুরোভাগে।"[৪]

মহিলারা যে বাস্তুহারা সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৬মে তারিখে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যা ও সমর্থকেরা মণিকুন্তলা সেন ও অপর কয়েকজন নেত্রীর পরিচালনায় এক মহিলা মিছিল করে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করেছিলেন।[৫] পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাস্তুহারা সমস্যাসহ আরো কিছু দাবি নিয়ে এই অভিযান হয়। এই অভিযানকে

বন্ধ করার জন্য সরকারের নির্দেশে পুলিশবাহিনী এগিয়ে আসে। ফলে অনেক মহিলা আক্রান্ত হন বলে জানা যায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায়ের নির্দেশে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়।[৬]

উদ্বাস্তু মানুষদের পাশে থেকে কাজ করেছেন মহিলা নেত্রী মণিকুন্তলা সেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন— "কলকাতার পুব, উত্তর ও দক্ষিণে কত যে কলোনির পত্তন হয়েছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। প্রায় সব জায়গাতেই আমরা হাজির। প্রথমে গিয়েছি পুলিসের সঙ্গে লাঠিবাজির মোকাবিলা করতে, পরবর্তী পর্যায়ে গিয়েছি প্রায় প্রত্যেকটি কলোনিতে মহিলা সমিতি গড়তে। একাজে নতুন করে আমরা আর এক দফা ঘুরতে আরম্ভ করলাম।"[৭] পাশাপাশি United Central Refugee council এর নেতৃত্বে তিনি উদ্বাস্তুদের সংগঠিত করেছেন বাংলার মাটিতে পুনর্বাসনের দাবিতে। সহযোগী হিসাবে পেয়েছেন, সুধা রায়, শান্তি গাঙ্গুলী (ফরওয়ার্ড ব্লক), রামকৃষ্ণ মজুমদার (ফরওয়ার্ড ব্লক) এবং নীহার মুখার্জীকে[৮] (এস.ইউ.সি)।

নতুন গড়ে ওঠা কলোনিগুলিতে সমিতি গড়ার কাজ শুরু হয়। এইসব কলোনিতে নতুন নতুন সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। ফলে অনেক নতুন কর্মীও পাওয়া যেতে থাকে। তবে এই নতুন সমিতিগুলি পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে যোগ দেয় নি। তারা তাদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য সমিতিগুলির নামকরণ করে নেহেরু সমিতি, গান্ধী সমিতি, নেতাজী সমিতি, আজাদগড় সমিতি প্রভৃতি। আবার এই সমিতিগুলি গড়ে ওঠার সময় একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সমিতি গড়তে কলোনি থেকে মহিলারা এগিয়ে এলে পরিবারের তরফ থেকে কোন বাধা তো আসতই না, বরং উৎসাহ দেওয়া হত।

তবে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সাথে যুক্ত না হলেও সমিতির গড়ার ফলে কলোনিগুলি থেকে যে সমস্ত মহিলা কর্মী এগিয়ে আসেন পরবর্তীকালে তাঁরা অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হন বলে জানা যায়। এইরকম কয়েকজন কর্মীর নাম পাওয়া যায় মণিকুন্তলা সেনের লেখা থেকে। রেণু গাঙ্গুলী, কবিতা, কমলা, বাসন্তী প্রমুখরা ছিলেন উল্লেখযোগ্য। কলোনিগুলিতে সমিতির সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকলে বামপন্থী মহিলাদের পক্ষে সংগঠনের কাজে উদ্বাস্তু মহিলাদের সম্পূর্ণ সাহায্য করা সম্ভব হোত না। এই সমস্যা মিটে যায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা ফেডারেশন গড়ে উঠলে। কারণ, মহিলা আত্মরক্ষাসমিতিসহ কলোনির সমস্ত সমিতি পশ্চিমবঙ্গ মহিলা ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়।[৯] পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, "1.3.55 about 15.30 hours a procession organised by the C.P.I of about 2000, Women of various collonies and other different places. This procession was led by Manikuntala Sen, Bela Lahiri, Sudha Roy,

Bimal Prativa Debi, Mita Mukherjee and Bidhya Munsi".[১০] এতে যোগ দেন যে সমস্ত মহিলা সমিতি সেগুলি হল —

১) পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বউবাজার,

২) মহিলা সাংস্কৃতিক সমিতি

৩) অশোকনগর কলোনী সমিতি

৪) নেহেরু কলোনী মহিলা সমিতি

৫) গ্রাহাম কলোনী মহিলা সমিতি

৬) বিজেন্দ্র কলোনী মহিলা সমিতি

৭) শান্তিনগর মহিলা সমিতি

৮) সোদপুর মহিলা সমিতি

৯) বনগাঁ মহিলা সমিতি ইত্যাদি

এই মিছিল-এ যে সমস্ত স্লোগান ওঠে তা হল — নারীপুরুষের নির্বিশেষে ছাঁটাই বন্ধ করো, নারী পুরুষ নির্বিশেষে কাজের বন্দোবস্ত করতে হবে, ভাঁওতাবাজি চলবে না ইত্যাদি।[১১] এর থেকে বোঝা যায় বামপন্থী মহিলা নেত্রীদের সাথে কলোনী সমিতিগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে উদ্বাস্তু কলোনী গুলিতে বামপন্থী মহিলাদের যে যোগাযোগ ছিল ও বিভিন্ন বোর্ডের সাথে তাঁরা যে যুক্ত ছিলেন তা জানা যায়। তথ্যে লেখা হয় । " Bansdroni areas: with the transplantation of Lake camp refugees in the Bansdroniarea. In this union board there are 3 CPI members. Kalpana Basu, Juthika Roy and others work amongst the women of this area- Manikuntala Sen also visits this place occasionally."[১২]

এছাড়া জানা যায় যাদবপুরের চিত্তরঞ্জন কলোনীর কথা। এখানে ৫,০০০ (পাঁচহাজার) উদ্বাস্তু লোকের বাস ছিল। বেশ কিছু সি.পি.আই কর্মী এখানকার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন— যাঁদের মধ্যে মহিলা নেত্রী পঙ্কজ আচার্য ছিলেন অন্যতম। নতুন গড়ে ওঠা টালিগঞ্জ, ভাঙড় এবং সোনারপুর এলাকায় সি.পি.আই দলের হয়ে কয়েকজন মহিলা যে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন তা পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়।[১৩]

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভদ্রকালী উদ্বাস্তু মহিলাদের দাবি আদায়ের জন্য এক সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা এম.এল.এ শ্রী অম্বিকা চক্রবর্তী। জানা যায় গত

মাসে (মাসের উল্লেখ নেই) ১৭টি পরিবারে ডোল দেওয়া বন্ধ হয় এবং তাদের উপর অনেক মামলা মোকদ্দমা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই পরিবারগু যাতে সরকারী ডোল পায়, মামলা প্রত্যাহৃত হয়তারজন্য তদন্তকমিটির দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় উদ্বাস্তু মহিলাদের দাবী আদায়ের জন্য এক মিলিত আন্দোলনের আবেদন জানান হয়।[১৪]

উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল একদিকে যেমন সার্বিকভাবে সকল উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক সমস্যার দিকটি, তেমনি নারীদের কিছু বিশেষ আর্থ সামাজিক সমস্যা, যেমন চাল, কাপড় এবং রুজির সমস্যা। আর এই সমস্যার সমাধান করার জন্য মহিলারা যেমন কলোনীগুলিতে গেছেন তেমনই নিজেদের সংগঠনের মধ্য দিয়েও সরকারের উদ্যোগে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। তাই, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বিভিন্ন সম্মেলনে এবিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। যেমন ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির চতুর্থ সম্মেলনে উদ্বাস্তু সমস্যার ওপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে।[১৫] আবার ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ১০-১২ নভেম্বর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পঞ্চম সম্মেলনে উদ্বাস্তু আন্দোলনের উপর আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[১৬] ২১.৯.১৯৫৩ তাং গীতা মুখার্জির নেতৃত্বে প্রায় ২০০০ মহিলা মিছিল করেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে । বেকার ও বাস্তুহারাদের কাজের দাবিতে। এইভাবে বাস্তুহারা সমস্যার সমাধানের জন্য মহিলারা সরকারের কাছে দাবিপত্রও পেশ করেন। মহিলারা উদ্বাস্তু সমস্যার স্থাপনের জন্য বিভিন্ন সভা সংগঠিত করেন উদ্বাস্তুদের নিয়ে। ৯.৩.১৯৫৮ তাং সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বেলা ১৩.৩০ ঘন্টা থেকে ১৬.০০ ঘন্টা পর্যন্ত সভা হয়। শান্তি সরকারের সভাপতিত্বে এই সভা হয়।[১৭]

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান যে,স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে জটিল আকার ধারণ করেছিল। আর এই সমস্যার সমাধানের জন্য মহিলারা সীমিত শক্তি নিয়েও উদ্বাস্তু মহিলাদের পাশে দাঁড়ান। উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের জন্য সমবেতভাবে সরকারের কাছে দাবি উত্থাপন করেন। বিভিন্ন সম্মেলনে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সর্বোপরি, সমিতি গঠনের কাজে তাঁদের উৎসাহিত করেন। মেয়েদের উদ্যোগে স্কুল ও কর্মকেন্দ্র গড়ে তুলে উদ্বাস্তু মহিলাদের স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করেন।

মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নকেন্দ্রিক বিভিন্ন চিন্তাভাবনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ফ্যাসিবিরোধী প্রচার, দেশরক্ষা, আত্মরক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ,

খাদ্য আন্দোলন ও রিলিফের সেবামূলক কাজের মাধ্যমে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সূচনাপর্ব তৈরি হয়। রিলিফের কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দুঃস্থ মহিলাদের এমনভাবে সাহায্য করা যাতে তারা একসময় নিজেরা পরিশ্রম করে, হাতের কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে রোজগার করতে পারে। কারণ, শুধুমাত্র রিলিফের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন কাউকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। নিজ নিজ উপার্জনের মধ্য দিয়ে নিজেরা না দাঁড়াতে পারলে সমস্যার সমাধান হবে না। তাই, মহিলাদের উন্নয়নের জন্য ১৯৪৩-৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মধ্যে কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় ১০০টি কুটিরশিল্প কেন্দ্র গড়ে ওঠে বলে জানা যায়। গরিব দুঃস্থ মেয়েরা যাতে হাতের কাজ করে কিছুটা উপার্জন করতে পারে তারই প্রচেষ্টায় এই কেন্দ্রগুলি খোলা হয়। কেন্দ্রগুলিতে সাধারণত সেলাই, হাতের কাজ, ডালা-কুলো তৈরি, সাজি, মাদুর, পুতুল ইত্যাদি তৈরির কাজ, তাঁত ও চরকা চালানোর কাজ প্রভৃতি করা হত। এছাড়া, কাপড়ের পুতুল, খেলনা, দড়ির পাপোষ, মাথার ফিতা, জাল বোনা, ঠোঙা তৈরি, চটের থলে তৈরি, পাড়ের সুতোর আসন তৈরি, বেতের মোড়া, ঝুড়ি, টেবিল ঢাকা ইত্যাদি সূচীশিল্পের কাজ, ডালের বড়ি, জ্যাম জেলি তৈরি এমনকি কাগজ তৈরির কেন্দ্রও চালানো হত সমিতির নেতৃত্বে।[১৮]

নারীদের উন্নয়নের পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হাত থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। যেমন- সমিতির উদ্যোগে কলকাতায় ১৭টি খিচুড়ি বিতরণ কেন্দ্র খোলা হয়। শিশুদের জন্য দুধ বিতরণ কেন্দ্র খোলা হয় ৮টি। এই কেন্দ্রগুলি থেকে বিনামূল্যে কাপড়, ওষুধ প্রভৃতিও বিলি করা হত।[১৯] ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ২৭শে মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে কলকাতার বিভিন্ন এলাকার অনাথ শিশু ও মহিলাদের আশ্রম ও কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়।[২০] অতঃপর ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় মহিলা সমিতির এই প্রয়াস বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত হয়। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি অন্যান্য মহিলা ও রিলিফ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিতভাবে একটি সংযুক্ত কমিটি গঠন করে। যার নাম হয় 'নারী সেবা সংঘ'। ১৮টি গণসংগঠনের সম্মিলিত প্রয়াসে গড়ে ওঠে এই সংগঠনটি। নিরাশ্রয় মেয়েদের আশ্রয় দানের জন্য হোম তৈরি করা এবং সমাজে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নানারকম শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই সংগঠনটি গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে সমিতির পক্ষ থেকে কমলা মুখার্জি ও রেণু চক্রবর্তীর অবদান ছিল অনেকখানি। রেণু চক্রবর্তীর মা ব্রহ্মাকুমারী রায় প্রতিষ্ঠানের প্রাণ স্বরূপা ছিলেন। নারী সেবা সংঘে বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ শেখানো

হত। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ভালো ছাত্রছাত্রীদের অন্য স্কুলে বা নার্সিং শিক্ষার জন্য পাঠানো হত, বয়স্ক শিক্ষার ক্লাস নেওয়া হত। এইখানে শিক্ষা লাভ করে মেয়েরা নানারকম চাকরিও পেত এবং তাদের সংখ্যা খুব কম ছিল না। নারীসেবা সংঘ তাদের তৈরি সামগ্রীর প্রদর্শনী প্রতিবছর করত। এই ধরনের একটি প্রদর্শনী একবার প্রেসিডেন্সী কলেজে হয়েছিল— যেখানে আত্মরক্ষা সমিতি এবং নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন (AIWC) ও যোগ দিয়েছিল। সরোজিনী নাইডু এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। শিল্প প্রদর্শনীটি দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হন। আত্মরক্ষা ও আত্মনির্ভরতার জন্য মেয়েদের এই কর্মপ্রচেষ্টার তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।[২১]

দুঃস্থ মহিলাদের উন্নয়নের জন্য গড়ে ওঠে কুটির শিল্প সমবায়। সমস্ত পাড়াকেন্দ্রে কাজ শেখানো, অর্ডার জোগাড় করা, জিনিসপত্র সাপ্লাই দেওয়া, সব কেন্দ্রের তৈরি পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা, শিল্পীদের মজুরী দেওয়া এইসব কাজ করত সমবায়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যরা শো (অনুষ্ঠান) করে প্রথম মূলধনের টাকা তোলে। এরপর পাড়াগুলোতে অর্ডার বন্টন ও প্রয়োজন অনুযায়ী মালপত্র দেওয়া এবং পরে আবার কাজ বুঝে নেওয়া — এই সমস্ত কাজ করতেন সমবায় সম্পাদিকা অপর্ণা ব্যানার্জী। আর অর্ডার সংগ্রহ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা — এই কাজ করতেন গীতা মল্লিক। কলকাতার সমস্ত পাড়াকেন্দ্রগুলি আস্তে আস্তে সমবায়ের সাথে যুক্ত হয়। এই কেন্দ্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল লীলা বসু ও সুধা পাল পরিচালিত শ্যামবাজার কেন্দ্র — যেখানে ৫০/৬০ জন মহিলা কাজ করতেন। তাছাড়া, বাবলি সরকার, সুরুচি দেন ও মাধুরী দাশগুপ্ত পরিচালিত কেন্দ্রগুলিও ছিল নিপুণ হাতের কাজের জন্য প্রশংসনীয়।[২২]

বউবাজারে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দপ্তরে একটি কাগজ তৈরির কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস নেত্রী সরোজিনী নাইডু কলকাতার এই কাগজ তৈরির কেন্দ্রটি দেখে উচ্চপ্রশংসা করেছিলেন — "মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে পরিচালিত কাগজ তৈরির প্রতিষ্ঠানটিই প্রথম রিলিফ কেন্দ্র যা আমি এবার দেখলাম। এইরূপ লাভজনক শিল্পে এত নিপুণতার সঙ্গে মেয়েরা কাজ করছে দেখে আমি খুব আনন্দিত। .... সমিতির এইসব বাস্তব কাজ আমি অত্যন্ত প্রশংসার চোখে দেখছি। এর ভিতর দিয়ে মেয়েরা আত্মনির্ভরতা শিখছে — আর তারই ফলে তারা আত্মসম্মান অর্জন করছে।"[২৩]

অনুরূপভাবে বউবাজারের কাছাকাছি একটি তাঁত কেন্দ্র খোলা হয়। কেন্দ্রটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন পঙ্কজ আচার্য, বেলা লাহিড়ী ও অণিমা রায়। ছোট বড় চাদর ও ঝাড়ন তৈরি হত এই কেন্দ্র থেকে। অনেক মহিলা এই কেন্দ্রে কাজ করতেন। মণিকুন্তলা সেনের লেখা থেকে জানা

যায়, সরকারি দপ্তর থেকে এইরকম কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব এলেও সেদিন কর্মীর অভাবে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সরকারের এই প্রস্তাবে রাজী হয় নি বলে জানা যায়।

দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচার জন্য এবং মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় কর্মকেন্দ্র গড়ে উঠে। ঢাকায় কয়েকটি চরকা কেন্দ্র ছিল। নরসিংদিতে মাছ ধরা জাল বুনবার একটি কেন্দ্র ছিল—১২টি জন মহিলা কাজ করতেন। নারায়ণগঞ্জে একটি গামছা বোনার কেন্দ্র ছিল। জানা যায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যারা মুষ্টি ভিক্ষা করে সেই চাল বেচে মেয়েদের মজুরি দিত। নোয়াখালিতে একটি শিশু পালন কেন্দ্র খোলা হয়। এই কেন্দ্রে ৫০জন শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ হত। ফরিদপুরে ১০৪টি কর্মকেন্দ্র ছিল। এখানে ডাল-ছাঁটা, শটীর পালো তৈরি করা, হোগলা বোনা ইত্যাদি মহিলাদের শেখানো হত। দিনাজপুরে একটি কেন্দ্রে ৬০/৭০ জন মহিলা ডাল ছাঁটাই এর কাজ করত। রাজশাহীতেও একটি কর্মকেন্দ্র ছিল। পরে সরকারী সাহায্য না পাওয়ায় তা বন্ধ হয়ে যায়। পাবনার আতাইকুল্লা গ্রামে একটি কর্মকেন্দ্র গড়ে উঠে। ৯০টি ধানকল ছিল এই কর্মকেন্দ্রে। ২৮০ জন মহিলা কাজ করতেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে তেরচর, ইছলি, গাদুরিয়া, পটুয়াখালি, বীরপাশা, লাকুটিয়া, গোবিন্দপুর ইত্যাদি গ্রামে মহিলাদের জন্য কয়েকটি কর্মকেন্দ্র খোলা হয়।[২৪]

এইভাবে দেখা যায় বাংলার প্রায় সর্বত্রই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করার পাশাপাশি মহিলাদের স্বাভাবিক সমাজজীবন ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাধ্যমে। শুধুমাত্র রিলিফ দিয়ে দুর্গত মহিলাদের পাশে দাঁড়ানো নয়, বিভিন্ন কর্মকেন্দ্র খুলে কাজ শিখিয়ে তাঁদের স্বাবলম্বী করে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে। আর এই প্রচেষ্টাতে বামপন্থী মহিলাদের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যারা মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নে সরাসরি যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি সংগঠনের মধ্যেও এ বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৯৪৩সালে সমিতির প্রথম সম্মেলনেই এ বিষয়ে আলোচনা হয়। দীর্ঘদিন ধরে মহিলারা যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছেন এবং কাল বিলম্বনা করে এখনই মেয়েদের এ নিয়ে সংগ্রাম করা যে দরকার সে সম্বন্ধে বলেন অপর্ণা সেন।[২৫] ১৯৪৪ খ্রি. ৪-৫ মে বরিশাল শহরে ঐতিহাসিক অশ্বিনীকুমার হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে এ বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে গৃহীত মূল প্রস্তাবগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল নিরাশ্রয় ও দুঃস্থ নারীদের সমাজজীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা।[২৬] নারীদের উন্নয়নের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র, কর্মকেন্দ্র,

শিক্ষাকেন্দ্র (বিশেষত বয়স্কা) ও দুগ্ধকেন্দ্র খোলা প্রভৃতি আরও গঠনমূলক কাজ করার কথা বলা হয়।[২৭] সেকারণে বৌবাজারে গরীব শিশুদের জন্য সমিতির উদ্যোগে একটি স্কুল খোলা হয়।[২৮]

১৯৪৫খ্রিষ্টাব্দে ১৭-১৮ নভেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে নারী ও শিশুদের উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১) বেকার সমস্যা সমাধানের দাবি, বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য সমাজ সংরক্ষণ, মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান খুলে সেখানে ব্যাপক সংখ্যক নারী কর্মীদের নিয়োগ করার দাবি, নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা ও তারপর কর্মসংস্থানের দাবি সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কলকারখানা অফিস দপ্তরের পুরুষদের সঙ্গে নারীদেরও সমানভাবে কাজের সুযোগ ও সমান কাজে সমান মজুরির দাবি, ২) নারীর অধিকার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। - ক) প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী সকলকে ভোটাধিকার দিয়ে প্রাদেশিক আইনসভায় ভোটার তালিকা সংশোধন করা হোক, খ)মেয়েদের জন্য বাধ্যতামুলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রবর্তন করা হোক ইত্যাদি। প্রাদেশিক সম্মেলনের আগে বিভিন্ন জেলা সম্মেলনেও মহিলাদের ও শিশুদের উন্নয়নের দাবি তোলা হয়। যেমন- ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে দার্জিলিং-এ জেলা সম্মেলনে চা শ্রমিক মেয়েদের নিয়ে আলোচনা হয়। দাবি করা হয় এদের জন্য মাতৃত্বের ছয়মাসের ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।[২৯]

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির চতুর্থ সম্মেলনে মহিলাদের ও শিশুদের পক্ষে যা অত্যাবশ্যকীয় তার উপর আলোচনা ও প্রস্তাব গৃহীত হয়। শিক্ষা, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা, শহরে-গ্রামে বাসগৃহ এবং মাতা ও শিশু কল্যাণ ব্যবস্থার প্রসার ইত্যাদির উপর প্রস্তাব নেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পঞ্চম সম্মেলনে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের দাবি ওঠে— যাতে নারীদের উন্নতির প্রশ্নটি যুক্ত ছিল। নারীদের বিশেষ অধিকারগুলি রক্ষার জন্য বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা,পরিবারে, সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার, সমান কাজের জন্য সমান মজুরী, পর্দা প্রথার বিলোপ ইত্যাদির দাবি ওঠে। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে বিবাহিতা মহিলাদের আকস্মিক ছাঁটাই বন্ধ করা, প্রসূতি কল্যাণ ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র গড়া, প্রসব পূর্ব ও প্রসবোত্তর চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রসূতির জন্য তিনমাসের ছুটি, ভাতা, ক্রেশের ব্যবস্থা, শ্রমিক ও কর্মীদের এবং বেকারদের পরিবারের বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা, সর্দারদের ও মালিকের অত্যাচার থেকে মেয়ে শ্রমিকদের রক্ষার ব্যবস্থা, শিশু সন্তানদের যাতে কাজে লাগাতে না হয় সেজন্য মায়েদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি দাবি তোলা হয়।[৩০] সম্মেলনে উপস্থাপিত দাবিগুলি থেকে

উপলব্ধি করা যায় যে, মহিলাদের আর্থ সামাজিক উন্নতির জন্য এই সমস্ত দাবি ও আলোচনার মাধ্যমে নারীদের মধ্যে চেতনা গড়ে তোলার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়।

১৯৫১ সালের ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। যেমন ঐদিন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে মহিলাদের একটি সভায় প্রবীনা মহিলা নেত্রী মোহিনী দেবী বাংলার নারী সমাজকে বিশ্বশান্তির লড়াইয়ে সামিল হওয়ার আবেদন জানান। বিশ্বনারী সঙ্ঘের উদ্যোগে ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সমস্ত দেশে শান্তির দাবি দিবস পালনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। এই উপলক্ষে ৫,০০০ সই সংগৃহীত হয় বলে তথ্য থেকে জানা যায়।[৩১]

১৯৫১ সালের ১লা জুন আন্তর্জাতিক শিশু দিবসের ঘোষণায় সাড়া দিয়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে। কোরিয়া সমেত এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ঔপনিবেশিক যুদ্ধ এবং খাদ্য বস্ত্রাদির নিদারুণ সংকটের মাঝেই ১লা জুন 'আন্তর্জাতিক শিশুদিবস' পালনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে একটি আবেদন জানানো হয়—যা প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালের ২৬শে মে শনিবার 'স্বাধীনতা' পত্রিকায়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সহ-সম্পাদিকা শোভা হুই বিভিন্ন মহিলা সংগঠন, অন্যান্য গণতন্ত্রী সংগঠন এবং শিক্ষক, চিকিৎসক, ছাত্র বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য সমাজসেবীদের সংগঠনের কাছে শিশুদের মঙ্গলের জন্য কয়েকটি দাবি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান জানান। যেমন ১) শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, ২) শিশু হাসপাতাল ও প্রসূতিসদনবৃদ্ধি, ৩) শ্রমিক মায়েদের প্রসূতিভাতা ও শিশুরক্ষাগারের ব্যবস্থা ৪) শিশু শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনধারণের উপযোগী মজুরির ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি প্রধান দাবি ছিল যুদ্ধখাতে খরচ কমিয়ে সে অর্থ শিক্ষা ও শান্তিপূর্ণ গঠনকার্যে নিয়োগ করা।[৩২]

শিশুদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'শিশুকল্যাণ সংসদ'। চিকিৎসক ডা. ক্ষীরোদ চৌধুরী সভাপতি এবং ডা.মনীন্দ্রলাল বিশ্বাস ও মঞ্জুশ্রী দেবী যুগ্ম সম্পাদক হন। এছাড়াও অনেক বিশিষ্ট চিকিৎসক এই সংসদের মধ্যে ছিলেন। এই শিশু কল্যাণ সংসদের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিল পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। এই শিশুকল্যাণ সংসদের উদ্যোগে ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি 'শিশুসপ্তাহ' পালন করা হয়। এই উপলক্ষে নানা আলোচনাচক্র, প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পোস্টার প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের শিশুদের প্রতি আমাদের সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা তুলে ধরা হয়।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনে কমিটির আহ্বানে কলকাতায় একটি সারা ভারত শিশুরক্ষা সম্মেলন হয়। পুলিশ ফাইল প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় ১৬.৩.১৯৫২ তারিখে এই সম্মেলনে সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী ও মণিকুন্তলা সেন উপস্থিত ছিলেন। শিশুকল্যাণের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করার পাশাপাশি সরকারী নীতিরও আলোচনা করেন।[৩৩] শিশুরক্ষা সংসদ এই সম্মেলনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। শিশুরক্ষা সংসদের সভাপতি ডা: ক্ষীরোদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি ভারতীয় প্রতিনিধিদল ভিয়েনায় আন্তর্জাতিক শিশু সম্মেলনে যোগ দেন।[৩৪]

পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯৫২সালের ১২ থেকে ১৬ই এপ্রিল ভিয়েনায় আন্তর্জাতিক শিশু প্রতিরক্ষা সম্মেলনে ভারতবর্ষ থেকে একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি হিসাবে গিয়েছিলেন সান্তা মুখার্জি। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির একজন কর্মী ছিলেন।[৩৫] বিশ্বগণতান্ত্রিক নারী সংঘ ভারত ও পাকিস্তানে শিশু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়বার জন্য যেসব মূল্যবান পরামর্শ দেন সেগুলি হল —

১) যুদ্ধ সংকট থেকে শিশুকে বাঁচানো,

২) শিশুশ্রমিকদের সংরক্ষণ এবং তাদের জীবন ধারণের উপযোগী মজুরির জন্য দাবি;

৩) শিশু শ্রমিকদের কাজের সময় নির্দিষ্ট করা এবং সান্ধ্য স্কুলের মাধ্যমে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা দাবি,

৪) শিশু শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের দাবি,

৫) শিশুদের স্কুলে ক্যান্টিন খোলা এবং তাতে রাষ্ট্রের সাহায্য আদায় করা;

৬) বাস্তুহারা শিশুদের পুনর্বাসন;

৭) ভবঘুরে শিশুদের কাজকর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা;

৮) আইন করে মায়েদের শিশু নিরাপত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি,

৯) খাদ্য সরবরাহে শিশুর খাদ্য সম্পর্কে প্রাধান্য দেওয়া,

১০) সন্তানজন্মের সময় এবং স্তন্যপায়ী শিশুর জন্য শ্রমজীবী জননীকে উপযুক্ত ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা।

এই দাবিগুলিকে কার্যকর করার জন্য জাতীয় বা আঞ্চলিক স্তরে সকল ব্যক্তি ও সংগঠনকে নিয়ে একটি উদ্যোক্তা কমিটি গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়।[৩৬]

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ৩-৪ মে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ষষ্ঠ সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রস্তাবে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষদের

সঙ্গে নারীরা সমানাধিকার দাবি করে যাতে নারী সমাজের স্বাধীনসত্তার পূর্ণবিকাশ হতে পারে। সেইসঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান ও কর্মক্ষম মহিলাদের জন্য কাজ, স্ত্রীশিক্ষা, শিশুরক্ষা শ্রমজীবী মহিলাদের মাতা ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার দাবি তোলা হয়। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা রেণু চক্রবর্তীর রিপোর্ট থেকে একথা জানা যায়।

শিশুস্বাস্থ্য ও নারীদের সমস্যার সমাধানের জন্য বামপন্থী মহিলারা বিধানসভাতেও এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই মণিকুন্তলা সেন তথ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিশুদের অবস্থা বর্ণনা করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বস্ত্র ও শ্রম সম্পর্কে সরকারের নীতির সমালোচনা করেন। মহিলাদের দুরবস্থা বর্ণনা করে সমস্যার সমাধানের জন্য সমান কাজে সমান মজুরী, মেটারনিটি বেনিফিট বা প্রসূতি ভাতা, কর্মজীবী মহিলাদের ছেলেমেয়েদের নিরাপদে স্থানে রেখে যাওয়ার জন্য ক্রেশের ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবি তোলেন।[৩৭]

পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ২১ শে সেপ্টেম্বর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মিলিত হয়। বেলিয়াঘাটা, শ্যামবাজার, বালিগঞ্জ, শোভাবাজার, এন্টালি, ভবানীপুর, খিদিরপুর, বেহালা, পার্কসার্কাস, মাণিকতলা, মুচিপাড়া এবং শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে মহিলারা আসেন। প্রায় ৭০০জন মহিলা এবং বেশকিছু যুবক সমবেত হন বলে পুলিশ ফাইল থেকে জানা যায়। অপরদিকে গীতা মুখার্জি যিনি ছিলেন এই মিছিলের নেত্রী তিনি 'ঘরে বাইরে'- তে লেখেন এই মিছিলে ছিল ২০০০ মেয়ে। গীতা মুখার্জি, রেণু চক্রবর্তী, মণিকুন্তলা সেন প্রমুখ নেত্রীরা বক্তব্য রাখেন। পুলিশ ফাইলে থেকে মহিলাদের দাবি সম্পর্কে যা জানা যায় তা হল— "They demanded 1) good quality of rice 7Rs. per seer instead of 9 Rs., 2) free distribution of milk for the poor children, 3) free distribution of rice for the people of distressed are as and rice 10 Rs. per maund for the rural area."[৩৮] 'ঘরে বাইরে' থেকে জানা যায় — "তাঁদের সর্বনিম্ন দাবী ১) পচা চাল খাব না, ২) বাড়তি দু'আনা দেব না, ৩) গ্রাম ও শহরের দুঃস্থদের রিলিফ চাই, ৪) বেকার ও বাস্তুহারাদের কাজ চাই, ৫) শিশুদের জন্য বিনামূল্যে দুধ চাই।"[৪০]

১২জন মহিলার একটি প্রতিনিধি দল খাদ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিতে গেলে তিনি ব্যস্ত থাকায় ফুড কমিশনার এ.ডি. খানের সঙ্গে কথা হয়। এ.ডি খান জানান তিনি তো কর্মচারী তিনি কিছু করতে পারবেন না। দাবিপত্র মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেবেন। খাদ্যমন্ত্রী রাইটার্স বিল্ডিং-এ ২২.৯.১৯৫৩ তাং দেখা করার প্রস্তাব দেন।

১৯৫৩ সালের ৫-১০ জুন ডেনমার্কের কোপেনহেগেন-এ বিশ্বনারী সংঘের প্রথম সম্মেলন উপলক্ষে ০৩.০৫.১৯৫৩ তাং ইউনিভার্সিটি ইনসটিটিউট হলে একটি বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায় উপস্থিত বামপন্থী নেত্রীদের মধ্যে ছিলেন রেণু চক্রবর্তী, মণিকুন্তলা সেন, কমলা মুখার্জি, বেলা লাহিড়ী, মুক্তি মিত্র, পঙ্কজ আচার্য, নির্মলা সান্যাল, গীতা মুখার্জি, কল্পনা যোশী প্রমুখ। এছাড়া, বিমল প্রতিভা দেবী, অনিমা মুন্সি, পুষ্পময়ী বসু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সূত্র থেকে জানা যায় যে,বক্তব্যে সকলে শিশুদের উন্নয়ন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে মহিলাদের অগ্রগতির কথা আলোচনা করেন।[৫১]

১৯৫৪ সালের ৩-৪ এপ্রিল কলকাতায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সপ্তম সম্মেলনে আলোচিত ও গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল বেকারীর ভয়াবহতার বিরুদ্ধে নারীর কর্মসংস্থানের আন্দোলন, আইন করে ছাঁটাই বন্ধ, মেয়েদের কারিগরি শিক্ষা, কুটির শিল্পের প্রসার, উপার্জনহীন নারীদের জন্য বেকার ভাতার দাবি, শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ দাবি প্রভৃতি। গীতা মুখার্জী গৃহীত প্রস্তাবগুলি ব্যাখ্যা করেন। মণিকুন্তলা সেন শিশুদের স্বাস্থ্য; শিক্ষা ও ভবিষ্যতকে সুনিশ্চিত করার জন্য নারীর অধিকার গুলি রক্ষার জন্য বিশ্ব শান্তি আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান বলে জানা যায়।[৪২]

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় 'আন্তজার্তিক শিশু দিবস' পালিত হতে থাকে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে। যেমন—১৭.৫.১৯৫৪ তারিখে বজবজে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে 'International Children's Welfare Day' পালিত হয়।[৪৩] আবার ২.৬.১৯৫৪ তারিখে ২৪ পরগণার বজবজ থানার অন্তর্গত সুভাষ ময়দানে বজবজ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে একটি বড় সভা হয়। অণিমা সেনের সভাপতিত্বে গীতা মুখার্জি (সুভাষ মুখার্জির স্ত্রী), জয়া ঘোষ, ড: মনীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে এই সভাতে আন্তর্জাতিক শিশু দিবসের তাৎপর্য ব্যাখা করা হয়। তাঁরা সরকারী নীতির সমালোচনা করেন। কারণ, শিশুদের কল্যাণের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা না গ্রহণ করায় এবং প্রচলিত শিক্ষা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায়। সেজন্য বক্তারা সকলে মহিলাদের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ দেন— যাতে নিজেদের দেশ একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।[৪৪]

৩০.৩.১৯৫৪ তারিখ থেকে ৩১.৩.১৯৫৪ তারিখ পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জেলা সম্মেলন হয়। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা বেলা লাহিড়ির সভানেত্রীত্বে গীতা মুখার্জি (বিশ্বনাথ মুখার্জির স্ত্রী) এবং আশা ঘোষের (মেদিনীপুর

জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা) নেতৃত্বে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা সকলে মহিলাদের জন্য কাজে নার্সিং হোম খোলার দাবি তোলেন। পাশাপাশি জোতদারের দ্বারা বর্গাদারদের উচ্ছেদ করার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কথা বলেন। গীতা মুখার্জি সরকারের কাছ থেকে এইসব দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত জনগণকে লড়াই করার পরামর্শ দেন বলে জানা যায়।[৪৫] পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় ৫.৭.১৯৫৪ তারিখে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মীরা গীতা মুখার্জির নেতৃত্বে এস.ডি.ও -র কাছে একটি ডেপুটেশন দেন। মহিলাদের জন্য কাজ এবং প্রসুতিসদন খোলার দাবি নিয়ে।[৪৬]

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ২৭ এবং ২৮শে মার্চ হুগলী জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন হয় চিনসুরাতে। মণিকুন্তলা সেন, সন্ধ্যা চ্যাটার্জী, মুক্তা কুমার, পারুল রায়চৌধুরী, দক্ষবালা দাসী বক্তব্য রাখেন। বক্তারা সকলে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের সমানাধিকার দাবী করেন। তাঁরা সকলে শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সংঘবদ্ধভাবে মহিলাদের আন্দোলন করার কথা বলেন।[৪৭] বিভিন্ন জায়গায় সমিতির সভা করে মহিলাদের নিজেদের দাবি সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করেন বামপন্থী মহিলারা। ২১.৩.১৯৫৪ তাং ভদ্রেশ্বরের তেলিনিপাড়ায় (মনসাতলা) মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একটি সভায় কনক মুখার্জির সভানেত্রীত্বে ভদ্রেশ্বরের তেলিনিপাড়ায় সুশীলা গুহ রায়, চন্দননগরের সন্ধ্যা চ্যাটার্জী, ভদ্রেশ্বরের গীতা ভট্টাচার্যের (দুর্গা ভট্টাচার্যের স্ত্রী) উপস্থিতিতে এই সভা হয়। ভিক্টোরিয়া এবং গোন্দলপাড়া জুট মিলের মহিলারা বেশি উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। বক্তারা সকলে শ্রমজীবী মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি মহিলাদের সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করার কথা বলেন যাতে শিশুদের শিক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য আরো ভালো ব্যবস্থা পাওয়া যায় মালিকের কাছ থেকে। একইসঙ্গে তাঁরা এ ব্যাপারে সরকারী নীতিরও সমালোচনা করেন বলে জানা যায়।[৪৮]

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে বামপন্থী মহিলারা যে নারী ও শিশুদের উন্নতির জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘরে বাইরে পূর্ণাঙ্গ মাসিক পত্রিকা হিসাবে ১৩৫৯ সালে প্রকাশিত হওয়ার সময় বিশ্ব নারী সংঘের সম্পাদিক ভায়লাঁ কুতরিয়ে-এর (বার্লিন) অভিনন্দন বার্তা থেকেই বোঝা যায়। তিনি বার্তাতে লেখেন “ঘরে বাইরে পত্রিকার প্রকাশনা উপলক্ষে আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারী সংঘের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। শিশুদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবন, নারী জাতির অধিকার রক্ষার জন্য এবং শান্তির জন্য আপনারা যে কাজ করে যাচ্ছেন সে কাজের সাফল্য কামনা করছি।”[৪৯]

নারী ও শিশুর উন্নতি বিধানের জন্য বাংলার নারীরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের নারীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হন। কোপেনহেগেন বিশ্বনারী সম্মেলনের গৃহীত সনদকে বাংলার নারীরাও সমর্থন করেন। কোপেনহেগেন বিশ্বনারী সম্মেলন থেকে ফিরে এসে ১৩৬০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে 'ঘরে বাইরে' তে রেণু চক্রবর্তীর লেখা থেকে তা বোঝা যায়। সনদে নারী ও শিশুদের জন্য যে সমস্ত অধিকারের দাবি তোলা হয় সেগুলি হল— "স্থায়ী কাজের নিশ্চয়তা। যেকোনও কাজ বা সরকারী কাজ করিবার অধিকার। যে কোনও কাজের ক্ষেত্রে পুরুষের সমান সুযোগ। সমান কাজের জন্য সমান মজুরি। সামাজিক জীবনবীমার সমান অধিকার। রাষ্ট্রের দ্বারা মা ও শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার, বেতনসহ প্রসূতি ছুটি, শিল্পাঞ্চলে ও গ্রামে গ্রামে যথেষ্ট সংখ্যক প্রসূতি সদন, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, শিশুদের রক্ষণাগার ও শিশুদের জন্য শিক্ষালয়/শ্রমিক নারীদের মতো কৃষক নারীদের মজুরি, সরকারি ব্যবস্থা এবং মা ও শিশুদের রক্ষার ব্যবস্থার অধিকার। কৃষকনারীদের জমির মালিক হইবার ও সেই জমি ব্যবহার করিবার অধিকার। শিক্ষাও বিশেষত কারিগরি শিক্ষা পাইবার অধিকার। সমস্ত ক্ষেত্রে নির্বাচিত হইবার ও ভোট দিবার অবাধ অধিকার। নারীদের গণতান্ত্রিক সংগঠন করিবার ও তাহাতে কাজ করিবার অধিকার এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনেও কাজ করিবার অধিকার।"

বিশ্বনারী সংঘের পর সারা ভারতের বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্ত করে একটি সর্বভারতীয় সংগঠন করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৪সালের ৪-৭ জুন একটি জাতীয় মহিলা কংগ্রেস বা সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তা থেকে বোঝা যায় সর্বভারতীয় সংগঠনটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল নারী ও শিশুদের উন্নতির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ। যে বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয় সেগুলি হল— " ১) নারীদের জীবিকার প্রশ্ন, ২)কৃষক নারীদের অধিকারের প্রশ্ন,৩) নারীদের অধিকারের আইন প্রবর্তন, ৪) মাতৃমঙ্গল ও প্রসূতি কল্যাণ, ৫) শান্তি ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা" - প্রভৃতি।[৫০]

অনুরূপভাবে ১৯৫৫ সালের ৭-১০ জুলাই সুইজারল্যাণ্ডের সুসান শহরে বিশ্বমাতৃসম্মেলনেও মা ও শিশুদের উন্নতির জন্য নানা দাবী ওঠে। বিশ্বমাতৃসম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল নারী, মা ও শিশু — এই তিন জনের জন্য সুখী ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বর্তমান ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ গঠন। বিশ্বমাতৃসম্মেলন থেকে ফিরে এসে মণিকুন্তলা সেন ১৩৬২ বঙ্গাব্দে 'ঘরে বাইরে' তে লেখেন 'আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন' নামে এক প্রবন্ধ। যা থেকে এই সম্মেলন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায়।[৫১] বিশ্বমাতৃ সম্মেলনের আবেদনে বলা হয় — " শিশুদের বাঁচাও, ওদের সুখী ভবিষ্যৎ

নিশ্চিত কর। আর দেশে দাবি তোল— যুদ্ধ নয়, অশান্তি নয়, ফুলের মতো শিশুদের জন্য উন্মুক্ত হোক নন্দনকানন।" এই আবেদন সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী মহিলারাও যে নারী ও শিশুর উন্নতি বিধানের জন্য নানা কর্মসূচী নেন তা জানা যায়। মণিকুন্তলা সেন সেদিনের কথাতে লেখেন—"আমরা তখন নানাভাবে শিশুকল্যাণের উপায়াদি নিয়ে ব্যস্ত থাকছি আর শিশুরক্ষার জন্য বিশ্বশান্তির কথাটাও প্রাণপণে বলে বেড়াচ্ছি। এই প্রচারের পরেই আমাদের প্রাদেশিক মাতৃ সম্মেলন হল। মাতৃ সম্মেলনে শিশুরাই পেল অগ্রাধিকার। সন্তানসম্ভবা মেয়েদের চাকুরিস্থলে মেটারনিটি ভাতা প্রদান, মেয়েদের জন্য বেশী সংখ্যায় প্রসূতিকেন্দ্র খোলা, হাসপাতালে বেড বাড়ানো ও চাকুরিজীবী মায়েদের বাচ্চাদের জন্য ক্রেশ খোলা—এসবই ছিল আমাদের দাবি। এসব নিয়ে প্রস্তাব নেওয়া ও বক্তৃতা দেওয়াও হল।[৫২] তাছাড়া জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মহিলা ডাক্তাররা বক্তৃতা করেন। 'ঘরে বাইরে' পত্রিকাতে শিশু পালন ও শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ডাঃ রেণুকা রায়, ডাঃ জ্যোৎস্না মজুমদার ও অন্যান্য ডাক্তারদের লেখনী দিয়ে মহিলাদের সচেতন করার প্রয়াস চলে। যদিও বামপন্থী মহিলাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে এই সমস্ত কর্মসূচী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বদের অপছন্দের ছিল তবুও মহিলারা কাজ করে যান বলে মণিকুন্তলা সেন তাঁর গ্রন্থ 'সেদিনের কথা'তে লিখেছেন।[৫৩]

১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল থেকে ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত চীনের পিকিং শহরে বিশ্বনারী সঙ্ঘের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিশ্বনারী সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দসহ ৪৮টি দেশের বিভিন্ন সংগঠন ও সঙ্ঘের ১৮৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। 'ঘরে বাইরে' তে প্রকাশিত বিশ্বনারী সঙ্ঘের কাউন্সিল অধিবেশনের বিবরণ থেকে জানা যায় কাউন্সিল সভার কাছে দুটি বিবরণী উপস্থিত করা হয়েছিল। একটি হল— "নারীর অধিকার রক্ষা এবং শিশুদের সুখী জীবন গড়িয়া তোলার জন্য দেশে বিশ্বনারী সঙ্ঘের প্রভাব বিস্তারের দায়িত্ব"। অপরটি হল — "এশিয়া ও আফ্রিকার মেয়েদের আকাঙ্ক্ষিত কার্য্য।" এই সভায় বিশ্বনারী সঙ্ঘের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনের কথা তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন দেশের মহিলাদের বক্তৃতায় নিজ নিজ দেশের আন্দোলনের কাহিনী বিবৃত হয়। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল— শান্তির জন্য ঐক্য, নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষা, ইত্যাদি। বক্তৃতায় প্রকাশ পায় যে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনেক সংগঠন আজ নারীর অধিকার রক্ষা, শিশুর সুখী ভবিষ্যৎ ও শান্তির জন্য ঐক্য ও সহযোগিতার কথা উপলব্ধি করতে পেরেছে। কাউন্সিল সভায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মেয়েদের ভিতর প্রতিনিধি বিনিময় এবং যোগাযোগ স্থাপনের উপরও জোর দেওয়া হয়।

এতে একই জীবিকার একই সমস্যার সম্মুখীন মেয়েদের ভিতর ঐক্য স্থাপিত হবে।[৫৪]

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলনের পর সমিতির উদ্যোগে যে সমস্ত কর্মসূচী নেওয়া হয় তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নারীর কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও আইনগত অধিকারগুলির জন্য আন্দোলন সংগঠিত করা, মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল, সরকারী ও বেসরকারী সহযোগিতায় কুটির শিল্প কেন্দ্র সংগঠিত করা ও পরিচালিত করা ইত্যাদি। তাই, দেখা যায় ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ৮ ও ৯ই অক্টোবর হাওড়া জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলনে যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে নারী ও শিশুদের উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব ছিল উল্লেখযোগ্য। পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, মহিলা ও শিশুদের জন্য প্রস্তাবগুলি ছিল এইরকম— “.....v) Women unemployment – A Learning unemployment of rural women folk was discussed and it was urged upon the Govt. for establishment of various cottage industries to ameriorate the conditions of Women.

vi) Adult Women education and child welfare – Necessity of Adult Women Education was stressed. They are the mothers and would be mothers who are to impart the first training to the children of the country. Regarding child welfare it was stated that this matter is most neglected in this country is comparison with other foreign countries. Govt. was urged upon to look into the matter immediately.

vii) Maternity– In sufficiency of matternity homes, hospitals etc. was discussed. Particularly in rural areas there is no proper arrangement for maternity homes. Govt. should be moved for establishment of a good number of maternity women and hospitals in every locality."[৫৫]

১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির চন্দননগরে অনুষ্ঠিত অষ্টম সম্মেলনেও নারী ও শিশুকল্যাণের জন্য নানারকম প্রস্তাব আলোচনা ও গৃহীত হয়। নারীর জীবিকা সংস্থান ও শিক্ষা, মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গলে ইত্যাদি দাবি গ্রহণ করা হয়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অষ্টম সম্মেলনের পর বিশেষ উৎসাহ সহকারে নানা জায়গায় নারী ও শিশুদিবস পালন করা যেমন— ১৯৫৬ সালের ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সিঁথি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে একটি বৈঠক সভা হয়। বৈঠকে নারী-দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ, আমাদের দেশের মেয়েদের সামাজিক অধিকার আর অধিকারের আন্দোলন, মহিলাদের জীবিকা ও জীবিকার আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোচনা হয় বলে জানা যায়।[৫৬]

১৯৫৬ সালের ১৭ই জুন বিধান পল্লী (গড়িয়া)মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শিশুদিবস পালন করা হয় বলে জানা যায়। সকালে ৩০০ শত শিশুর একটি শোভাযাত্রা পল্লী প্রদক্ষিণ করে স্কুল মাঠে জমায়েত হয় এবং সেখানে একটি খেলার প্রতিযোগিতা করানোর পর তাদের মধ্যে বিস্কুট ও লজেন্স বিতরণ করা হয়। বিকালে স্কুল প্রাঙ্গণে শিশু ও মায়েদের একটি সমাবেশ হয় এবং সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীযুক্তা স্নেহলতা হুই। ২৫০ শিশু, ১০০শত মহিলা এবং পল্লীর বিশিষ্ট কিছু ভদ্রলোক উপস্থিত থাকেন। প্রধান অতিথি ডাঃ সুনীল রায়,অবসর প্রাপ্ত হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী মহাশয় এবং মহিলা ফেডারেশনের শ্রী বাণী দাশগুপ্তা উপস্থিত থাকেন। শিশুদের ড্রিল, নাচ, গান ও আবৃত্তি করান হয়। ডাঃ সুনীল রায় শিশুদের স্বাস্থ্য ও খাদ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় খেলাধূলা ও আবৃত্তির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করেন। এরপর শিশুদের মধ্যে এবং যাঁরা এই উৎসবে বিশেষ সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যেও একটি শিশুদের সংগঠন গড়ে তোলার উৎসাহ দেখা দেয়।[৫৭]

নারী ও শিশু কল্যাণের পাশাপাশি মহিলারা এই সময় বন্যার রিলিফের কাজেও নিজেদের নিয়োজিত করেন বলে জানা যায়। ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ কমিটি মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার মানুষদের সাহায্যার্থে কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৯৫৬ সালের ১৬ই জুন থেকে ২৪শে জুন পর্যন্ত এক সপ্তাহ রিলিফ সংগ্রহ অভিযান সপ্তাহ হিসাবে পালন করার জন্য আবেদন জানায়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এই আবেদনে সাড়া দিয়ে কলকাতায় দেড় মন চাল, ২০০শত ধুতি শাড়ি ও ৪৪টাকা সংগ্রহ করে পিপলস্ রিলিফ কমিটির হাতে দান করে বলে তথ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ বন্যার্ত মহিলা ও অন্যান্যদের পাশে ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে ও সাহায্য প্রেরণ করে।[৫৮] ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নবম সম্মেলনে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয় ক্রেশ বা শিশু রক্ষণাগারের উপর। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির দশম সম্মেলনের সময় সমিতির পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে ২০টি কর্মক্ষেত্র ও ২২টি শিশু ও বয়স্ক বিদ্যালয় চলছিল বলে জানা যায়।[৫৯] দশম সম্মেলনের সম্পাদকীয় রিপোর্ট থেকে জানা যায় বিগত দুই বৎসরের মধ্যে সমিতির কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নারীর অধিকারের আন্দোলন। এই সম্মেলন থেকেই সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৬১ সালের ৮ই মার্চ বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের সময় মহিলা ফেডারেশনের নেতৃত্বে কয়েকদফা দাবিপত্র নিয়ে মহিলাদের

একটি মিছিল বিধানসভায় যাবে। দাবিগুলি মূলতঃ ছিল মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ১৯৬৭সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ১লা অক্টোবর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির দ্বাদশ সম্মেলনে যে ১১টি প্রস্তাব গৃহীত হয় তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নারীর শিক্ষা, মাতৃমঙ্গল, নারীর সমানাধিকার ইত্যাদি।

১৯৬৭ সালের পর থেকে মহিলাদের স্বাভাবিক কর্মসূচী কিছুটা ব্যাহত হয়। রাষ্ট্রপতি শাসন, মহিলা সমিতির মধ্যে ভাঙ্গন এবং শেষপর্যন্ত সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় সমিতির কর্মসূচী গ্রহণ ও তা কার্যকর করার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয়। তাই, দেখা যায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি যে দৃঢ়তার সঙ্গে নারী ও শিশুদের উন্নতির জন্য আন্দোলন করেন এই পর্বে নানা কারণে তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে, সীমিত আকারে এই বিষয়ে কিছু কিছু দাবি উত্থাপন করা হয়। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ২০-২২ এপ্রিল ২৪পরগণা জেলার মধ্যমগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির চতুর্দশ সম্মেলনে যে সমস্ত দাবি উঠেছিল তারমধ্যে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও সমান অধিকারের দাবিও স্থান পেয়েছিল। ১৯৭৪ খ্রি. ১১-১২ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি খাদ্যের দাবিতে অবস্থান করে একটি দাবিপত্র প্রকাশ করে। এই দাবিপত্রে নারীদের চাকরির সমানাধিকার, সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার দাবি তোলা হয়। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পঞ্চদশ সম্মেলনেও নারীর সমান অধিকারের দাবি ওঠে।

এইভাবে দেখা যায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জন্মলগ্ন থেকেই বামপন্থী মহিলারা মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সম্মেলনে এই বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সরকারের কাছে দাবি উত্থাপন করেন মহিলারা। শুধু দেশের মধ্যে এই আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ না রেখে আন্তর্জাতিক স্তরেও এই আন্দোলনকে যুক্ত করেন।

মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ:

বামপন্থী মহিলা কর্মীদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করার জন্য প্রথম থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই শিক্ষাদানের ফলে যে সমস্ত নেতৃত্ব তৈরি হতে থাকেন তাঁরা আবার সাধারণ মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে মহিলা নেত্রী ও কর্মীদের কাজকর্মে অগ্রগতির জন্য ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ মদন দত্ত লেনের একটি ভাড়া বাড়িতে একটি প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবির হয়। এই স্কুলে মোট ২৮জন শিক্ষার্থী যোগ দেন।

শিক্ষা শিবিরে যে সমস্ত বিষয়ের উপর ক্লাস হত সেগুলি হল ১) পার্টি সংগঠন, ২) যুদ্ধের বিভিন্ন স্তর, ৩) জাতীয় সংকট ও ঐক্য আন্দোলন, ৪) নারী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী, ৫) মহিলা ফ্রন্টের সাথে বিভিন্ন ফ্রন্টের সম্বন্ধ, ৬) ছাত্র ও ছাত্রী আন্দোলন ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণকারী মহিলা নেত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—দিনাজপুরের বীণা গুহ, ঢাকার হিরন্ময়ী রায়, বরিশালের মনোরমা বসু, কলকাতার কনক মুখার্জি, সিলেটের হেনা দত্ত, খুলনার চারুলতা ঘোষ প্রমুখ। জানা যায়, বামপন্থী মহিলাকর্মীদের জন্য রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির এই প্রথম।[৬০]তারপর জেলায় জেলায় মহিলা শিক্ষা শিবির শুরু হয়ে যায়। যেমন ৭-১১ই জুন ১৯৪৩ সিলেটে মহিলা শিক্ষা শিবির। উপস্থিত নেত্রীদের মধ্যে ছিলেন অপর্ণা পালচৌধুরী, অসিতা পালচৌধুরী, শশী দেবী। ১৯৪৩ সালে ১৬-১৯শে জুন হুগলী জেলায় শিক্ষা শিবির হয়। শিক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মুক্তাকুমার, পুষ্প ঘোষ, সন্ধ্যা চ্যাটার্জী প্রমুখ।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হওয়ার পর তা প্রসারিত করার ক্ষেত্রে কর্মীর অভাব না থাকলেও অভাব ছিল কর্মীদের মধ্যে শিক্ষার। তাই, এই অভাব দূর করার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও যে উদ্যোগী হয় তা জানা যায় নিখিলবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা এলা রীড কর্তৃক প্রকাশিত এক বুলেটিন থেকে। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে এটি প্রকাশিত হয়। বুলেটিনে লেখা হয়—"গ্রামে সমিতি গঠন করতে গিয়ে একটা বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়। সেটা হচ্ছে— বেশীর ভাগ জায়গায় সমিতিতে উৎসাহী কর্মী বেশ পাওয়া যায় কিন্তু তারা আক্ষরিক শিক্ষার অভাবে অনেক সময়েই উপযুক্ত পরিচালক হতে পারেন না। দেশে আমাদের যা শিক্ষার হার তাতে এ অসুবিধা আসবেই। কিন্তু একে দূর করার কিছুটা উপায় আমাদেরই করে নিতে হবে। তাই, অন্ততঃ পরিচালন-ক্ষমতাশীল সভ্যদের আক্ষরিক শিক্ষা দেবার জন্য স্কুল করা দরকার।"[৬১]

তেভাগা আন্দোলনের সময় মহিলাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ক্লাস হত। কৃষক নেতা মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুলের লেখা থেকেও এই তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর কথায় 'প্রতিদিন তিনটে থেকে চারটে ক্লাস হত। সকালে বয়স্কদের ক্লাস। দুপুরের পর মেয়েদের ক্লাস। খাওয়া দাওয়া সেরে একটু গোপনে এসে তারা ক্লাস করত। প্রায়-তিনঘন্টা ধরে ক্লাস হত।'[৬২]

স্বাধীনতার পর মহিলাদের সামাজিক উন্নতির জন্য বজবজে গীতা মুখার্জির নেতৃত্বে একটি বিদ্যালয় খোলা হয়। শ্রমিকদের স্ত্রী এবং তাঁদের মেয়েদের যাঁদের মধ্যে প্রায় ১০০ শতাংশ

নিরক্ষর তাদের শিক্ষিত করার জন্য। পাশাপাশি কাজের পর শ্রমজীবী মহিলারা যাতে পাঠ নিতে পারেন সেজন্য বিকেলে পাঠদানের জন্য আরো একটি বিদ্যালয় খোলা হয়।[৬৩]

স্কুল প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি মহিলা ফ্রন্টকে শক্তিশালী করার জন্য নতুন জেলা কমিটিগুলিতে মহিলা নেত্রীদের দায়িত্ব বন্টন করা হয়। যেমন ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটিতে দায়িত্ব দেওয়া হয় বেলা লাহিড়ী এবং বজবজের গীতা মুখার্জীকে (সুভাষ মুখার্জীর স্ত্রী)। এই দায়িত্ব পাওয়ার ফলে মহিলারা আরো উদ্যমী হয়ে কাজ করেন বলে জানা যায়। তাই, দেখা যায় গীতা মুখার্জির উদ্যোগে শহীদ প্রতিভা পাঠশালা নামে একটি প্রাথমিক স্কুল গড়ে ওঠে — যা পরিচালনার দায়িত্ব ছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির। বনজনহরিয়া, বজবজেও এর শাখা গড়ে ওঠে। প্রতিভা পাঠশালায় শিক্ষার্থী সংখ্যা চিল ১৩৭জন। গীতা মুখার্জীর নেতৃত্বে স্কুল চালানোর জন্য দরজায় দরজায় চাঁদা আদায় করার সিদ্ধান্ত হয় এবং গীতা মুখার্জীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়।[৬৪]

শিক্ষাদানের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচীগুলিকে সাধারণ মহিলাদের মধ্যে সহজ সরলভাবে উপস্থাপিত করা ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মহিলা কর্মীদের নিয়ে কয়েকটি স্থানে শিক্ষা শিবির করার কথা জানা যায়। যেমন- ১৯৫৩ সালের ৫ ও ৬ই নভেম্বর হাওড়া জেলার কানাইপুর গ্রামে বাগনান মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মীদের একটি শিক্ষাশিবির হয়। শিক্ষিকা হিসাবে বামপন্থী মহিলা নেত্রী রেণু চক্রবর্তী, বেলা লাহিড়ী, গীতা মুখার্জী ও পঙ্কজ আচার্যের কথা জানা যায়। ১৫জন কর্মী এই শিক্ষাকেন্দ্রের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন। জানা যায় কর্মীরা বেশীর ভাগই ছিলেন অল্পবয়স্কা। ৭/৮ মাইল দূর থেকে শিক্ষার্থীরা আসেন। 'ঘরে-বাইরে' থেকে শিক্ষাশিবিরের বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ''শিক্ষাকেন্দ্রে আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলি নিম্নরূপ:

১) ডেনমার্ক বিশ্বনারী সম্মেলন ও সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের মহিলাদের অবস্থা, সোভিয়েত ও চীনের মেয়েরা নিজেদের সমস্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দেশকে পুনর্গঠনের পথে কি বিপুল সাহায্য করে নারী জগতের নিকট আদর্শ স্থানীয় হয়েছেন, সে সব কথা উৎসাহভরে মেয়েরা শোনেন। অতি বিস্তৃতভাবে এই দুটি দেশের মেয়েদের অবস্থা আলোচনা করেন রেণু চক্রবর্তী, আমাদের সমিতির সম্পাদিকা।

২) 'বিশ্বনারী সংঘ' বিষয়টি দ্বিতীয় আলোচনা ক্ষেত্রে আলোচিত হয়। গীতা মুখার্জী বর্ণনা করেন বিশ্বনারী সংঘের জন্মের ইতিহাস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মেয়েদের আন্দোলনের কাহিনী,

বিশেষ করে ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক দেশসমূহের মহিলা আন্দোলন ও বিশ্বের মহিলা আন্দোলনে বিশ্বনারী সংঘের সঠিক ও নির্ভূল নেতৃত্বের বিবরণী অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেন।

৩) ভারতের মহিলা আন্দোলন বিশেষ করে বাংলাদেশের মহিলা আন্দোলনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দীর্ঘ ১০ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করেন পঙ্কজ আচার্য্য। দিল্লীতে নিখিল ভারত মহিলা প্রস্তুতি সম্মেলন (ডেনমার্ক) ও পরবর্তীকালে বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও জাতীয় ভিত্তিতে মহিলা সংযোগ রক্ষাকারী কমিটির নেতৃত্ব ও ঐক্যবদ্ধ মহিলা আন্দোলনের স্বরূপ ও আমাদের কর্তব্য আলোচিত হয়।"[৬৫]

অনুরূপভাবে ১৯৫৩সালের ৯ই ও ১০ই নভেম্বর গীতা মুখার্জী ও পঙ্কজ আচার্যের নেতৃত্বে তমলুকে একটি শিক্ষাশিবির হয়। জানা যায় তমলুকের শিক্ষাকেন্দ্রে ২৬জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এই ২৬জনের মধ্যে ৬ জন ছিলেন কৃষক পরিবারের মহিলা। অন্যান্যরা বিভিন্ন শ্রেণী থেকে আসেন। জানা যায় অনুরূপ আরো একটি শিক্ষাশিবির মাতঙ্গিনী হাজরার জন্মস্থান তমলুকে হয়। এই শিক্ষা শিবিরে কংগ্রেসী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ৫০/৬০ বৎসরের বৃদ্ধা মায়েরা এসেছিলেন বলে জানা যায়। সংখ্যায় এঁরা ৬জন ছিলেন। নিজেদের আদর্শকে সফল করে তুলতে তাঁরা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে সংগঠিত করতে চান। সেজন্য শিক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণকারী এক শিক্ষার্থী বলেন "দ্যাখ আমাদের আন্দোলনের জোর কতখানি, সমস্ত দেশের মেয়েদের সমর্থন আমাদের স্বপক্ষে।"[৬৬]

মহিলাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা, শিক্ষা শিবির করার পাশাপাশি বিভিন্ন সম্মেলনে শিক্ষা সংক্রান্ত নানা প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। এরই সঙ্গে সরকারের কাছে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য নানা দাবিও উত্থাপন করেন মহিলারা। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রবর্তনের দাবি তোলা হয়। ১৯৫২খ্রিষ্টাব্দে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ষষ্ঠ সম্মেলনে স্ত্রীশিক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির দশম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঐ বছরই ৮ই মার্চ বিধানসভা অভিযান হয় যে সব দাবি নিয়ে সেগুলি হল-

টেকনিক্যাল, নার্সিং শিক্ষিকা-শিক্ষণ, বৃত্তিশিক্ষা এবং বাধ্যতামূলক অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

সারাভারত মহিলা ফেডারেশনের আহ্বানে ১৯৬১ সালের ২০শে আগস্ট কলকাতায়

মহিলা ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখা স্ত্রী শিক্ষা প্রসার দাবী দিবস পালন করে। ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট ব্যয়বরাদ্দের অন্ততঃ শতকরা ১০ভাগ স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য নির্দিষ্ট রাখার দাবী করা হয়। সভায় অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা নির্মলা সিংহ ও শ্রীযুক্তা মণিকুন্তলা সেন বক্তব্য রাখেন।[৬৭] ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির দ্বাদশ সম্মেলনে নারীর শিক্ষা নিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

এইভাবে স্কুল প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা শিবির করা, সংগঠনে বিভিন্ন সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা কার্যকর করার জন্য সরকারের উপর চাপ দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ মহিলাদের শিক্ষিত করা এবং রাজনৈতিকভাবে তাদের সচেতন করার চেষ্টা করেন মহিলারা।

পণপ্রথা ও হিন্দু কোড বিল এবং বামপন্থী মহিলারা:

মহিলাদের সামাজিক বিভিন্ন শোষণের বিরোধিতা ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বামপন্থী মহিলারা বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন বলে জানা যায়। পণপ্রথা, উত্তরাধিকারে অসাম্য, বিবাহ সংক্রান্ত নানারকম গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সমাজের চিন্তাশীল, প্রগতিশীল মানুষদের সঙ্গে বামপন্থী মহিলারা যুক্ত হন।

মহিলাদের অধিকার সংক্রান্ত যে বিলটি পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয় তা হল 'হিন্দু কোড বিল'। এই বিলের বিশেষ দিকগুলি ছিল মেয়েদের বিয়ের বয়সসীমা বাড়িয়ে দেওয়া, শিশুবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করা, অসবর্ণ বিবাহকে হিন্দু-বিবাহবিধিতে পূর্ণমর্যাদা দেওয়া এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট কারণ থাকলে মেয়েদের বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকার করা, ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের সমানাধিকারের ভিত্তিতে পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অংশীদারত্ব ইত্যাদি।[৬৮]

হিন্দু কোড বিল পার্লামেন্টে উত্থাপনের পর বিলটিকে সমর্থনের জন্য সমস্ত রাজ্যের আইনসভাগুলিতে পাঠানো হয়। বামপন্থী মহিলা সাংসদ রেণু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে এই বিলের সমর্থনে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। জানা যায় ছোটো বড়ো সভা করা, ঘরোয়া আলোচনা করা এবং এই বিলের সমর্থনে নারী-পুরুষের স্বাক্ষর তুলে আইনসভা মারফৎ কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়। 'ঘরে বাইরে' থেকে জানা যায় এই বিলের সমর্থনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে মেদিনীপুর, চন্দননগর, ইছাপুর ও কলকাতায় কতকগুলো মহিলা সভা হয়। তমলুকে ২৫১ টি স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়।[৬৯] রেণু চক্রবর্তী লিখেছেন—"কম্যুনিস্ট মেয়ে কর্মীরা যেতে লাগল তাই গ্রামে, গঞ্জে, শহরের বস্তি এলাকায়, নিম্নবিত্ত এলাকায়—সর্বত্র তারা বোঝাতে লাগল হিন্দু

কোড বিলের তাৎপর্য এবং কি করে এতে খানিকটা তাদের বন্ধনমুক্তির সহায়তা হবে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি চলে গেল একেবারে গ্রামের অভ্যন্তরে। প্রতিটি জেলায় গেল তারা হিন্দু কোড্ বিলের সপক্ষে প্রচারের কাজে।"[৭০]

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ৪-৭ জুন কলকাতায় সারা ভারত মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই সর্বভারতীয় সম্মেলনে নারীদের সামাজিক অধিকারের প্রশ্নে পার্লামেন্টে উত্থাপিত দুটি বিল-বিশেষ বিবাহ বিল ও বিবাহ বিচ্ছেদ বিলের উপর দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পণপ্রথা করার জন্য আলাদা আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৭১]

কৃষ্ণনগর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে কৃষ্ণনগর টাউন হলে ১৯.৮.১৯৫৪তারিখে প্রায় ২০০জন মহিলাকে নিয়ে একটি সভা হয়। কৃষ্ণনগরের সরোজ নলিনী ঘোষের সভাপতিত্বে কৃষ্ণনগরে সি.পি.আই সদস্যা অপর্ণা ভট্টাচার্য, সি.পি.আই. দলের বিধায়ক মণিকুন্তলা সেনের উপস্থিতিতে এই সভা হয়। হিন্দু কোড বিলের সমর্থনে এবং মানুষকে এই বিলের প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর জন্য এই সভা হয়।[৭২]

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তমলুকের কাজের রিপোর্ট দিতে গিয়ে মহিলা নেত্রী নির্মলা সান্যাল প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা বেলা লাহিড়ীকে একটি চিঠি দেন যা পুলিশ ফাইলে পাওয়া গেছে। এই চিঠিতে তিনি লেখেন—"কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মহিলা কংগ্রেসের পরে তমলুক মহকুমায় বিভিন্ন অঞ্চলে মহিলা মিটিং হয় কংগ্রেস সম্বন্ধে ও হিন্দু বিবাহ বিল, বিশেষ বিবাহ বিল ও পণপ্রথা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়। মেয়েরা খুব উৎসাহ ভরে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং সই তুলিবার ভার নেন। ১টা পুরুষ যে সদৃচ্ছা বিবাহ করিতে এবং স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে তার বেশ উদাহরণ চোখের সামনে রয়েছে। যেমন - আমাদের ১টা কর্মী মেয়ে শচী দেবী তাকে স্বামী নেয় না। ১টা এক বছরের ছেলে নিয়ে বাপ মায়ের কাছে আছে। বাপ মা মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে আকুল হন। শচীর মা আমাকে বলেছেন দুঃখ ভরে, বলুনত আপনি এই মেয়েকে নিয়ে আমি কি করি এর ভবিষ্যৎ ত কিছু নেই। আমার অবস্থাও এমন নয় যে, এর ভরণ পোষণ করতে পারি। আমাদের সংসারে যা আয় তাতেই আমাদের চলে না। তারই বাড়ীর পাশের তাদের আত্মীয়দের আর একটা মেয়ে কমলা তাকেও স্বামী নেয় না। সেও বৃদ্ধ মাতার অপরিসীম বোঝা। কমলার আর একটা বিবাহযোগ্যা ছোট বোন আছে কিন্তু পণপ্রথা এমন অবস্থা করে রেখেছে যে বিবাহ দেওয়া গরীব পরিবারে কি অমানুষিক কষ্ট তা তিনি উপলব্ধি করেন। আর কেঁদে বলেন এর কি বিহিত হবে না? এরূপ কত দৃষ্টান্ত চোখের ওপর আছে। আরও একটা মেয়ে

তাকে স্বামী যে শুধু নেয় না তাই নয়— তার ছেলেটাকেও পিতৃত্বের দাবিতে মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এমনি কত দৃষ্টান্ত সমাজের বুকে রয়েছে। এই বুকে চাপান ভারী যাঁতাটা যাতে আলগা হয়ে যায়— মেয়েরা যাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে তার জন্যই মেয়েরা সাগ্রহে বিলে সই দিচ্ছেন। গ্রামে ৫টা বৈঠক আমি করেছি তাতে প্রত্যেক বৈঠকে ১৩জন মহিলা থেকে ২১জন করে মেয়েরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সকলেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। নিজেরা সই দিয়েছেন। সংগঠনকে বাড়াতে হবে এর গুরু দায়িত্ব উপলব্ধি করেছেন। বাঁচার তাগিদে শহরের মেয়ে কর্মীরা সই তুলেছেন কোন বাধা বা প্রতিবাদের সম্মুখীন হন নি। সহি সংগ্রহের কাজ চলছে।"[৭৩]

২৬. ৮.১৯৫৪ তারিখে বউবাজার পোস্টঅফিসে পুলিশের হাতে একটি চিঠি আসে। চিঠিটি লেখেন জাতীয় মহিলা ফেডারেশনের পক্ষে অনুসূয়া জ্ঞানচাঁদ এবং হাজরা বেগম। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা বেলা লাহিড়ীকে এই চিঠিটি তাঁরা লেখেন ২৪.৮.১৯৫৪ তারিখে। চিঠিতে তাঁরা বেলা লাহিড়ীকে ম্যারেজ বিল-এ আরো স্বাক্ষর পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, তেত্রিশ হাজার স্বাক্ষর তাঁরা পেয়েছেন বাংলা থেকে। আরো বাংলা থেকে স্বাক্ষর পাঠাতে বলেন। ১লা সেপ্টেম্বর তাঁরা পার্লামেন্ট অভিযান করবেন। তাই, বেলা লাহিড়ীকে অনুরোধ করেন যাতে বাংলা থেকে এই পার্লামেন্ট অভিযানে কোন প্রতিনিধি যান।[৭৪]

১৯৫৬খ্রিষ্টাব্দে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির চন্দননগরে অনুষ্ঠিত অষ্টম সম্মেলনে প্রাদেশিক সম্পাদিকা বেলা লাহিড়ীর পেশ করা রিপোর্ট থেকে জানা যায় "... গত দুই বৎসরে হিন্দু বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ বিল বিশেষ বিবাহ বিল ও উত্তরাধিকার বিলগুলিকে আসনে পরিণত করার জন্য সমিতি ব্যাপকভাবে আন্দোলন করে।"[৭৫] 'ঘরে বাইরে' তে অষ্টম সম্মেলন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে নিবেদিতা নাগ লেখেন যে, সভাকক্ষটি সুন্দর করে সাজানো হয়। সুন্দর ছবি এঁকে যেগুলি লেখা হয় তা হল— "পণপ্রথার অবশ্যম্ভাবী ফল", "নারীর গৌরব মাতৃত্ব সুস্থ সন্তানের জননী হবার মত মেয়েদের দিকে রাষ্ট্রের নজর কত?" "সম্পত্তির অধিকার থেকে মেয়েরা বঞ্চিত, ভিক্ষাবৃত্তি, দাসীবৃত্তি ছাড়া পথ নেই।" "আজকের সমাজব্যবস্থায় সংসার প্রতিপালনের ক্ষেত্রে পুরুষের দায়িত্ব উপার্জনের, নারীর দায়িত্ব গৃহস্থালী ব্যবস্থার, সন্তান পালনের ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার কিন্তু পুরুষের অধিকার কর্তৃত্বে, নারীর অধিকার অনুসরণে— দায়িত্ব বেশি, অধিকার নাই তাই সংসারে আর সমাজে নারীর জীবনে অভাব ঘটে শান্তির।"এই লেখাগুলি থেকেই বোঝা

যায় বংশানুক্রমিকভাবে অর্জিত কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা, ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রভৃতি অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা দূর করার জন্য মহিলাদের সচেতন করার প্রয়াস চলে সম্মেলনে।

মহিলা নেত্রীরা হিন্দু কোড বিল নিয়ে সাধারণ মহিলাদের বোঝানোর জন্য নিজেরা এই বিল সম্পর্কে ভালোভাবে জানার চেষ্টা করেন। প্রখ্যাত আইনজ্ঞ অতুল গুপ্ত মহাশয়ের কাছে বামপন্থী মহিলারা গিয়ে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন বলে মণিকুন্তলা সেনের লেখা থেকে জানা যায়।[৭৬] ১৯৫৬ সালের ১৬ই-২১শে জানুয়ারি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, মাদুরা কংগ্রেসের পরবর্তী সময় থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মহিলাদের মধ্যে একটি বড় আন্দোলন হয়— তা হল কোড বিলের সমর্থনে। বাংলাদেশের বিভিন্ন মহিলা সমিতির সংযুক্ত নেতৃত্বে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। হিন্দু কোড বিলের সমর্থনে সারা ভারতে ৪৫,০০০ স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়, তারমধ্যে পশ্চিমবাংলার মহিলারা ৩৫,০০০ সই সংগ্রহ করেন।[৭৭] জানা যায়,হিন্দু কোড বিলের সমর্থনে এইসমস্ত কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে অনেকেই এই বিলের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন। হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেসের মধ্যে রক্ষণশীল ও গোঁড়াপন্থীরা এই বিলের বিরোধিতা করেন।[৭৮] পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা হিন্দু কোড বিলের সমর্থনে প্রচারমূলক কর্মসূচীর সমাপ্তির উদ্দেশ্যে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে একটি জনসভার আয়োজন করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সরোজিনী নাইডু আর সভানেত্রী ছিলেন প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। জানা যায় এই সভায় হিন্দু মহাসভা পাথুরেঘাটা থেকে ২টাকা করে দিয়ে ভাড়া করে মহিলাদের নিয়ে আসে। উদ্দেশ্য ছিল সভাটিকে ভঙ্গ করা। তাদের সেই উদ্দেশ্য সার্থক হলেও স্বাক্ষরের কাজ থেমে থাকে নি।[৭৯] পাশাপাশি হিন্দু কোড বিলের সমর্থনে মহিলাদের গণ দরখাস্ত লোকসভায় সিলেক্ট কমিটির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে এবং বাইরেও প্রতিক্রিয়াশীল অংশের বিরোধী প্রচারের প্রভাব অনেকটা স্তিমিত করে।

বামপন্থী মহিলা নেত্রী পঙ্কজ আচার্য তাঁর 'নির্বাচিত রচনা'-তে লিখেছেন — "বিশেষ বিবাহ আইন ১৯৫৪ ও হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫ সালে ভারতীয় পার্লামেন্টে যখন পাশ করা হয় তখন হিন্দু মহাসভার নেতাগণ, হিন্দু সমাজের কায়েমী স্বার্থের বাহকেরা তীব্রভাবে এই আইন পাশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। তখন বিভিন্ন রাজ্যের মহিলারা এই বিলগুলিকে পাশ করানোর জন্য হাজার হাজার সই সংগ্রহ করে পার্লামেন্টের নিকট জমা দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তদানীন্তন নিখিলবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে প্রায় অর্ধ লক্ষ সই সংগ্রহ করে পার্লামেন্টের নিকট জমা দেওয়া হল।"[৮০]

দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে বিশেষ বিবাহ আইন (১৯৫৬), হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৬) ও পতিতা ব্যবসা নিরোধ আইন (১৯৫৬) পাশ হয়।[৮১]

ভারতীয় সমাজজীবনে একটি ঘৃণ্যতম প্রথা হল পণপ্রথা। বর্তমানেও এই কুপ্রথাটি সমাজজীবনকে দূষিত করে তুলেছে। যৌতুক না দিতে পারায় পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অনেক বিবাহিত নারীর জীবন বিপন্ন হয়, বহু মেয়ে আত্মহত্যা করে এবং অনেকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন দ্বারা নিহত হয়। এই প্রথার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা আন্দোলন করেন বলে জানা যায়।

মণিকুন্তলা সেন তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন— "এই আইন নিয়ে আলোচনা চলার সময়ে আমরা এর সপক্ষে বহু প্রচারসভা, স্বাক্ষর সংগ্রহ এবং মেয়েদের নিয়ে ঘরোয়া সভা করেছিলাম। তাতে দেখা গিয়েছিল— শহরে ও গ্রামে গরিব গৃহিনীরা, এমনকি কৃষক পরিবারের অনেক মায়েরাও এর বিপক্ষে কথা বলতেন। কারণটা ছিল মূলত ভয়। পণছাড়া যখন মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না তখন আইনের পক্ষে স্বাক্ষর দিয়ে কী হবে?[৮২]

'ঘরে বাইরে' - তে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, ১৯৫৪ সালে রেণু চক্রবর্তীর নামে পণপ্রথা নিরোধ বিল লোকসভায় উত্থাপিত হয়। রেণু চক্রবর্তী "লোকসভার এবারের অধিবেশনে" শীর্ষক প্রবন্ধে 'ঘরে বাইরে' তে লিখেছেন " এই পার্লামেন্ট অধিবেশনে সদস্যরা যে সকল বিল উত্থাপন করেছেন তার মধ্যে চারটি বিল শিশু ও নারী সংক্রান্ত। আমি পণপ্রথা নিরোধ বিলটি উত্থাপন করি। বিলটির উদ্দেশ্য হল ক) মেয়েদের আর্থিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত করা, খ) মেয়ের বিবাহ দেওয়ায় মা বাপের নিদারুণ কষ্ট নিবারণ করা, গ) বিবাহে সমতা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা, ঘ) উভয় পক্ষের মনুষ্যত্বকে অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করা।

এই বিলটিতে পণ নেওয়ার অপরাধে এক বৎসর বিনাশ্রমে কারাদণ্ড অথবা পণের পরিমাণ জরিমানা অথবা দুইই সাজা দেওয়ার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। যারা পণ দেয় অথবা পণ দেওয়ায় সাহায্য করে তাদের তিনমাসের বিনাশ্রমে কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা অবধি জরিমানার কথা বলা হয়েছে। বিবাহের তিনবছরের মধ্যে মেয়ের মা বাপ বা অভিভাবকের কাছ থেকে যদি কোন প্রকারের পণ নেওয়ার চেষ্টা হয় তাও অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই আইন পাশ হবার আগে বা পরে যে সম্পত্তি বা অর্থ পণ হিসাবে দেওয়া হবে তা স্ত্রীধন হিসাবে গণ্য হবে।"[৮৩] সাতবছর লেগেছিল এই বিলটি আইনে পরিণত হতে। এই আইনরচিত হয়েছিল মূলতঃ দেশের মহিলা সংগঠনগুলির নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও প্রচারের ফলে। উদাহরণস্বরূপ মহিলা ফেডারেশনের

কথা বলা যায়। ১৯৫৮ সালে বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের পঁচাত্তর (৭৫) জন সদস্যা আঠার (১৮) হাজার সই সংগ্রহ করে এই বিলটি উত্থাপন করার আহ্বানে আইনমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। লোকসভার সদস্যদের নিকট পোস্টকার্ড বা চিঠি দেওয়া, কোন কোন জায়গায় পিতামাতাদের কন্যার বিবাহে পণ দিবেন না এবং পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণ করবেন না বলে শপথ গ্রহণ করা প্রভৃতি কর্মসূচী নেওয়া হয়। পাশাপাশি, বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে নানা চিঠি এবং প্রবন্ধ লেখা, নানা সভা সংগঠিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই বিল আইনে পরিণত করার জন্য আইন মন্ত্রীর কাছে পঁচিশ (২৫) হাজার সই এবং পাঁচ (৫) হাজার পোস্টকার্ড পাঠান হয়।[৮৪]

পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকেও জানা যায় যে, মহিলারা পণপ্রথা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সভা সংগঠিত করেন। যেমন তমলুক থেকে নির্মলা সান্যালের লেখা চিঠি থেকে জানা যায় যে,পণপ্রথা সম্বন্ধে তাঁরা ২টা বৈঠক করেন— যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্য থেকে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যা মণিকুন্তলা সেন পণপ্রথার বিরুদ্ধে কয়েক সহস্র গণ স্বাক্ষরসহ একটি বেসরকারী বিল উত্থাপন করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী বিল উত্থাপনের প্রতিশ্রুতিতে সে বিল প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। পরে ১৯৬১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পণপ্রথা নিষিদ্ধ আইন চালু করলে রাজ্য বিধানসভায় এই বিল উত্থাপনের আর প্রয়োজন থাকে না।[৮৫] এইভাবে এই আইনগুলি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজে নারীদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলে। যদিও সেগুলি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে নারীদের নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

জীবিকার দাবিতে আন্দোলনে বামপন্থী মহিলাঃ

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠনের প্রারম্ভিক পর্বেই এর মূল উদ্দেশ্য ছিল দুঃস্থ মহিলাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে তাদের স্বাবলম্বন করে তোলা। তাই দেখা যায় এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে মহিলারা নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পরও মহিলাদের সেই উদ্যোগ অব্যাহত ছিল।

১৯৫২খ্রিষ্টাব্দে ৩-৪ মে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ষষ্ঠ সম্মেলনে জীবিকার উপর আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[৮৬] ৪.২.১৯৫৫ তারিখে তুফানগঞ্জ থেকে সেবিকা পাল বেলা লাহিড়ীকে একটি চিঠি পাঠান। ৭.২.১৯৫৫ তারিখে পুলিশের হাতে আসে চিঠিটি। চিঠিতে তিনি লেখেন ঢেঁকি লোনের দাবিতে তিনশত(৩০০) মহিলাদের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি দরখাস্ত ত্রাণ মন্ত্রীর কাছে পাঠান। কিন্তু তাতে কিছু হয়নি। তাই, ব্যাপকভাবে ঢেঁকি লোনের দাবিতে তাঁরা

প্রচার চালাচ্ছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ছয়শত (৬০০) স্বাক্ষর সংগ্রহ হবে এক (১) হাজার স্বাক্ষর হলেই বেলা লাহিড়ীর কাছে পাঠাবেন বলে চিঠিতে লেখেন।[৮৭]

পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, জাতীয় মহিলা ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গ শাখা কমিটির উদ্যোগে ১.৩.১৯৫৫ তাং ১০০০(এক) হাজার মহিলার উপস্থিতিতে মিছিল ও সমাবেশের মাধ্যমে বিধানসভা অভিযান হয়।[৮৮] সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মণিকুন্তলা সেন, সুধা রায়, বিমলা প্রতিভা দেবী, সুষমা সেনগুপ্তা, গীতা মুখার্জি (বিশ্বনাথ মুখার্জির স্ত্রী), গীতা মুখার্জি (সুভাষ মুখার্জির স্ত্রী) প্রমুখ। সমাবেশ শেষে বিধানসভা অভিযান হয়। বিধানসভায় সেইসময় ১৯৫৫-৫৬ সালের বাজেট অধিবেশন চলে। মহিলারা ত্রিশ হাজার স্বাক্ষরসহ একটি স্মারকলিপি সরকারের কাছে পেশ করেন। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়— ১) কলকারখানার অফিসে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের ছাঁটাই করা চলবে না, ২) সমান কাজে সমান বেতন দিতে হবে, ৩) সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে মহিলাদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, তারজন্য চাকরি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কুটির শিল্পে উৎপাদিত জিনিসপত্রের বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে।

মিছিলের বিষয়টির প্রতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু, পি.এস.পি. নেতা হরিপদ চ্যাটার্জী, হেমন্ত বসু, শ্রীমতি মণিকুন্তলা সেন প্রমুখ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহিলা প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। ৯ই মার্চ মহাকরণে মহিলাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানিয়েছেন। জানা যায় মিছিল করার অপরাধে তৎকালীন সরকার কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ১৬০জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করেন।[৮৯]

মহিলাদের জীবিকার দাবী বিধানসভাতেও উত্থাপন করা হয় বলে জানা যায়। মহিলারা এ ব্যাপারে সরব হন। মণিকুন্তলা সেন বিধানসভা অধিবেশনে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন— "সরকার মেয়েদের ব্যাপক রুজি রোজগারের চাহিদা মেটাবার জন্য কিছুই করেন নি। ঘরে ঘরে মেয়েরা সংসার চালানোর জন্য কাজ করতে চান কিন্তু তাদের জন্য তো কোন ক্ষেত্র নেই-ই — এমন কি শিক্ষিত মেয়েরা পর্যন্ত বেকার হচ্ছেন।[৯০]

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়িকা হিসাবে ঐ কমিটির পক্ষ থেকে মণিকুন্তলা সেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে একটি চিঠিও পাঠান। চিঠিতে লেখেন—

"আমরা সংবাদপত্র মারফৎ জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, আপনি মেয়েদের কর্মসংস্থানের প্রতি বিশেষ বিবেচনা করিতেছেন। আজ মেয়েদের কর্মসংস্থান একটি জরুরী সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে।

অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদেরই সংসারের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইতেছে। এই সমস্ত মেয়েদের জন্য সমস্ত ক্ষণের নিয়মিত কাজ প্রয়োজন। তাছাড়া অধিকাংশ মেয়েদেরই সংসারের কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া কিছু রোজগার করা বর্তমানে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার জন্যও আংশিক সময়ে গৃহে বসিয়া কর্মসংস্থান আবশ্যক।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি এদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। আমরা ইহাও মনে করি যে মেয়েদের কর্মসংস্থানের জন্য এই দুইপ্রকার পরিকল্পনা লইয়া অবিলম্বে কার্যকরী করা আবশ্যক।

মেয়েদের কর্মসংস্থানের যেকোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইলে পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত মহিলা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা লওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। সেজন্য আমরা আপনাকে বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি যে আপনি অতি শীঘ্র সমস্ত মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিদের একটি সভা ডাকিয়া সরকারের পরিকল্পনাগুলি বিবৃত করুন। এই প্রকারে সকলের সহযোগিতায় পরিকল্পনা প্রস্তুত হইলে এবং গৃহীত পরিকল্পনাগুলি সকল মহিলা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় চালু হইলে সেই সকল পরিকল্পনাগুলি হইতে সর্বাধিক উপকার সাধিত হইবে।

আশা করি আপনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া উপরিউক্ত সভাটির ব্যবস্থা করিবেন।

বিনীত - শ্রী মণিকুন্তলা সেন

যুগ্ম আহ্বায়িকা-পঃবঃ মহিলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে।"[৯১]

১৯৫৪ সালে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সপ্তম সম্মেলনে আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বেকারীর ভয়াবহতার বিরুদ্ধে নারীর কর্মসংস্থানের আন্দোলন, কুটির শিল্পের প্রসার,উপার্জনহীন নারীদের জন্য বেকার ভাতার দাবি ইত্যাদি। আলোচিত প্রস্তাবগুলি সম্মেলনে গৃহীত হয়। তাছাড়া, এই সম্মেলনে নারীদের জীবিকার দাবিতে আন্দোলনের নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।[৯২]

পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন জেলাতেও জীবিকার দাবিতে মহিলারা আন্দোলন করেন। যেমন মেদিনীপুর জেলার রিপোর্টে লেখা হয় — "On 6.5.55 Mahila Sammelon (2000) was organised on the occasion of the conference with Nirmala Sanyal (MARS) in the chair, Bimala Majhi, Jana Samanta, Kamala Maity, Manikuntala Sen and the President addressed the gathering. They dwelt on the alleged backward condition of the Women folk in India as compared with other countries and urged the

female audience to agitate for various demands like of work for women, opening of maternity centres in villages, arrangements for education of Children and illiterate Women etc.".[৯৩]

সংসদেও জীবিকার দাবিতে পশ্চিমবাংলার মহিলারা যে সরব হন তা তথ্য থেকে জানা যায়। 'ঘরে বাইরে' -এর সংবাদে লেখা হয় "একই রূপ কাজের জন্য নারী শ্রমিককে পুরুষ শ্রমিকের সমান মজুরী দিবার প্রস্তাব করিয়া কমিউনিস্ট সদস্যা শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী লোকসভার একটি বেসরকারী বিল উত্থাপন করিয়াছেন।

বিলটির উদ্দেশ্য ও হেতু বিবৃত করিয়া শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী বলেন যে, সমান কাজে সমান বেতন দানের নীতি ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা ছাড়া এই নীতি সমস্ত সভ্য দেশেই প্রচলিত আছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার ১৯৫১ সালের সমান বেতন কনভেনশনে সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে একই কাজে একই রূপ বেতন দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।"[৯৪]

১৯৬১ সালে ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির দশম সম্মেলনে উত্থাপিত সম্পাদকীয় রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, গত দুই বৎসরের মধ্যে সমিতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল জীবিকার আন্দোলন। আগামী দিনেও এই আন্দোলন যে গুরুত্ব পায় তা বোঝা যায় প্রকাশ্য সম্মেলনের ঘোষণা থেকে। প্রকাশ্য সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৬১ সালের ৮ই মার্চ বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের সময় মহিলা ফেডারেশনের নেতৃত্বে বিধানসভা অভিযান হবে।[৯৫]

'ঘরে বাইরে'তে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির দশম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬১ সালের ৮ই মার্চ কলকাতায় সহস্রাধিক মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক দাবী পেশ করেন। ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে (৫০) হাজার মহিলার স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি নিয়ে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যান। দাবীপত্রে বলা হয় —

১) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৬-১১বৎসরের ছেলে মেয়েদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকরী করা,

২) গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো,

৩) মেয়েদের জন্য অল্প খরচে হোস্টেলের ব্যবস্থা করা,

৪) বয়স্ক শিক্ষার জন্য সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করা, গ্রাম ও শহরাঞ্চলে যাতে ব্যাপকভাবে মেয়েদের কর্মসংস্থান করা যায় তারজন্য কলকারখানা ও কুটির শিল্পের প্রসার,

৫) গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের জন্য বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি ঘটিয়ে ব্যাপক কাজের সুযোগ দেওয়া,

৬) হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতি জায়গায় মেয়েদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ও নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে উদ্যোগী মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতা গ্রহণ করাও সরকারের পক্ষে প্রয়োজন।[৯৬]

১৯৬৫ সালের ৪-৫ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির একাদশ সম্মেলনে প্রদত্ত সম্পাদকীয় রিপোর্ট থেকে মহিলাদের জীবিকার জন্য গঠনমূলক কাজের কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। জানা যায় সমিতি ১৪টি সেলাই কেন্দ্র পরিচালনা করে এবং ৩টি জেলা কেন্দ্র থেকে প্রতিবছরে মেয়েরা লেডি ব্যাব্রোর্ণ ডিপ্লোমা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়। একটি তাঁতের ট্রেনিং বিদ্যালয়, ৪টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, ৫টি শিশু বিদ্যালয়, ৩টি নার্সারি বিদ্যালয় ও একটি গানের স্কুল সমিতি দ্বারা পরিচালিত হয়। একাদশ সম্মেলনেও জীবিকার দাবির উপর আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় বলে জানা যায়।[৯৭] অনুরূপভাবে, ১৯৬৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর- ১লা অক্টোবর কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির দ্বাদশ সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে ১১টি প্রস্তাব গৃহীত হয়— যারমধ্যে জীবিকার দাবী ছিল অন্যতম।

১৯৭০ সালের ৮ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির ত্রয়োদশ সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১৫টি প্রস্তাব ও ১১ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবগুলির মধ্যে নারীর সামাজিক অধিকার ও জীবিকা ও কর্মসংস্থানের দাবী ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৯৮]

১৯৭৩ সালের ২০-২২ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির চতুর্দশ সম্মেলন হয়। সম্মেলনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের শিক্ষা ও জীবিকার অধিকার, নারীর স্বাবলম্বন ও সমান অধিকারের জন্য, মানুষের জীবন-জীবিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলে জানা যায়। সম্মেলন থেকে আগামীদিনের জন্য ১৪ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচীর মধ্যেও নারীদের জীবিকা, সমান কাজে সমান মজুরী প্রভৃতি দাবি স্থান পায়।[৯৯]

১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জুন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি ও ভারতীয় জাতীয় ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত মহিলা সংগঠনগুলি যৌথ উদ্যোগে এক মিছিল করে রাজ্যপালের কাছে একটি স্মারকলিপি দেয়। মূলত খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য এই স্মারক লিপি দেওয়া হলেও এই সমস্যার সমাধানের উপায় হিসাবে মহিলাদের জীবিকার দাবিটিও গুরুত্ব পায়। দাবিতে উল্লেখ করা হয়— "টেস্ট রিলিফের কাজের মারফত গ্রামাঞ্চলে ও অর্ধশহর অঞ্চলে মেয়েদের কাজ দিতে হবে।"[১০০]

কেন্দ্রীয়ভাবে সমিতির উদ্যোগে জীবিকার দাবিতে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করার পাশাপাশি জেলাগুলিতেও এই দাবি গুরুত্ব পায়। যেমন ১৯৭৩ সালের ১লা আগস্ট বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড ব্লকে বর্ধমান জেলা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভানেত্রী আশালতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নমিতা পালের নেতৃত্বে সাধারণ খেতমজুর ও মধ্যবিত্ত মহিলারা বি ডি ও - এর কাছে ডেপুটেশন দেন। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি মহিলারা টেস্ট রিলিফ ও বিকল্প কর্মসংস্থানের দাবি তোলেন।[১০১]

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির নেতৃত্বে সারা রাজ্যের মহিলাদের নিয়ে একটি বড় মিছিল হয় খাদ্যসহ জীবিকার দাবিতে। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কার্যকরী সভানেত্রী কনক মুখোপাধ্যায়ের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা পঙ্কজ আচার্য রাজ্যপালের কাছে লিখিত স্মারকলিপিটি অনুমোদনের জন্য পাঠ করেন। প্রস্তাবিত স্মারকলিপির সমর্থনে কলকাতা জেলার সম্পাদিকা কণিকা গাঙ্গুলি, হুগলী জেলায় সম্পাদিকা মুক্তা কুমার, মুর্শিদাবাদ জেলার সম্পাদিকা শ্বেতা চন্দ্র, হাওড়া জেলার সভানেত্রী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়, ২৪ পরগণা জেলার সভানেত্রী কমলা দাস, বীরভূম জেলার সভানেত্রী ক্ষমা চৌধুরী এবং মেদিনীপুরের সাধনা পাত্র বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য শেষে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভানেত্রী জ্যোতি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ১৩জনের একটি প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। খাদ্য সহ স্মারকলিপিতে জীবিকার দাবিও তোলা হয়। "বেকারদের কাজ অথবা কাজ সাপেক্ষে বেকারভাতা দিতে হবে" — এই দাবি করা হয়।[১০২]

১৯৭৪ সালের ২৫শে মার্চ পাঁচশতাধিক খেতমজুর মহিলা চন্দ্রকোণা ২ নং ব্লক অফিসে কাজ ও রিলিফের দাবিতে গণ-ডেপুটেশন দেন। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির মেদিনীপুর জেলার জেলা সম্পাদিকা নন্দরানী ডল, ডলি চক্রবর্তী ও ভারতী মণ্ডলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেন।[১০৩] ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল রানীগঞ্জ শহরে তিন সহস্রাধিক মহিলা কাজের দাবিসহ অন্যান্য দাবিতে একটি মিছিল করেন।[১০৪] ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১-১২ ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতৃত্বে রাজভবনের সামনে দশ দফা দাবি নিয়ে মহিলারা গণ অবস্থান শুরু করেন— যা পূর্বেই বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দশ দফা দাবির মধ্যে জীবিকার দাবিগুলি ছিল নিম্নরূপ— "....৭ নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক কর্মপ্রার্থী নারীদের বেকার তালিকাভুক্ত করতে হবে ও তাদের কর্মসংস্থান করতে হবে। ৮) সর্বক্ষেত্রে নারীদের চাকরির সমানাধিকার, সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। নারীদের কর্মসংস্থানের

জন্য ব্যাপকভাবে কুটিরশিল্প ও লঘু শিল্পের বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।"[১০৫]

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ২৮-৩০ মার্চ হাওড়া জেলার সালকিয়াতে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পঞ্চদশ রাজ্য সম্মেলনে ১৯টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। যারমধ্যে বেকার সমস্যা, কর্মক্ষম নারীদের বেকারী ইত্যাদি বিষয়েও প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ১৭ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতৃত্বে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মহিলারা মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লিখিত একটি স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেন। স্মারকলিপিতে খাদ্যের দাবির পাশাপাশি সকলের জন্য কাজের ব্যবস্থা ও কাজ সাপেক্ষে বেকারভাতা দেওয়ার দাবি তোলা হয়। প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন হার প্রবর্তন এবং বোনাস কাটার আইন বাতিলের দাবিও উত্থাপন করা হয়।[১০৬]

বিভিন্ন ধরনের জীবিকার সাথে যুক্ত মানুষদের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ:

মহিলাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন জীবিকার সাথে যুক্ত মানুষদের উন্নয়নের প্রতি নারীদের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ২৭.৩.১৯৫৫ তারিখে মহেশতলা দর্জি ইউনিয়ন থেকে বজবজ থানার অন্তর্গত ডাকঘর ফুটবল মাঠে রাধাশ্যাম ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে একটি সভা ডাকা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন অন্যান্যদের সাথে মহিলা নেত্রী মণিকুন্তলা সেন। দর্জিদের নানা সমস্যার কথা যেমন আলোচিত হয় তেমনই ৩১.৩.১৯৫৫ তারিখের র‍্যালিতে দর্জিদের যোগ দেওয়ার বলা হয়।[১০৭]

২৪.৪.১৯৫৫ তারিখে প্রায় এক হাজার মৎস্যজীবীর উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ মৎসজীবীদের সম্মেলন হয় কালনা থানার অন্তর্গত পূর্ব সাতগাছিয়াতে। আশু বারিকের সভাপতিত্বে বগলা গুহ, মণিকুন্তলা সেন, আনন্দ মুখার্জি, অম্বিকা চক্রবর্তী, মুরারি গোস্বামীর উপস্থিতিতে এই সম্মেলন হয়। বক্তারা সকলে মৎস্যজীবীদের পাশাপাশি বাস্তুহারা মৎস্যজীবীদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করেন। সম্মেলনে দাবি তোলা হয় বিনা করে নদী এবং খাল থেকে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার অধিকার, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী কমিটি গঠিত হয়। আশু বারিক সভাপতি, বগলা গুহ সম্পাদক এবং একশত আশি (১৮০) জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়।[১০৮]

বাঁকুড়ার মহিলা নেত্রী ভক্তি ঘোষ মহিলাদের সংগঠিত করার পাশাপাশি কৃষকদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে তাদের পাশে যে দাঁড়ান তা পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত সূত্র থেকে জানা যায়। শুধু

কৃষক নয় তিনি বিড়ি শ্রমিকদের নিয়েও আন্দোলন করেন। ১৯.১০.১৯৪৮ তারিখে ভক্তি ঘোষ বিভিন্ন সি.পি.আই নেতৃত্বের সঙ্গে দেড়শত (১৫০) জন বিড়ি শ্রমিককে নিয়ে বাঁকুড়া শহর দিয়ে একটি মিছিল নিয়ে রেলওয়ে স্টেশনে আসেন। ডঃ সুধাংশু মুখার্জীকে বাঁকুড়া জেল থেকে স্থানান্তরিত করার প্রতিবাদ জানিয়ে। জানা যায় তাঁরা কমিউনিস্ট শ্লোগান দিতে থাকেন এবং ট্রেন ছাড়ার পরে তাঁরা স্টেশন ছেড়ে যান।[১০৯] বিড়ি শ্রমিকদের পাশাপাশি শ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকার নিয়ে বাঁকুড়ার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি যে আন্দোলন করে তা বিভিন্ন চিঠি থেকে জানা যায়।[১১০]

১৯৫৪ সালে শিক্ষক আন্দোলনের পাশেও দাঁড়ান মহিলারা। ১৯৫৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ডাকে কয়েকটি আশু ও জরুরী দাবিতে পশ্চিমবঙ্গের আঠারো হাজার শিক্ষক আন্দোলন করেন। শিক্ষকদের মুখ্য দাবি ছিল মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ৩৫ টাকা মহার্ঘ্যভাতা এবং ৭৩ টাকা থেকে ১৮০ টাকা পর্যন্ত বেতন। কিন্তু তাঁদের এই দাবী সরকার প্রত্যাখ্যান করলে ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে শিক্ষকরা ধর্মঘট শুরু করেন। ১১ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শিক্ষকরা রাজভবনের সামনে লাগাতার অবস্থান করেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে অবস্থানরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের শিবির ভেঙে দেওয়া হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিধানসভার অধিবেশন শুরু হয়।[১১১] সেদিন তৎকালীন পুলিশমন্ত্রী কালীপদ মুখার্জীকে ধিক্কার জানিয়ে কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ তারিখে গণ মিছিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার খবরে সরকারের পক্ষ থেকে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে যে সমস্ত নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের মধ্যে ছিলেন মণিকুন্তলা সেন (১৫.২.৫৪) , প্রকৃতি মিত্র (১৫.২.৫৪) , কনক মুখার্জী (১৫.২.৫৪), পঙ্কজ আচার্য (১৬.২.৫৪), সুধা রায় (১৬.২.৫৪), অনিলা দেবী ও বেলা লাহিড়ী প্রমুখ।[১১২] শুধুমাত্র এঁরাই নন জেলে ভরা হয় মহিলা সমিতির অনেক কর্মীকে। শেষপর্যন্ত সরকার কিছু কিছু মূল দাবী মেনে নিলে ২১ ফেব্রুয়ারি শিক্ষকদের বারোদিনব্যাপী কর্মবিরতির অবসান ঘটে।[১১৩]

বামপন্থী মহিলারা শ্রমজীবীদের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যে যুক্ত ছিলেন তা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। তাই দেখা যায় ২৭মে থেকে ৩০ মে ১৯৫৪ কলকাতায় অনুষ্ঠিত AITUC -র ২৪তম বার্ষিক অধিবেশনে ২৪ পরগণার একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে মহিলা নেত্রী গীতা মুখার্জী অংশ নেন। বজবজের জুট মিলের শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে তাদের পাশে থেকে আন্দোলন করেন। ১৯৫৪ খ্রি. জানুয়ারী মাসে সাতটি জুট মিলকে নিয়ে শ্রমিকদের দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘট

পরিচালনা করেন বলে জানা যায়।[১১৪]

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় যে, ১৯৫৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর বোনাসের দাবিতে সারা বাংলার তিনলাখ চটকল শ্রমিকের পঁচিশ হাজার প্রতিনিধি চটকল মালিক সমিতি ঘেরাও করে যার মধ্যে বজবজ থেকে আসে দশ হাজার। আর এই চটকল শ্রমিকদের নেতৃত্ব দেন গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়।[১১৫]

২৯.৩.১৯৫৫ তারিখে বাসকর্মী ইউনিয়নের একটি মিটিং হয় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। চারশত (৪০০) জন বাসকর্মী যোগ দেন এই সভাতে। বেশীরভাগই ছিলেন পাঞ্জাবী। তিনজন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। মণিকুন্তলা সেন, হেমন্ত ঘোষাল, সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বাস কর্মীরা তাঁদের দাবি নিয়ে ৩০.৩.১৯৫৫ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিধানচন্দ্র রায় ক্ষতিগ্রস্ত বাসকর্মীদের একটি তালিকা দিতে বলেন।[১১৬] মেদিনীপুর জেলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা ঊষা চক্রবর্তী মেথর এবং ঝাড়ুদারদের নিয়ে দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য মেদিনীপুর শহরে ধর্মঘট করেন।[১১৭]

মেদিনীপুর জেলার মহিলা ফ্রাকশন কমিটির সম্পাদক মৃণালের (পদবি নেই) সি.পি.আই মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্পাদককে লেখা চিঠি থেকে জানা যায় যে, রেলশ্রমিক পরিবারের মেয়েদের নিয়ে বামপন্থী মহিলারা আন্দোলন করেন। এই চিঠিতে মেদিনীপুর জেলার মহিলা নেত্রী আশাকে রেল ধর্মঘটে কাজ করার জন্য পাঠাবার কথা বলা হয়। মেদিনীপুর জেলার মহিলা কর্মীরা অধিকাংশই শ্রমিক মেয়ে ও শ্রমিক পরিবারস্থ মেয়েদের মধ্যে যে কাজ করেন তা এই চিঠি থেকে স্পষ্ট।[১১৮] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ মে থেকে ২০ দিন ব্যাপী সারা ভারতের ১৭ লক্ষ রেলশ্রমিকদের ধর্মঘটের সময় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মীরা কাঁচরাপাড়া, খড়্গপুর, অণ্ডাল, চিত্তরঞ্জন, আসানসোল প্রভৃতি অঞ্চলের রেল কলোনিগুলিতে গিয়ে রেল শ্রমিকদের পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ান ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

১৯৫৪ সালের শেষার্ধে কলকাতার অন্যতম বিড়ি ব্যবসায়ী নারী শ্রমিকদের ছাঁটাই করবার উদ্দেশ্যে গুদাম বন্ধ করে দেয়। কলকাতা জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ঐ নারী শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করবার জন্য কর্মী নিয়োগ করে এবং এই আন্দোলনে সাহায্য করবার জন্য টাকা ও চাল তুলে দেয়। এই সময় কারখানা খুলবার দাবিতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তরফ হতেই নারী শ্রমিকদের দুইশত প্রতিনিধি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদপ্তরে যায় এবং এ বিষয়ে শ্রম অধিকর্তার হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়।[১১৯]

এইভাবে বামপন্থী মহিলারা সমাজে নারীদের বিভিন্ন ধরনের জীবিকার সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি অন্যান্য জীবিকার সাথে যুক্ত মানুষদেরও পাশে দাঁড়ান। কৃষক, শিক্ষক, শ্রমজীবী মানুষদের আন্দোলনের সঙ্গে থেকে আন্দোলনকারীদের মনোবল বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন। পাশাপাশি এই বিভিন্ন জীবিকার মানুষদের সঙ্গে থেকে মহিলাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যেমন প্রসারিত হয় তেমনই আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁদের অভিজ্ঞতা নারী আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করে।

মহিলাদের মর্যাদা রক্ষায় বামপন্থী মহিলা :

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠনের প্রথমাবস্থা থেকেই সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল নারীদের মর্যাদা সঠিকভাবে রক্ষা করা। দুর্ভিক্ষের সময় অভাবের তাড়নার হীন চরিত্র পুরুষদের কবলে পড়ে অনেক নারীর মর্যাদা বিনষ্ট হয়। চাঁদপুর, ভোলা, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, ২৪ পরগণা প্রভৃতি এলাকায় অসৎ উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করবার জন্য দুঃস্থ নারীদের নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়। তাই, সমিতির বিভিন্ন সম্মেলনে নিরাশ্রয় ও দুঃস্থনারীদের সমাজজীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার দাবি উঠে এবং প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কলকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সঙ্গে যুক্তভাবে পতিতা ব্যবসা নিরোধ বিলের (Immoral Traffic Bill) পক্ষে সভা সমিতি করে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করে।

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বেআইনী ঘোষিত হয় এবং সমিতির অনেক নেত্রী ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় — যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। মহিলাদের উপর সরকারের এই দমন নীতি সমালোচিত হয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি কর্তৃক। মহিলাদের বিশেষ অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার উপর আলোচনা ও প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয় বিভিন্ন সম্মেলনে। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে চীন ভারত সংঘর্ষের সময় ভারতরক্ষা আইনে কয়েকজন বামপন্থী মহিলা নেত্রী ও কর্মীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মহিলা সমিতির একটি অংশ সরকারের এই দমন নীতির সমালোচনা করেন।

১৯৭০ সালের শেষাশেষি সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গে নারীর মর্যাদাহানিকর কিছু কিছু ঘটনা নারী আন্দোলনকে নতুনমাত্রা এনে দেয়। যেমন ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ২৯শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কর্মী বীথি দে কে কাশীপুর থানার অন্তর্গত কালীচরণ ঘোষ লেন থেকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়। অনুরূপ ঘটনা হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম, কোচবিহার সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ঘটতে থাকে যা অন্য অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এরফলে, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সাধারণ মহিলাদের নিয়ে বামপন্থী মহিলারা সংগঠিত হন ও

প্রতিবাদ জানান বলে তথ্যে উল্লেখ আছে।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ২২শে মে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভানেত্রী জ্যোতি চক্রবর্তীর উপর আক্রমণ হয়। যদিও তিনি প্রাণে বেঁচে যান।[১২০] একইরকমভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা হয় পারুল বসু, ঝর্ণা দাশগুপ্ত, লতিকা নিয়োগী, গায়ত্রী ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে। মহিলা নেত্রী উমা আঢ্যকে মিছিল চলাকালীন বোমা মারলে তাঁর একখানা পা কেটে দিতে হয় বলে জানা যায়। রাষ্ট্রপতি শাসনের সময় বাংলার মহিলদের উপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে মহিলাদের সংগঠিত করার জন্য দুটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ হয়। ১) স্বৈরাচারী শাসনের অবসান চাই ২) পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসী শাসনে নারী হত্যা, নারী নির্যাতন। এই দুটি পুস্তিকাতে ১৯৭০-১৯৭২ সাল পর্যন্ত বাংলার মহিলাদের উপর যে আক্রমণ হয় তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। স্থানীয় ভিত্তিতে আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে ডেপুটেশন দেন মহিলারা। যেমন— ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর বেলেঘাটার বস্তিতে আক্রমণ হলে স্থানীয় মহিলা সমিতি ফুলবাগান থানায় ডেপুটেশন দেয়। ১৯৭১খ্রিষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর মিঞাবাগান বস্তিতে আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে কলকাতা জেলা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ডেপুটেশন দেয়। কেন্দ্রীয়ভাবে ১৯৭২খ্রিষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং মহিলাদের মর্যাদা রক্ষার দাবিতে একটি মহিলা কনভেনশন হয়। এই কনভেনশনের যুগ্ম আহ্বায়িকা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ এবং নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ। এই কনভেনশনে সরকারের কাছে দাবি করা হয় মিসা ও পি ডি এ আইন প্রত্যাহার এবং জরুরী অবস্থার অবসান ঘটিয়ে মহিলাসহ সমস্ত নাগরিকদের জন্য সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা।[১২১]

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই মে চারটি বামপন্থী মহিলা সংগঠনের উদ্যোগে সংগঠিত কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলায় জেলায় সভা-সমাবেশ মিছিল ও কনভেনশনের মধ্য দিয়ে নারীদের মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা হয়। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২৯মে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পশ্চিমবঙ্গে নারীদের উপর ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে একটি স্মারকলিপি—যা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার্থে নয়টি দলের সম্মিলিত এক অভিযানের পরিকল্পনা হয়। ১২ই ও ১৩ই নভেম্বর জেলায় জেলায় এবং ১৫ই নভেম্বর কলকাতায় কেন্দ্রীয় আইন অমান্যের কর্মসূচী নেওয়া হয়। এতে অনেক মহিলা অংশ নেন বলে জানা যায়।[১২২] ১৯৭৪ সালে নারীরা আরো দৃঢ়ভাবে আন্দোলনে অংশ নেন বলে জানা যায়।

তবে, বামপন্থী মহিলা সমিতিগুলি এই পর্যায়ে যৌথভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করে বলে জানা যায়।

গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে এবং মহিলাদের সম্মান রক্ষার্থে ১৯৭৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি ৩৬টি ট্রেড ইউনিয়ন ও গণ সংগঠন মিলিত হয়ে জলপাইগুড়িতে এক গণতান্ত্রিক কনভেনশন সংঘটিত করে। এখানে উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ সমর্থন করে আলোচনায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির শচী ব্যানার্জী।[১২৩]

১৯৭৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ভারতসভা হলে পাঁচটি বামপন্থী মহিলা সংগঠনের উদ্যোগে যুক্ত রাজ্য কনভেনশন হয়। আড়াই শতাধিক প্রতিনিধি কনভেনশনে যোগ দেন। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ, মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ, অগ্রণী মহিলা পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ অগ্রগামী মহিলা সংঘ - এই পাঁচটি সংঘের প্রতিনিধিদের নিয়ে সংগঠিত এই কনভেনশনের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

১৯৭৫ সালটিকে রাষ্ট্রসংঘ থেকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত হয়। তাই, এই নারীবর্ষে নারীদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদা অটুট রাখার জন্য বিভিন্ন মহিলা সংগঠনগুলি নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে। যেমন ১৯৭৫সালে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পঞ্চদশ সম্মেলনে নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ বছরই কেরালার ত্রিবান্দ্রম ইণ্ডিয়ান সোস্যাল সায়েন্সের উদ্যোগে ১৯৭৫ সালের ২৭-৩০ ডিসেম্বর একটি সর্বভারতীয় আলোচনা চক্র ও সম্মেলন আহ্বান করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সাতজন প্রতিনিধি এই আলোচনাচক্রে যোগ দেন। কনক মুখোপাধ্যায়, পক আচার্য, পক আচার্য, প্রভা চ্যাটার্জী, বিমলা রণদিভে, নিরুপমা চ্যাটার্জী, বিভা ঘোষ গোস্বামী ও প্রণতি ঘোষ। এই আলোচনাচক্রে মূলত নারীদের অধিকারের উপর নির্বাচিত প্রবন্ধ উপস্থাপিত করা হয়।

১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ নভেম্বর কলকাতায় বামপন্থী দলগুলি ও তাদের গণসংগঠনগুলিকে নিয়ে একটি কনভেনশন হয়। এতে বামপন্থী মহিলা সংগঠনগুলিও অংশগ্রহণ করে। মূলত ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষার জন্য জনমত গঠন করার উদ্দেশ্যে এই কনভেনশন হয়।

মন্তব্য:

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৪৭খ্রি. - ১৯৭৭ খ্রি. পর্যন্ত বামপন্থী মহিলারা সমাজের ও অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে নানা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর অন্যতম সমস্যা ছিল বাস্তুহারা সমস্যা। আর এই সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকটি। অর্থনৈতিক দিক থেকে বাস্তুহারা মানুষদের প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করার পর তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা একটি অন্যতম লক্ষ্য ছিল। আর সেজন্য প্রয়োজন ছিল বাস্তুহারাদের রুজির ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি ছিল নানান সামাজিক সমস্যা। কলোনীগুলিতে গিয়ে বাস্তুহারা মহিলাদের পাশে দাঁড়ানো, তাঁদের সহমর্মী হয়ে সম্মান রক্ষা করা ও সংঘবদ্ধ করা ছিল মহিলাদের অন্যতম কাজ। আর এই কাজে বামপন্থী মহিলারা সীমিত শক্তি নিয়ে বাস্তুহারাদের পাশে থাকেন। যদিও বাস্তুহারারা আরো বেশী করে বামপন্থী নারী নেতৃত্বকে চেয়েছিলেন তাঁদের সাংগঠনিক শক্তিকে সংহত করার জন্য কিন্তু সেই চাহিদা পূরণ করার মতো বামপন্থী নারী নেতৃত্ব তখনো ছিল না। তবে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তাঁদের সাধ্যমত চেষ্টা করেন বাস্তুহারা সমস্যার সমাধান করার।

বামপন্থী মহিলাদের কর্মসূচীর অন্যতম অঙ্গ ছিল নারী ও শিশুদের উন্নয়ন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠনের প্রারম্ভিক পর্ব থেকেই এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমাজে নারীদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং শিশুদের উন্নয়ন ঘটিয়ে শিশুকল্যানকর দেশ হিসাবে ভারতকে প্রতিষ্ঠা করা ছিল মহিলাদের অন্যতম লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্যপূরণ করতে গিয়ে মহিলারা বিভিন্ন সভা সংগঠিত করেন। সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেন। বিধানসভাতেও এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বিভিন্ন সম্মেলনে নারী ও শিশুর কল্যাণকর নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা ও প্রস্তাবগ্রহণ করা হয়। শুধু দেশের মধ্যেই বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ না রেখে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের নারীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলার বামপন্থী নারীরা বিষয়টিকে সর্বসম্মুখে তুলে ধরেন এবং জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বামপন্থী মহিলারা উপলব্ধি করেছিলেন মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার না ঘটাতে পারলে নারীমুক্তি সম্ভব নয়। তাই, সাধারণ মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো ছিল বামপন্থী মহিলাদের কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য আবার বামপন্থী মহিলা কর্মীদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা চলে। সাধারণ মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য মহিলারা বিভিন্ন জায়গায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বয়স্ক মহিলাদের এবং শ্রমজীবী মহিলাদের জন্যও স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিভিন্ন সম্মেলনে ও সভাতে বিষয়টি আলোচিত হতে থাকে। সরকারের কাছে নানা দাবি উত্থাপন করা হয়। স্ত্রী শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের মত নানা দাবি পেশ করা হয়।

শিক্ষাদানের পাশাপাশি বামপন্থী মহিলারা চেষ্টা করেছিলেন সামাজিক কুসংস্কার যেগুলি সমাজে অসাম্য দৃষ্টি করে এবং নারীর সমতা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয় সেগুলিকে দূরীভূত করা। সেজন্য প্রয়োজন ছিল জনমত গঠন করা ও সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা। তাই,দেখা যায় পার্লামেন্টে সরকার হিন্দু কোড বিল আনয়ন করলে মহিলারা গ্রামে, গঞ্জে, শহরের বিভিন্ন বস্তি এলাকায় ছোট ছোট সভা করে এই বিলের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। প্রগতিশীল বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে মহিলাদের এই উদ্যোগের ফলে সরকার হিন্দু কোড বিল পাশ করেন। ফলে, বিবাহে নারী-পুরুষ সমতা আসে। অনুরূপভাবে পণপ্রথার মত একটি ঘৃণ্যতম প্রথা দূরীকরণেও মহিলারা উদ্যোগ নেন। সংসদে বামপন্থী মহিলা সাংসদের নামেই পণপ্রথা বিল উত্থাপিত হয়। এই বিলের সমর্থনে সাংসদদের পোস্টকার্ডে চিঠি পাঠান, কোন কোন জায়গা পণ না নেওয়া ও দেওয়ার জন্য শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মত নব নব কর্মসূচী গ্রহণ করেন মহিলারা। বামপন্থী মহিলাসহ দেশের বিভিন্ন মহিলা সংগঠনগুলির নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে শেষপর্যন্ত পণপ্রথা বিরোধী আইন পাশ হয়।

নারী-পুরুষ সমতা আনার প্রধান শর্ত অর্থনৈতিক দিক থেকে নারীকে স্বাবলম্বী করে তোলা— একথা বামপন্থী মহিলারা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁদের কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন পেশায় নারীকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নারীরা একদিকে যেমন বিভিন্ন সম্মেলনে জীবিকার দাবিতে নানা আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন অন্যদিকে তেমনই জীবিকার দাবিতে নানা সভা, মিছিল এমনকি গণ অবস্থান করে সরকারের কাছে দাবিও জানিয়েছেন। শুধু কেন্দ্রীয়ভাবে নয় জেলায় জেলায় এই দাবিতে মহিলারা সরব হয়েছেন।

শুধুমাত্র মহিলাদের শিক্ষিত করা, জীবিকার ব্যবস্থা করা, রক্ষণশীল কুসংস্কারগুলিকে দূর করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা নয়,পাশাপাশি অন্যান্য জীবিকার সাথে যুক্ত মানুষদের পাশেও দাঁড়ান মহিলারা। বিশেষ করে কৃষক ও বিভিন্ন পেশায় যুক্ত শ্রমজীবী মানুষ ও পরিবারের পাশে থেকে তাদের আন্দোলনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছেন। অনেকে আবার বিভিন্ন পেশায় যুক্ত মানুষদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য তাঁদের সংগঠিত করেছেন।

সর্বোপরি বামপন্থী মহিলারা নারীর মর্যাদা রক্ষায় সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। তাই, দেখা গেছে নারীর মর্যাদাহানিকর পতিতা ব্যবসা নিরোধ করার জন্য সভা করে প্রচার সংগঠিত করেছেন। আলোচ্য সময়কালের বিভিন্ন পর্বে মহিলা কর্মী ও নেত্রীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মহিলারা সরব হয়েছেন। দুষ্কৃতি আক্রমণসহ মহিলাদের উপর ঘটে যাওয়া মর্যাদা হানিকর যে

কোনরকম ঘটনারই প্রতিবাদে মহিলাদের সামিল হতে দেখা গিয়েছে। নিজেদের শুধু সংঘবদ্ধ করা নয় জনমত গঠনের জন্য পুস্তিকা প্রকাশ করার মত কর্মসূচীগ্রহণ করেছেন। কাজেই বলা যায়, সীমিত শক্তি নিয়ে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য মহিলারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন।

তথ্যসূত্র:

১. ইতিহাস অনুসন্ধান - ২৮, পৃ. ৯৯৮-৯৯৯

২.বসু জ্যোতি, যতদূর মনে পড়ে, পৃ. ৩৯

৩. Chakrabarti Prafulla K. ; The Marginal Men., Leemiere Books, Kalyani, 1990, P-19

৪. চক্রবর্তী রেণু, ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা,১৯৪০-১৯৫০,অনুবাদ - পুষ্পময়ী বসু ও মণিকুন্তলা সেন, মণীষা, তারিখ হীন পৃ. ৯১

৫. বসু জ্যোতি, যতদূর মনে পড়ে; পৃ. ৪৯

৬. বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, পঞ্চম খণ্ড,পৃ. ৪২৬

৭. সেন মণিকুন্তলা, সেদিনের কথা, পৃ.

৮. পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬

৯. সেন মণিকুন্তলা, পূর্বোক্ত, পৃ.

১০. পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬

১১.পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬

১২.পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬

১৩.পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬

১৪. ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩

১৫. চক্রবর্তী রেণু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১

১৬. মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫

১৭.পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬

১৮. মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত ৬২

১৯. গুপ্ত শ্যামলী, নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা , পৃ. ১১৫

২০. নন্দন, জুন ২০০৩, পৃ. ২৪-২৫

২১. সেন মণিকুন্তলা, পূর্বোক্ত, ১১৯

২২. সেন মণিকুন্তলা, পূর্বোক্ত

২৩. মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত , পৃ. ৬২-৬৩ ও সেন মণিকুন্তলা, সেদিনের কথা, পৃ.

২৪. চক্রবর্তী রেণু, ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা, ১৯৪০-১৯৫০; অনুবাদ পুষ্পময়ী বসু ও মণিকুন্তলা সেন, মণীষা, তারিখহীন পৃ. ৪৯-৫৪ ১৯৪৩-এর মন্বন্তর মোকাবিলা করায় জন্য এবং দুঃস্থ নারী ও শিশুদের সমাজজীবনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে বামপন্থী মহিলারা বিভিন্ন জায়গায় কর্মকেন্দ্র গড়ে মহিলাদের স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করেন। শিশুদের জন্য আশ্রয় শিবির গড়ে তাদেরও সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানতে গেলে দেখতে হবে রেণু চক্রবর্তীর গ্রন্থখানি, মণিকুন্তলা সেনের — সেদিনের কথা এবং কনক মুখোপাধ্যায়ের নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা।

২৫. চক্রবর্তী রেণু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

২৬. মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯

২৭. সেন মণিকুন্তলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

২৮. চক্রবর্তী রেণু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

২৯. চক্রবর্তী রেণু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৩০. চক্রবর্তী রেণু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

৩১. মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

৩২. দাশগুপ্ত সমীর, গণ আন্দোলনে ছাপাখানা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫১-২৫২

৩৩. পুলিশ ফাইল নং ২৪০/৪৬; Special Branch Calcutta Police. ও পুলিশ ফাইল নং ৩৮৯০/৪৯

৩৪. মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮

৩৫. পুলিশ ফাইল নং ২৪০/৪৬

৩৬. পুলিশ ফাইল নং ২৪০/৪৬ , বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮৭-৪৮৮

৩৭. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, মণিকুন্তলা সেন জনজাগরণে নারীজাগরণে, থীমা ২০১০; পৃ. ৩২৯-৩৩৪

৩৮. পুলিশ ফাইল নং ৩৮৯০/৪৯

৩৯. 'ঘরে বাইরে', ১৩৫৯-৬০

৪০. পুলিশ ফাইল নং ৩৮৯০/৪৯ ও ঘরে বাইরে , ১৩৫৯/৬০

৪১. Police File No. 3890/49; Report dated 3.5.53 regarding the open peace session of the Bengal Preparatory Conference of the World Congress of Women held at the University Institute Hall.

৪২. মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

৪৩. পুলিশ ফাইল নং ৩৮৯০/৪৯

৪৪. পুলিশ ফাইল নং ৩৮৯০/৪৯

৪৫. Police File No. 1340/43 (Midnapore), Midnapore District Confidential Report for the week ending 2.4.54

৪৬. Police File No. - 898/44 (1)

৪৭. Police File No. - 1340-43; Week ending report DIB Hooghly 2.4.54

৪৮. Police File No.- 1340-43; Hooghly week ending Report DIB - 26.3.54 & ADIO Reports on 22.3.54

৪৯. ঘরে বাইরে, ফাল্গুন ১৩৫৯, ১ম সংখ্যা

৫০. মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত পৃ.১২২-১২৩

৫১. বিশ্বমাতৃসম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য ঘরে বাইরে, শারদীয়া ১৩৬২, সেন মণিকুন্তলা, সেদিনের কথা, মুখোপাধ্যায় কনক - নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা।

৫২. সেন মণিকুন্তলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭

৫৩. সেন মণিকুন্তলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০-২৩১

৫৪. ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩

৫৫. Police File No. - 619/36, Proceedings of the District Conference of the M.A.R.S. Howrah held on the 8th and 9th October, 1955. Forward under S.P., D.I.B., Howrah's Memo No. 5208/91-47 R. 4058 dated 11.10.55 to S.S.I.B., W.B.

৫৬. ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩

৫৭. ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩

৫৮. ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩

৫৯. মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২

৬০. মুখোপাধ্যায় সরোজ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা; এন.বি.এ., ২০০৭, পৃ. ৩১৭

৬১. নিখিলবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা এলা রীড ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে এই বুলেটিনটি প্রকাশ করেন। সমিতির সভ্যদের জন্য এর দাম করা হয় এক আনা।

৬২. রসুল আবদুল্লাহ মুহম্মদ, গ্রামে গ্রামান্তরে; এন.বি.এ ১৯৮৫ অক্টোবর, পৃ. ৭৪

৬৩. N. Parfenova - কে (C/O- Anti Facist Committee of Soviet Women, 23, Pushkin, Moscow, USSR) লেখা গীতা মুখার্জির একটি চিঠি থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

৬৪. পুলিশ ফাইল নং ৩৮৯০/৪৯

৬৫. আন্দোলনে মেয়েরা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শিক্ষা শিবির, ঘরে বাইরে, ১৩৫৯-৬০

৬৬. ঘরে বাইরে, ১৩৫৯/৬০,

৬৭. ঘরে বাইরে, ১৩৬৮; ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, পৃ.৩৩৭

৬৮. মণিকুন্তলা সেন, শতবার্ষিকী কমিটি, মণিকুন্তলা সেন, জনজাগরণে নারী জাগরণে, সীমা ২০১০, পৃ.২১৬

৬৯. ঘরে বাইরে, ২য় বর্ষ, ফাল্গুন ১৩৫৯, ১ম সংখ্যা পৃ. ৩৩

৭০. চক্রবর্তী রেণু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪

৭১. মুখোপাধ্যায় কনক , পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫, ও বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, নবম খণ্ড, পৃ. ২১-২২

৭২. Weekly Confidential Report of the Superintendent of Police Nadia for the week ending 21.8.1954 . Police File No. 898/44(1) P. 18

৭৩. পুলিশ ফাইল নং - ৮৯৮/৪৪

৭৪. পুলিশ ফাইল নং - ৮৯৮/৪৪

৭৫. নাগ নিবেদিতা - মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অষ্টম সম্মেলন-ঘরে বাইরে ১৩৬২, ফাল্গুন, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃ. ৩২

৭৬. সেন মনিকুন্তলা, সেদিনের কথাল পৃ. ২২২-২২৩

৭৭. কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬০

৭৮. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯

৭৯. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭-২১৯
৮০. আচার্য পঙ্কজ, নির্বাচিত রচনা, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ১৯৮৩ পৃ. ৯৩
৮১. আচার্য পঙ্কজ; পূর্বোক্ত পৃ. ৯৪ ও মুখোপাধ্যায় কনক; পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২
৮২. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি; পূর্বোক্ত ২১৯-২২০
৮৩. ঘরে বাইরে, ১৩৫৯, শারদীয়া, পৃ. ২৮৫
৮৪. ঘরে বাইরে; ১৩৬৮, পৃ. ১২৮
৮৫. মুখোপাধ্যায় কনক; পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৩
৮৬. মুখোপাধ্যায় কনক; পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২
৮৭. পুলিশ ফাইল নং - ৮৯৮/৪৪ পৃ. ২০
৮৮. পুলিশ ফাইল নং ৩৮৯০/৪৯, পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬ C.P. report dated 5.3.55 ও মুখোপাধ্যায় কনক - পূর্বোক্ত পৃ.১৩৯
৮৯. বসু জ্যোতি - যতদূর মনে পড়ে - পৃ. ৯৭-৯৮
৯০. ঘরে বাইরে; ১৩৫৯, ২য় বর্ষ, পৃ.১২
৯১. ঘরে বাইরে, ১৩৫৯, শারদীয়া, পৃ.৩২৬
৯২. মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪
৯৩. পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬
৯৪. পুলিশ ফাইল নং ৩৮৫২/৪৯ ও ঘরে বাইরে ; ১৩৬৪ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৪২৮
৯৫. মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২
৯৬. ঘরে বাইরে, মাঘ ১৩৬৮, ১০ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা
৯৭. মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০
৯৮. মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬
৯৯. মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২-২১৪
১০০. মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬
১০১. গণশক্তি, ১৯৭৩, ৬ই আগষ্ট
১০২. একসাথে, ১৩৮০, শারদীয়া, আচার্য পঙ্কজ, পঙ্কজ আচার্য নির্বাচিত রচনা, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ১৯৮৩, পৃ. ১৭-১৯
১০৩. গণশক্তি, ১৯৭৪, ৩০শে মার্চ

১০৪. গণশক্তি, ১১ই এপ্রিল

১০৫. গণশক্তি, ১৯৭৪, ১২ই ও ১৩ই মার্চ, মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২

১০৬. মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩

১০৭. পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬

১০৮. পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬

১০৯. Report of Superintendent of Police ; Bankura, dated 23.10.1948, Police File No. 777/42.

১১০. Report of the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, C.I.D. West Bengal, Police File No. - 777/42

১১১. বসু জ্যোতি, যতদূর মনে পড়ে , পৃ. ৮৯

১১২. পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬, বসু জ্যোতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯, মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬

১১৩. বসু জ্যোতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

১১৪. A Short note on Geeta Banerjee nee Mitra nee Mukherjee, SG/26.4.56,Police File No. - 3890/49

১১৫. 'চটকলের মেয়েরা', শীর্ষক প্রবন্ধে গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন ঘরে বাইরে, ১৩৫৯

১১৬. I.B. Officers Reported dated 30.3.1995, Police File No.- 619/36

১১৭. A Brief Note Usha Chakraborty; File No. 789(46)

১১৮. Police File No. - 789/46

১১৯. বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, পৃ. ২২১

১২০. চক্রবর্তী জ্যোতি রচনা সংগ্রহ, 'পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি', ১৯৮৮, পৃ. ৫১

১২১. মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২

১২২. বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্যখ্রিষ্টাব্দের পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪৫৯

১২৩. গণশক্তি, ১৯৭৪, ১লা মার্চ

চতুর্থ অধ্যায়

খাদ্য সমস্যা এবং বামপন্থী নারী : (১৯৪৭-১৯৭৭)

ব্রিটিশ রাজত্বে ঔপনিবেশিক শাসনে বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়েছে বহুবার। আর সেই দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার তাগিদ থেকেই স্বাধীনতা লাভের কিছু পূর্বে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মহিলারা এগিয়ে এসে গড়ে তুলেছিলেন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। দুর্ভিক্ষের সংকট মোচনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই খাদ্য আন্দোলন ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের জন্য রিলিফ আন্দোলনে মহিলারা আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীনতার পরও খাদ্য সংকট অব্যাহত ছিল। তবে ১৯৪৩সালের মন্বন্তরের মত না হলেও ১৯৪৭-১৯৭৭ এই সময়কালে প্রায় সারা বাংলা জুড়েই এই সংকট মাঝে মাঝেই তীব্র আকার ধারণ করেছিল। তাই, এই পর্যায়ে মহিলাদের অন্যতম প্রধান কর্মকাণ্ড ছিল খাদ্য সমস্যার সাথে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে।

রেশনিং ব্যবস্থা ও বামপন্থী মহিলাঃ

আলোচ্য সময়কালের একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল রেশন ব্যবস্থা। রেশনিং ব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে সেজন্য বামপন্থী মহিলারা প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিলেন বলে তথ্য থেকে জানা যায়। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গঠনের সময় থেকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের সেবা করার জন্য বামপন্থী মহিলারা কলকাতার বস্তি এবং গ্রামের দরিদ্রদের মধ্যে কাজ করতে থাকেন। রেশনের দোকানের লাইনে যথাযথভাবে মহিলাদের দাঁড় করানো, বিধিমত জিনিস যাতে মহিলা ক্রেতারা পান সে ব্যবস্থা করতেন মহিলা নেত্রী ও কর্মীরা। জানা যায় ১৯৪৩সালে সমগ্র কলকাতা শহরে রেশনের দোকান ছিল পঞ্চাশ (৫০)টি। কলকাতা শহরের জনসংখ্যা ছিল কুড়ি (২০) লক্ষ। এই ৫০টি দোকান থেকে মানুষদের খাদ্য দেওয়া হত।[১] ফলে রেশনের দোকানের সামনে লাইন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হওয়ায় সমস্যা দেখা দেয়।

রেশনের দোকানের স্বল্পতার কারণে সমস্যা সমাধানের জন্য মহিলারা ঠিক করেন সংসদ অভিযানের। ১৯৪৩ সালের ১৭ই মার্চ আইনসভার অধিবেশন চলাকালে কলকাতার বস্তিবাসী এবং উত্তর দক্ষিণের শহরতলীর পাঁচ হাজার মহিলা শোভাযাত্রা করে বিধানসভার অভিমুখে যান। নেতৃত্বে ছিলেন মণিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী, গীতা মল্লিক, এলা রীড ও কমলা চট্টোপাধ্যায়

প্রমুখ।[২] মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও মুসলিম মহিলা আত্মরক্ষা লীগ যৌথভাবে এই মিছিল সংগঠিত করেন। জানা যায় উভয় সমিতির বামপন্থী মহিলারা এ ব্যাপারে অগ্রণী হন।[৩]

মহিলা নেত্রীরা আইনসভার কার্ড জোগাড় করে ভেতরে ঢুকলে দুটো গেট দিয়ে বাকী মহিলারা নেত্রীদের সঙ্গে আইনসভায় প্রবেশ করেন। তখন ফজলুল হক ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মহিলাদের কাছে সমস্যার কথা জানান। অসামরিক দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী সন্তোষ বসু জানান অন্য রাজ্য থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা যায়নি। কেন্দ্র না এগিয়ে এলে তাঁরাও অসহায়। অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের সচিব মিঃ পিনেল বলেন— "চাষীরা খাদ্য মজুত করছে। তাদের ধরতে না পারলে, বাজার থেকে সব খাদ্য উধাও হবে।"[৪] কিন্তু মেয়েরা না দমে আঁচলের পয়সা দেখিয়ে বলেন— "আমরা ভিক্ষা চাইতে আসিনি। আমরা যে দামে চাল কিনতাম সেই দামে চাল দিন। আমরা কিনে নেব।"[৫] বাধ্য হয়ে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকবস্তা চাল আনিয়ে মেয়েদের মধ্যে বন্টন করে দেন। রেশনের দাবিতে বামপন্থী মহিলাদের নেতৃত্বে এটাই ছিল পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মিছিল। জানা যায় এই অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতন কলকাতায় প্রথম ১৬টি ন্যায্য মূল্যের চালের দোকান খোলা হয় এবং সরকার থেকে কয়েকটি বড়ো ক্যান্টিনও চালু হয়, যেখান থেকে পাড়ার ক্যান্টিনগুলোতে খিচুড়ি পাঠানো হত।[৬] কাজেই বলা যায় বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থা চালু করার পেছনে মহিলাদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল।

কলকাতার মিছিলের সফলতা জেলায় জেলায় মহিলাদের উৎসাহিত করে। মহিলারা রেশনের দাবিতে ভুখা মিছিল সংগঠিত করতে থাকেন। যেমন- ১৯৪৩ সালের ১৩ই মার্চ বাঁকুড়ার প্রায় চারশত জন মহিলা ভুখা মিছিল করে জেলা শাসকের কাছে যান। মূলত রেশন দোকান খোলার দাবি নিয়ে। তাতে কিছু ফল না হওয়ায় মহিলারা পুনরায় ১৫ই মার্চ মিছিল করেন। তাতে কিছু দাবি আদায় করতে না পারায় ২৭শে মার্চ একহাজার মহিলা জেলা শাসকের কাছে গেলে জনগণের চাপে জেলা শাসক ৫টি রেশনের দোকান খুলে রেশনের পরিমাণ ঠিক করে কার্ড বিলি করতে রাজী হন। আর রেশনের বন্টন ব্যবস্থা যাতে ঠিক থাকে তা দেখার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মধ্য হতে স্বেচ্ছাসেবিকা হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।[৭] ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে পাবনার ৬০০ মহিলা ভুখা মিছিল করে জেলা শাসকের কাছে যান। জানা যায় জেলাশাসক মহিলাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। ফলে, মহিলারা ফিরে এসে টাউনহলে জমায়েত হয়ে একটি সভা করেন এবং শপথ নেন—"এবারে আমরা আসব ১০,০০০; তখন সরকারের টনক নড়বে।"[৮] ১৯৪৩ সালের ২৫শে মার্চ ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে দুইহাজার মহিলা খাদ্যের দাবিতে জেলা

শাসকের কাছে যান। জেলাশাসক তখনি নির্দেশ দেন গোপন চাল খুঁজে ফুড কমিটির মারফৎ ১৫ টাকা দামে বিক্রি করতে। স্বেচ্ছাসেবকরা ২৫০০ মণ চাল এবং ৫০০মণ ধানের গোপন মজুত উদ্ধার করেন চরমাগুরিয়া ও মাদারীপুরের বাজার থেকে। ১৯৪৩ সালে বরিশালে ফুড কমিটির ডাকে পৌরসভার অফিসে একটি সভা হয়। এই সভায় অনেক মহিলা যোগ দেন এবং শহরের বিভিন্ন এলাকায় সস্তায় খাদ্য শস্যের দোকান খোলার দাবি জানান। এইভাবে মহিলারা প্রথম পর্বে খাদ্য সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হন এবং তা সমাধানের উপায় হিসাবে যথাযথ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপর জোর দেন।

১৯৪৮-সালে সরকারি হিসাব অনুযায়ী ৩৬লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছিল, যার মধ্যে কাগজে কলমে ৩১শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছিল রেশনের মাধ্যমে বন্টনের জন্য। কিন্তু সরকার বাস্তবে রেশন মারফৎ বন্টন করেছিল মাত্র ৪লক্ষ ৬৭হাজার। ফলে রেশন ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়ে। পরবর্তী বছরগুলিতে অবস্থা আরো ভয়াবহ হয়ে উঠে। ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫২ সালে রেশনের মাধ্যমে খাদ্য বন্টন করা হয়েছিল যথাক্রমে মাত্র ১লক্ষ ৩৫হাজার টন, ৩ লক্ষ ৭০হাজার টন এবং ২লক্ষ ৭০হাজার টন।[৯] তাই, যথাযথ রেশন ব্যবস্থা চালু করার উপর জোর দেন বামপন্থী মহিলারা। রেণু চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন — "আমাদের কাজের প্রথম ধাপ ছিল লড়াই — রেশন আর কন্ট্রোল দোকানের জন্য লড়াই। কিন্তু এ আর কতটুকু বিপুল ক্ষুধার সমুদ্রে। কন্ট্রোলের দোকানগুলি ছিল অসাধুতার এক একটি পচা মলকুণ্ড। সেখান থেকে গ্রাহকরা যাতে ঠিকমত তাদের প্রাপ্য পায় তারজন্য সমিতির কর্মীদের বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে চলে সমিতির নিজস্ব কাজ লঙ্গরখানা খোলা, ধান-চাল সংগ্রহ করা, দুগ্ধ কেন্দ্র চালানোর কাজ ইত্যাদি। এবং এইসব কাজ করতে হত অতি দ্রুত গতিতে কারণ বুভুক্ষার মরণ খেলার সাথে মোকাবিলার লড়াইয়ে বড় কথা হল সময়।"[১০]

মণিকুন্তলা সেন— 'সেদিনের কথা' তে লেখেন "একটা উল্লেখযোগ্য কাজ আমরা এইসময়ে করেছিলাম। এই ভিক্ষার চাল আর ক্যান্টিনের খিচুড়ি খাইয়ে লোক বাঁচানো যাবে না। চালের দাম কমাতেহবে এবং রেশন দোকান খুলতে হবে। এজন্য আন্দোলনের পথে নামতেই হবে— এটা বুঝে আমরা সেই আয়োজনে লেগে গেলাম।"[১১] কাজেই বোঝা যায় প্রাক্ স্বাধীনতাপর্বে খাদ্য সমস্যার সমাধানে বামপন্থী মহিলারা কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়িত করেন।

স্বাধীনতার পরেও খাদ্য সমস্যা দেখা দিলে বামপন্থী মহিলাদের এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসার সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন- ২৯.১.১৯৪৮-এ মণিকুন্তলা সেনের নেতৃত্বে রেশনের

দাবিতে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান হয় বলে পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়। ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ্ পুলিশের দেওয়া গোপন রিপোর্টে লেখা হয়— "On 29.1.48 She (Manikuntala Sen) with other C.P.I Workers led about 1200 Women to Writers Buildings to protest against existing ration quota and on the 'assurance given by the premier that the ration cuts would soon be restored. She remarked that they were not prepared to hear any excuse and that the Govt. which failed to feed their country men should resign."[১২] ৮.৩.১৯৪৯ তারিখে মণিকুন্তলা সেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের সময় সরকারের তরফে যে যে ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় তার মধ্যে রেশনের দাবিতে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অভিযোগে লেখা হয় — "That on 29.1.48 you with other C.P.I Workers led a rowdy demonstration before the Writer's Buildings."[১৩]

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের মণিকুন্তলা সেন খড়্গাপুরে রেলওয়ে কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রেশনের দাবিতে আন্দোলন করেন বলে জানা যায়। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য যে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তারমধ্যে এটি ছিল অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণরের পক্ষ থেকে মণিকুন্তলা সেনের বিরুদ্ধে অভিযোগে লেখা হয় — "That under order from the party you went to live at Kharagpur in January /February of 1949 under the assumed name of Bina Devi, a cousin sister of one Shanti Ranjan Chanda with the view to organise the women labourers and workers of the locality and also to find support for the Proposed General Railway Station on 9th March 1949 and has been working on organisational work for the Party.

That on the 8th and 9th February 1949 you organised a procession of ladies to meet the C.M.E. to ventilate the grievances of the Railway Employers, families for curtailment of Ration Concession."[১৪]

খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য মেদিনীপুর জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা ঊষা চক্রবর্তী যে উদ্যোগী হন তা পুলিশের গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যায়। রিপোর্টে লেখা হয় —"The agent further informs that Usha Chakraborty has recently requested Janaki Acharji of Jankapur, PS- Danton – Secretary of the local MARS to revive the

Milk Canteen by taking fresh indent of dry milk from the Red Cross Society.

The agent further reports that Usha Chakraborty Secretary, Dist.- MARS has since issued instructions to all the Primary Committees of the MARS to launch agitation over the cloth and food problems which have since assumed acute stage in the district. The Primary Committees have been instructed to approach the middle and the poor class women on the issue of cloth problem first as it is likely to attract them very easily. After recording the sympathy of poor women of the area they should proceed with the agitation."[১৫] তাই, দেখা যায় স্বাধীনতার পর মহিলারা মূলত খাদ্য সমস্যার সমাধানের উপর বিশেষ জোর দেন।

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। নির্বাচনের পর খাদ্য সংগ্রহ ও গণ বন্টন ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকরী না হওয়ায় কিছু অঞ্চলে খাদ্যসংকট দেখা দেয়। খাদ্যসংকটের ফলে বর্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা দেখা দেয় বলে জানা যায়। তাই, খাদ্য সংগ্রহ ও বন্টননীতি সঠিকভাবে সরকার যাতে রূপায়িত করে সেজন্য মহিলারা যেমন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে আন্দোলন করেন তেমনই অন্যান্য গণসংগঠনের সঙ্গেও যুক্তভাবে খাদ্য আন্দোলন পরিচালনা করেন। এই আন্দোলন বিষয়ে আলোচনার জন্য ১৯৫৩ সালের ১২ই এপ্রিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মহিলা নেত্রীরা কলকাতায় একটি বৈঠকে সমবেত হন। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গণ-সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সর্বদলীয় মহিলা সংযোগ কমিটি গঠন করার। নারী সমাজের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে এই কমিটি আন্দোলন করার কথা ঘোষণা করে। যে সমস্ত দাবি নিয়ে আন্দোলন করার কথা বলা হয় তার মধ্যে খাদ্য পরিস্থিতির উপর যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচী ছিল অন্যতম। সর্বদলীয় মহিলা সংযোগ কমিটির যুগ্ম আহ্বায়িকা হন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কমলা মুখার্জী ও বলশেভিক পার্টির সুধা রায়। এছাড়া কমিটির মধ্যে ছিলেন সোস্যালিস্ট পার্টি, আর.এস.পি., আর.সি.পি.আই., এস.আর.পি, এস.ইউ.সি, ফরোয়ার্ড ব্লক, কমিউনিস্ট পার্টি এবং নির্দলীয় মহিলা প্রতিনিধিরা। এই কমিটির দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতার ১৬/১৭কলেজ স্ট্রিটে। এই সর্বদলীয় মহিলা সংযোগ কমিটির মূল লক্ষ্য হয় খাদ্য সমস্যার সমাধান।[১৬]

খাদ্যের দাবিতে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র নেতৃত্বে জেলায় জেলায় আন্দোলনের সংবাদ পাওয়া যায়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি আসন্ন দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মেদিনীপুরের

তমলুক, নন্দীগ্রাম, ও শিবপুর ইত্যাদি অঞ্চলে খাদ্যের দাবীতে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করে।[১৭] বামপন্থী মহিলা নেত্রী গীতা মুখার্জির লেখা 'একটি মিছিল' শীর্ষক প্রবন্ধে তমলুক মহকুমায় খাদ্যের জন্য মহিলা সমিতির উদ্যোগের কথা জানা যায়। মেদিনীপুর জেলা কৃষক সমিতির সাথে মহিলা সমিতি একযোগে খাদ্যাভাব দূরীকরণে এগিয়ে আসে। বাবু খাঁবাড়, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল, সূতাহাটা, সোনাচূড়া প্রভৃতি এলাকার মানুষ খাদ্যের জন্য হাহাকার করতে থাকে। গীতা মুখার্জি লেখেন — "নন্দীগ্রামের কৃষকেরা বাসনপত্র, ছাগল, হাঁস এমনকি হালগরু পর্যন্ত বিক্রি করেছেন ক্ষুধার অন্ন জোটাতে, এখন ঘরে ঘরে চলছে অনশন। মহিষাদলে নন্দীগ্রামে মায়েরা গলায় দড়ি দিতে শুরু করেছেন। সূতাহাটায় নন্দীগ্রামে শালুক শেষ হয়ে বিষাক্ত চিকার মূল খাওয়া চলেছে। চারদিক থেকে উঠেছে হাহাকার।"[১৮] সমস্যার সমাধান করার জন্য কৃষক কর্মীদের সাথে মহিলারা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে গিয়ে বাড়ি বাড়ি সংগৃহীত করেন তথ্য— পরিবারের বিস্তৃত অবস্থা, কজন উপার্জন করেন, কত পোষ্য, কত দিনের ধান আছে কতদিন চলতে পারে ইত্যাদি। বেশ কয়েকদিন ধরে বিমলা মাজী, নির্মলা সান্যাল—এঁরা ঘরে ঘরে গিয়ে তথ্য জোগাড় করেন। মিছিলের আগে বিভিন্ন জায়গায় হয় প্রস্তুতি বৈঠক।

১৯৫৩ সালের ১৫ই জুন খাদ্যের দাবিতে মিছিলে তমলুক কোর্টে এস.ডি.ও-র দপ্তরে প্রায় চার হাজার নরনারীর উপস্থিতির কথা জানা যায়। এস.ডি.ও অনুপস্থিত থাকায় ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে ডাকা হয় কৃষক সমিতি, মহিলা সমিতি, যুব সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের কাছে। প্রতিনিধিদের দাবি ছিল - সের দরে চাল ও আটা কেনবার শক্তি নেই অধিকাংশ লোকের। তাই, সস্তাদরে খাদ্য চাই। প্রতিনিধিরা দেখান তথ্য - যা কয়েকদিন ধরে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে জোগাড় করেছেন মহিলারা। তাতে দেখা যায় যে গ্রামে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে শতকরা ৫০জনের সপ্তাহে কয়েকদিন উপবাস। অফিসারটি প্রতিনিধিদের কথা শুনে সদর দপ্তরে জানাবার আশ্বাস দেন। আর বলেন— "স্বাধীন সরকার কাউকে না খেয়ে মরতে দেবে না।"[১৯]

বামপন্থী নেত্রীদের লেখার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সেই সময়কার অভিজ্ঞতার কথা। গীতা মুখার্জীর কথায় — "তাঁদের কথা বলবার জন্য ডাক দিলাম আমি। ফেটে পড়ল কথার, কান্নার আর দাবির বাঁধ। দেড়হাজার মেয়ে সবাই দাঁড়িয়ে উঠতে চান। ৭০ বছরের ন্যুব্জদেহ 'মা' 'বাবা আমাকে বাঁচাও আমি কদিন খেতে পাইনি' বলে টেনে ধরেন অফিসারটির কোটের কোণ। দলে দলে মেয়ে ইতিমধ্যে ঘিরে ধরেছেন তাঁকে। অতিশীর্ণ একটি কঙ্কালসার শিশুর মা আমার কোলে শিশুকে দেন তুলে উঁচু করে দেখিয়ে দিতে, দুধ তো স্বপ্ন, ফেনও জোটে না, কেমন করে একে

বাঁচাবেন? কুঁকড়ে যাওয়া শিশুটি আমার দুহাতের ওপর জনতার মাথার ওপরে জেগে ওঠে সমবেত প্রশ্নের চিহ্নের মত। সস্তা চাল না পেলে কেমন করে বাঁচবে? তুলসী মাসীর তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বরে জেগে ওঠে মধ্যবিত্তরা এই আয়ে কেমন করে বাঁচবে? মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান ঘোমটা দেওয়া মুসলমান ঘরের বৌ, এতদূর এসেছেন না খেয়ে।”[২০]

মহকুমার দপ্তর থেকে কোন দাবি আদায় না হওয়ায় ক্ষরা বারোয়ারীতে সকলে মিটিং-এ বসেন। কৃষক সমিতি ও মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হয়। বক্তৃতার শেষে প্রস্তাব আসে ১৫দিনের মধ্যে সরকারের কাছে যে দাবি পেশ করা হয়েছে তা পূরণ না হলে আবার এস.ডি.ও-র দপ্তর ঘেরাও করা হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কেউ উঠবে না। মহিলাদের আসার কথা জিজ্ঞাসা করলে দেড়হাজার হাত নিমিষে উঁচুতে উঠে। মিটিং শেষে সিগারেটের কৌটোর এক কৌটো করে মুড়ি দেওয়া হয় শুধুমাত্র মহিলাদের। এইরকম মুড়ি খেয়ে ১২ নং ইউনিয়নের মেয়েরা বলে ওঠেন— “মা এমন ভাল অনেকদিন খাইনি।”[২১]

বাগনান থেকে নীরু চ্যাটার্জীর লেখা থেকেও বাগনানে খাদ্যের জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির আন্দোলনের কথা জানা যায়। বাগনানে চালের সের আনা। ফলে, ঘরে যা ছিল সবকিছু শেষ করেও মানুষের প্রাণ বাঁচানো কষ্টকর হয়ে ওঠে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির স্থানীয় কমিটি ঠিক করে এই দুরবস্থা দূর করার জন্য কৃষক সমিতির সাথে সাথে গ্রামের মেয়েদের নিয়ে এস.ডি.ও-র কাছে দাবি জানাতে যাবেন। সেজন্য একমাস ধরে ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের সাক্ষর সংগ্রহ করা, প্রতিটি পরিবারের তথ্য নেওয়া, বৈঠক এবং সভা করা হয় বলে জানা যায়। একই সঙ্গে চলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভ্যা করা। এমনি করে একমাস প্রস্তুতির পর ১৯৫৩ সালের ৪ঠা জুলাই ১০ মাইল পথ হেঁটে মহিলারা কৃষক সমিতির সাথে উলুবেড়িয়ায় মহকুমা হাকিমের কাছে দাবি জানান।[২২] উপরের মিছিলগুলি থেকে বোঝা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসংকট তখন প্রায় সর্বত্র দেখা দিয়েছিল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এই সংকট মোচনে এগিয়ে এসেছিল। তবে এই পর্যায়ে সমিতি এককভাবে কোন কর্মসূচী পালন না করে অন্যান্য গণসংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে কর্মসূচী পালন করে।

রেশনের চালের দাম সের পিছু দুই আনা বাড়ানোর প্রতিবাদে ১৯৫৩সালের ২১শে সেপ্টেম্বর কলকাতা ও শহরতলির বেশ কিছু মহিলা মিছিল করেন। পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত রিপোর্টে লেখা হয় —"21.9.53- 11.30 hrs. and 13.15hrs. about 700 ladies of "Mahila Atma Raksha Samity and few youths assembled at the Wellington Square. They came

from Beliaghata, Shyam Bazar, Ballyganj and other places at the City in different batches. Amongst them Gita Mukherjee and other were prominent. Manikuntala Sen gave a short speech at 14.00hrs. Where from a deputaton of 12 ladies from the procession of whom Gita Mukherjee and other were known, went to the office to meet with the authority of the food department. As the food minister was seriously engaged in some urgent work, so they were instructed to see him at Writers Buildings on 22.9.53 at 10.00 hrs. They demanded (1) good quality of rice 7 Rs. per seer instead of 9 Rs., (2) free distribution of milk for the poor Children, (3) free distribution of rice for the people of distressed areas and rice 10 Rs. per maund for the rural area. They also requested the procession to stand against this govt. and to go with their movements until their demands were fulfilled. Gita Mukherjee asked the people to join the rally of S.D.P.O. which would be held on 28.9.53 at the Calcutta Maidan.[২৩]

'ঘরে বাইরে' তে ২১শে সেপ্টেম্বরের মিছিলের বিবরণ লেখেন মিছিলে নেতৃত্বদানকারী বামপন্থী মহিলা নেত্রী গীতা মুখার্জী। 'একুশে সেপ্টেম্বর' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন— "একুশে সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে জুটতে শুরু করেছেন মেয়েরা কয়েকমাস হল কলকাতা শহরে রেশনের চালের দাম বেড়েছে সের পিছু দুই আনা। সবচেয়ে দরকারী এবং একান্ত অপরিহার্য্য এই খাদ্যটির উপর ট্যাক্স বসিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১ কোটি ৪০লক্ষ টাকা চান। সেই ট্যাক্সের চাপে এদিকে ত্রাহি ডাক ছাড়ছেন ঘরের গৃহিনীরা। তার ওপর আবার পচা চালে ডাক্তারের খরচ বাড়ছে। তাই পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ডাকে আজ মহিলা মিছিল বেরিয়ে দাবি করতে যাবেন খাদ্যদপ্তরে— তাঁদের সর্বনিম্ন দাবী: ১) পচা চাল খাব না, ২) বাড়তি দাম দু আনা দেব না, ৩) গ্রাম ও শহরের দুঃস্থদের রিলিফ চাই, ৪) বেকার ও বাস্তুহারাদের কাজ চাই, ৫) শিশুদের জন্য বিনামূল্যে দুধ চাই।"[২৪] গীতা মুখার্জির বিবরণী থেকে জানা যায় এই মিছিলকে সার্থক করার জন্য মহিলারা পাড়ায় পাড়ায় সভা করে মহিলাদের এমনকি ঘরের পুরুষদের উৎসাহিত করেন। কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী জরুরী কাজ থাকায় মহিলা প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা না করে পরের দিন ১০টায় দেখা করার কথা বলেন। ডেপুটেশনের রিপোর্ট শুনে মহিলারা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামার প্রতিজ্ঞা করেন।[২৫]

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ৩-৪মে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ষষ্ঠ সম্মেলনে যে বিষয়গুলির উপর আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে খাদ্য সমস্যার সমাধান ও জীবিকার দাবী ছিল অন্যতম। অনুরূপভাবে, ১৯৫৪ সালের ৩-৫ এপ্রিল কলকাতায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সপ্তম সম্মেলনে সম্পাদিকা কনক মুখার্জীর পেশ করা রিপোর্ট থেকে ১৯৫২-৫৪ এই দুই বছরে মহিলাদের কর্মসূচীগুলি সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞাত হওয়া যায়। জানা যায়, এইসময় মহিলাদের প্রধান দাবি ছিল খাদ্য ও রিলিফের দাবি।

বিভিন্ন সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণের পাশাপাশি মহিলারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে সরব হন তা 'ঘরে বাইরে' তে প্রকাশিত লেখা থেকে জানা যায়। বালিগঞ্জ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে ১৯৫৬ সালের ২০শে জুন এক নতুন ধরনের অভিযান শুরু হয়। রিপোর্টে লেখা হয় "বিকাল ছয়টায় ২০জন মহিলা বাজারের থলি লইয়া বাজার করিতে আসেন। প্রত্যেকের থলিতে একদিকে ছয়মাস পূর্বের দ্রব্যমূল্য লেখা থাকে এবং আর এক দিকে বর্তমান দর লেখা থাকে। উপস্থিত সকলের ইহাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাইতে থাকে। দুইটি গেটে সরকারের নিকট ন্যায্যমূল্যের দোকানের আবেদনে এক ঘন্টার মধ্যে পাঁচশত সহি সংগৃহীত হয়। অনুরূপভাবে কালিঘাট বাজারে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির প্রতিবাদে মহিলারা রেশন ব্যাগ লইয়া বাজার করিতে যান এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলিবার দাবীতে সহি সংগ্রহ করেন। ইন্টালী বাজারেও অনুরূপভাবে সহি সংগ্রহ চলে। মোট সহি সংগৃহীত হয় অন্যূন ৩০০০।"[২৬] এর থেকে বোঝা যায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য মহিলারা নানা ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

১৯৫৬ সালে খাদ্যের সংকট বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। একদিকে যেমন চাল, ডাল, সরিষার তেল, লবণ, চিনি, কেরোসিন তেলের দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন হয় অন্যদিকে তেমনি খাদ্য আন্দোলনও সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৫৬ সালের ১৫ই জুলাই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সম্মেলনে মহিলা সমিতি যোগ দেয়। ৩১শে আগস্ট রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি গণ-দরখাস্ত ও গৃহিনীদের স্বাক্ষরসহ দু'হাজার পোস্টকার্ড পাঠানো হয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য কমাবার দাবি জানিয়ে। কলকাতার কয়েকটি বাজারের মধ্যে গিয়ে কর্মীরা স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। প্রায় এগার হাজার স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়। এইসময় বিভিন্ন মহিলা সংগঠন যুক্তভাবে একটি শোভাযাত্রা করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানায় বলে জানা যায়।[২৭]

১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন হয় ভারতে। এই নির্বাচনের পর বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি জেলার মধ্যে প্রায় ১২টি জেলাতেই দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দেয়। বিশেষ করে বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি বন্যা বিধ্বস্ত জেলাগুলিতে খাদ্য সংকট গভীর হয়। মানুষের প্রয়োজন হয় রিলিফ ও লঙ্গরখানার। এইরকম পরিস্থিতিতে ১৯৫৭ সালের ৩০শে মে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির ডাকে রাজ্যব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়। ১৯৫৭ সালের ২৮শে জুন খাদ্যের দাবিতে ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিধানসভা অভিযান হয়। ঐ বছরই ১৮ই সেপ্টেম্বর দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটির ডাকে বিভিন্ন দল ও গণ সংগঠনের সদস্যরা খাদ্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং আইন-অমান্য করে কারাবরণ করেন বলে জানা যায়। এঁদের মধ্যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যরাও ছিলেন।[২৮]

১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় খাদ্য সংকটের কথা জানা যায়। এই সংকট মোকাবিলা করার জন্য পুনরায় আইন অমান্য কর্মসূচী সংগঠিত হয়। বিভিন্ন জায়গায় সভা সংগঠিত হতে থাকে এবং সরকারের খাদ্যনীতির সমালোচনা করা হয়। পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৭.৩.১৯৫৮তারিখে হাজরা পার্কে সি.পি.আই-এর উদ্যোগে একটি সভা হয়। খাদ্য সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে এই সভা আহুত হয় বলে জানা যায়। অমর বসু,হরেকৃষ্ণ কোনারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বামপন্থী মহিলা নেত্রী মণিকুন্তলা সেন। সকলে কংগ্রেসের খাদ্যনীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির জন্য তারা সরকারকে দায়ী করেন বলে জানা যায়।[২৯]

১৯৫৮ সালের ৪ঠা জুন বিভিন্ন মহিলা সমিতি যুক্তভাবে খাদ্যের দাবিতে বিধানসভা অভিযান ও অবস্থান করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে একটি স্মারক লিপি দেন বলে জানা যায়। বেশকিছু মহিলা কর্মী খাদ্যের দাবিতে আইন অমান্য করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। পাশাপাশি ১৯৫৮ সালে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর ও আয়ের উপর কর বৃদ্ধি ঘটার প্রতিবাদে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যরা স্বাক্ষর করা ১২ হাজার পোস্টকার্ড প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠান।[৩০]

১৯৪৭সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত খাদ্য সমস্যার সমাধানে নারীরা মূলত যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তা হল রেশনিং ব্যবস্থা। যথাযথ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করার লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা এককভাবে এবং অন্যান্য গণসংগঠনের সাথে যৌথভাবে সরকারের কাছে দাবি

দাওয়া উত্থাপন করেন। পাশাপাশি জীবিকার দাবিও নারীদের কর্মসূচীর মধ্যে বিশেষ স্থান নিয়েছিল। আর এই সমস্ত দাবি আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে বামপন্থী মহিলা কর্মীরা সাধারণ মহিলাদেরও নিজেদের বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে অঙ্গীভূত করেছিলেন। তাই সরকারের কাছে শুধুমাত্র নিজেরা নন, সমস্ত মহিলা কর্মীদের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র পেশ করেন।

১৯৫৯ সালের খাদ্য সংকট ও বামপন্থী নারীদের ভূমিকা :

১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের পশ্চিমবাংলায় সর্বত্র দারুণ খাদ্যাভাব দেখা যায়। এক বিস্তৃত সময়কাল জুড়ে বাংলার শহর ও গ্রামাঞ্চলকে ক্রমাগত অস্বাচ্ছন্দ্যের ও সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সারা বাংলা জুড়েই খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করায় দলে দলে গ্রামবাসীরা কলকাতার ফুটপাতে আসতে শুরু করে বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলস্বরূপ, এই খাদ্য সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি নানা গণসংগঠনের এগিয়ে আসার সংবাদ পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী মহিলারা এই খাদ্য আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন বলে জানা যায়। এই পর্যায়ে বামপন্থী মহিলাদের প্রধান কর্মকাণ্ড ছিল খাদ্য সমস্যার সাথে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে।

১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমবাংলায় চালের দর অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায় বলে জানা যায়। ১৬টি জেলার মধ্যে ১০/১২টি জেলাতেই খাদ্য সঙ্কট দেখা যায়। বিশেষকরে বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি বন্যা বিধ্বস্ত জেলাগুলিতে খাদ্যের অভাব দেখা দেয় বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। চালের দুষ্প্রাপ্যতা যে বাড়ে তা দৈনিক সংবাদপত্রগুলির থেকে জানা যায়। যেমন ৩.১.১৯৫৯ তারিখে 'দৈনিক বসুমতি'-তে লেখা হয় "শহরের অধিকাংশ আড়ত হইতে চাল উধাও।"[৩৮] ১.১.৫৯ তারিখে 'স্বাধীনতা'-তে প্রকাশিত হয় "ধান চালের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ চালু হবার আশঙ্কায় অধিকাংশ আড়ত হতে চাল উধাও।"[৩৯] ২.১.৫৯ তারিখে 'যুগান্তর'-এ লেখা হয় "নির্দিষ্ট দর চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজার হইতে চাল উধাও।"[৪০]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হয়েছে রেশনিং এবং খাদ্যশস্যের ওপর থেকে সমস্ত কন্ট্রোল তুলে নেওয়ায় দরকার ছিল ১৯৪৩-৫৩ এই দশ বছরের অভিজ্ঞতা অনুসারে খাদ্যশস্যের পাইকারী বাজারের জাতীয়করণ। পরিকল্পনা অনুসারে যখন মূলধন বিনিয়োগ ও মুদ্রাস্ফীতি ঘটানো হয়, তখন পাইকারদের হাতে বাজার থাকলেই মজুতদারী শক্তিশালী হতে বাধ্য। ফলে ১৯৫৪সালে দর কিছু কমেই ১৯৫৫ সালে অবাধে মজুতদারী ও

মুনাফা শুরু হয়। গ্রামে গ্রামে এত খাদ্য সংকট দেখা দেয় যে, সক্ষম অথচ অনাহারক্লিষ্ট জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে টেস্ট রিলিফের কাজে খাদ্যে মজুরী দেওয়া হয়। অক্ষম দুঃস্থদের খয়রাতি খাদ্য দেওয়া হয় এবং ন্যায্য মূল্যের দোকানের মারফৎ কিছু খাদ্য বিক্রিও করা হয় কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ।

১৯৫৬ সালে খাদ্যসংকট আরো গভীর হয়। সরকারী হিসেবে এইবছর আভ্যন্তরীণ ঘাটতি ছিল মাত্র সাড়ে চারলক্ষ টন। বাইরে থেকে শুধু গমই আমদানি করেছিল ৩লক্ষ টনের বেশি। গ্রামে এবং শহরে পারিবারিক কার্ডের ভিত্তিতে সংশোধিত রেশনও চালু হয়। তা সত্ত্বেও খাদ্যশস্যের দরের সূচক সংখ্যা ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরে যেখানে ছিল ৩৮৫ সেখানে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে হয়ে যায় ৫৩২। এই তীব্রতর খাদ্য সংকটের মূল কারণ ছিল বিনিয়ন্ত্রণ ও অবাধ মুনাফা।

১৯৫৭ সালে যা ঘাটতি হয়েছিল কেন্দ্রীয় সাহায্যে তা প্রায় মিটে গিয়েছিল। কিন্তু খাদ্যশস্যের ফাটকা কারবার বেড়ে যাওয়ায় ১৯৫৮ সালে খাদ্য সংকট আবার তীব্র হয়। তার সাথে সরকার সমস্ত জেলার কর্ডন তুলে দেওয়ায় খাদ্যের দাম বৃদ্ধি পায়। সরকারি হিসাব অনুসারে চালের দাম আগস্টে হয় ২৮ টাকা, সেপ্টেম্বরে ২৯ টাকা মন। ১৯৫৯ সালে খাদ্যসংকট আরো তীব্রতর হয়। সরকার ধান চালের ক্রয় বিক্রয়ের ন্যূনতম ও উচ্চতম মূল্য বেঁধে দিয়ে সে মাসেই তাড়াহুড়ো করে সে আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়। মিল মালিকদের ওপর ২৫ শতাংশ লেভীর আদেশও প্রত্যহার করে নেয়। কর্ডনও ও রেশনিং কিছুই না থাকায় সবকিছুই হয়ে উঠেছিল বিনিয়ন্ত্রিত। ফলে ১৯৫৯ সালে খাদ্যে ঘাটতি ছিল প্রায় ১০লক্ষ টন। কেন্দ্রীয় সরকার তার থেকে বেশী প্রায় ১৩ লক্ষ টন খাদ্য সরবরাহ করে। তবুও দাম বাড়ে। কারণ, মজুতদারী বাড়ায় এবং মুনাফাকারীদের প্রাধান্য বাড়ায়। স্বাভাবিকভাবেই গ্রাম ও শহরের জনসাধারণের খাদ্য সংকট দেখা দেয়।[৪১]

চালের দুষ্প্রাপ্যতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কালোবাজারি শুরু হওয়ার যেমন তথ্য পাওয়া যায় তেমনি হুগলী, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় বহু অঞ্চলে ২৮ টাকা থেকে ৩০ টাকা মণ দরে চাল বিক্রীর খবর পাওয়া যায়।[৪২] কালোবাজারির সঙ্গে রেশনিং (গণবন্টন) ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার ফলে এই সঙ্কট ঘণীভূত হয় বলে তথ্য থেকে জানা যায়। ১৯৫৩ সালে ফসল উৎপাদন ভালো হওয়ায় সরকার রেশনিং তুলে দিয়ে খাদ্যশস্যের স্বাধীন চলাচল শুরু করার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তার ফলে ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৩

সাল পর্যন্ত কোন রেশনিং ব্যবস্থা না থাকায় কালোবাজারি বৃদ্ধি পায় ও খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয় বলে অনেকে মনে করেন।[৪৩] তবে রাজ্য সরকার তথা খাদ্যমন্ত্রী এই সঙ্কটের পেছনে অন্য কারণকে দায়ী করেছেন বলে তৎকালীন পত্র-পত্রিকা থেকে জানা যায়। যেমন-স্বাধীনতা পত্রিকায় প্রকাশিত 'খাদ্য চোরদের শায়েস্তা করা হইবে না?' শীর্ষক সম্পাদকীয় থেকে জানা যায় যে, এই দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির জন্য খাদ্যমন্ত্রী সরকারী কর্মচারীদের অযোগ্যতাকেই দায়ী করেছেন। খাদ্যমন্ত্রীর এই উক্তির প্রতিবাদ লোকসভাতেও উত্থিত হয় বলে জানা যায়। বামপন্থী সাংসদ শ্রীমতি রেণু চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলেন— "মজার কথা এই যে, কোন কিছু ঘটিলে অধঃস্তন কর্মচারীদের উপর দোষ চাপানো হয়।.... রাজ্য সরকার বিশেষতঃ খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সেনের বৃহৎ ব্যবসায়ী ও বৃহৎ মিল মালিকদের তোষণ নীতি বন্ধ না হইলে দেশের মানুষ খাদ্য পাইতে পারে না। এই মূল প্রশ্নটির সমাধান করিতে না পারিলে কলিকাতা ও মফঃস্বল শহরাঞ্চলে চাউলের চোরাবাজার বন্ধ করার সাধ্য কাহারো নাই, চাউলের কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা কেহই ঠেকাইতে পারিবে না।"[৪৪] তবে খাদ্য সঙ্কট যে সারা রাজ্যে দেখা দেয় তা সরকারি বিবৃতি থেকে বোঝা যায়। ১৯৫৮ সালের শেষদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক প্রেস নোটে ঘোষণা করেন—"১৯৫৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ ধান চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৯ সালের পয়লা জানুয়ারী হইতে বলবৎ হইতেছে।"[৪৫] সরকারের এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি ঘোষণা করার পর থেকেই চালের সঙ্কট যে বাড়ে, তা সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলির সংবাদ থেকে কিছুটা জানা যায়। খাদ্য সঙ্কট দেখা দিলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে এগিয়ে আসে তা পুলিশ ফাইলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়। ২৮.৫.১৯৫৯ তারিখে কলকাতার এ.বি.টি.এ হলে সমিতির উদ্যোগে একটি সভা হয় যার মুখ্য বিষয় ছিল খাদ্য সমস্যার সাথে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়[৪৬]।

এদিকে খাদ্য সঙ্কটের ফলে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে থাকে। 'স্বাধীনতা' পত্রিকা ছাড়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সহ বিভিন্ন পত্রিকায় ৮০জনের অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশিত হয়। ফলে খাদ্য সঙ্কট সমাধানের জন্য প্রজা সমাজতন্ত্রী দল ব্যতীত অন্য বামপন্থী দলগুলিকে নিয়ে গঠিত হয় মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি। এই কমিটির নেতৃত্বে প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন শুরু হয় ১৪ই জুলাই। তথ্যে উল্লেখ পাওয়া যায় প্রথম পর্যায়ের এই আন্দোলন চলেছিল ২০শে আগস্ট পর্যন্ত। প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল- বিভিন্ন জেলার কোর্টগুলিতে এবং স্থানীয় সরকারি অফিসে শান্তিপূর্ণ ভাবে স্বেচ্ছাসেবকদের সীমাবদ্ধ আইন অমান্য দ্বারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূচনা করা। এই সময়ের মধ্যে আইন অমান্য করে প্রায় ১,৬৩১জন

স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার বরণ করেন।[৪৭] এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য কয়েকটি জেলায় অন্যান্যদের সাথে বামপন্থী মহিলাদের অংশগ্রহণের সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন, ১৯৫৯ খ্রীঃ ৫ই আগস্ট মুর্শিদাবাদ জেলার জেলাশাসক বাংলোর সামনে প্রায় পনের হাজার বুভুক্ষু মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল বলে জানা যায়। এই জেলাতে রেভলিউশনারী সোসালিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া (আর এস পি) সক্রিয় থাকায় দিলীপ সিংহ, নিতাই গুপ্ত, নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও রাধারঞ্জন গুপ্ত প্রমুখদের সাথে আর এস পি-র মহিলা নেত্রী সুবর্ণলতা ভট্ট নেতৃত্ব দেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৮] তথ্য থেকে জানা যায়, অনেক মহিলাদের উপস্থিতি এই সমাবেশে হয়েছিল। ১৭ বছরের আর এস পি ছাত্রীনেত্রী ইপ্সিতা বিশ্বাস, মহিলা নেত্রী করুণাদেবীর টিয়ার গ্যাস ও পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৮] ৩০শে জুলাই কোচবিহারের মাথাভাঙ্গাতে দুইশতাধিক দুঃস্থ মহিলাদের একটি বিক্ষোভ মিছিল হয় মহকুমা আদালতের সম্মুখে। ১৯৫৯ খ্রীঃ ৫ই আগস্ট কোচবিহার জেলাতেও সমাবেশের তথ্য পাওয়া যায়। এই সমাবেশে পুলিশের গুলিতে নিহত হন বকুল ও বন্দনা নামে দুই মহিলা নেত্রী। এই হত্যার প্রতিবাদে পরের দিন পশ্চিমবাংলায় প্রতিবাদ দিবস পালনের কথা জানা যায়। মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচীর সূচনা হয়েছিল মেদিনীপুর জেলাকে কেন্দ্র করে। খেজুরী, গড়বেতা, ভগবানপুর, ঘাটাল, তমলুক, সুতাহাটা, কাঁথি প্রভৃতি জায়গায় কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন বিশ্বনাথ মুখার্জী, ভূপাল পাণ্ডা, সরোজ রায়, দেবেন দাস, সুকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে মহিলা নেত্রী গীতা মুখার্জী। খাদ্যের দাবিতে আট হাজার নরনারীর একটি সভা হয়। সভায় খাদ্যমন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করা হয় বলে তথ্যে পাওয়া যায়। চাল উধাও হওয়ায় ১৩ই মে স্থানীয় বিধায়ক নারায়ণ চৌবের নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কথা জানা যায়। 'স্বাধীনতা' পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, প্রথম পর্যায়ে পাঁচ সপ্তাহে জেলায় জেলায় সত্যাগ্রহ করে ১৬ শত মানুষ কারা বরণ করেছিলেন।[৪৯] 'অমৃতবাজার' পত্রিকা থেকে জানা যায় ১৯৫৯ সালে ৩১শে জুলাই খাদ্য আন্দোলনে প্রথম পর্যায়ে ৩,৫০০জন গ্রেপ্তার হন। এরমধ্যে ৪২১জন ছিলেন মহিলা।[৫০]

মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু হয় ২০শে আগস্ট। প্রথম দিনেই মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় বিভিন্ন আদালত ও বিডিও অফিসে আইন অমান্য করে ২৭ জন মহিলা সহ মোট ৪৭৯ জন স্বেচ্ছাসেবী গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে মধ্যরাত্রি থেকে কলকাতা ও শহতলীতে বিভিন্ন বামপন্থী দল ও

গণসংগঠনের অফিস খানাতল্লাশি করা হয়। বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে মহিলা আন্দোলনের নেত্রী গীতা মুখার্জিকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৫১] দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনে ১৯৫৯সালের ২২শে আগস্ট কলকাতায় ৭৩জন গ্রেপ্তার বরণ করেন। তারমধ্যে ৬জন ছিলেন মহিলা।[৫২] দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন তীব্র হওয়ার কারণ হিসাবে অনেকে মনে করেন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সাথে কমিউনিস্ট পার্টি যুক্ত হয়েছিল। জুলাই মাসের তিরিশ তারিখে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে শ্রী বঙ্কিম মুখার্জী, শ্রী নিরঞ্জন সেন এবং মহিলা নেত্রী মণিকুন্তলা সেন বাহান্ন পৃষ্ঠার এক স্মারকলিপি গভর্ণর ও রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করেন— যাতে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার এক চরম দুঃশাসন সৃষ্টি করছে এই মর্মে অভিযোগ করে সংবিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানানো হয়েছিল বলে তথ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৩]

চাঞ্চল্যকর সেই সকল অভিযোগের মধ্যে ছিল : সরকারী যন্ত্রের অপব্যবহার, দুর্নীতি ও অর্থের অপচয়, ট্যাক্সি, লরি, ট্রাক, বাস এবং কন্ট্রাক্ট ও সমবায় ঋণ বিতরণে স্বজনপোষণ, নির্বাচনে দলীয় স্বার্থে সরকারী শাসনযন্ত্রের অপব্যবহার, দলীয় স্বার্থে সরকারী রিলিফ কায়েমী স্বার্থকে পুষ্ট করার জন্য জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ, পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পেটোয়া যন্ত্রে পরিণতকরণ, কল্যাণমূলক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি শত্রুতা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনসংস্থা সমূহে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার দানে অস্বীকৃতি, তদন্ত কমিটি সমূহের রিপোর্ট ধামাচাপা দেওয়া, বিধানসভার সর্বসম্মত প্রস্তাবসমূহ অগ্রাহ্য করা, রাজনৈতিক বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা, মৌলিক অধিকার পদদলিত করার উদ্যোগ প্রভৃতি।[৫৪]

পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত খাদ্য সংকটের প্রশ্ন লোকসভাতেও উত্থিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট সদস্যরা শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীর মাধ্যমে অভিযোগ করেনঃ একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যের চালের মূল্যতালিকা কম। স্পীকার খাদ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের চালের মূল্য তালিকা পেশ করার নির্দেশ দেন। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহারের পর পশ্চিমবঙ্গে চালের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে।[৫৫] দ্বিতীয় পর্যায়ের আইন অমান্য আন্দোলন জেলায় জেলায় শুরু হয়। ১৯৫৯ খ্রীঃ ২১শে আগস্ট কলকাতায় শিয়ালদহ কোর্টে ৮জন নারীসহ ৭৬ জনকে এবং আলিপুর জেলা কোর্টে ৪৬ জন কৃষক নরনারীকে গ্রেপ্তারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৬] মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে ২৪শে আগস্ট বিকাল ৫টায় মনুমেন্ট ময়দানে এক জনসমাবেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলোচ্য বিষয় ছিল সরকারের খাদ্যনীতি। অন্যদের সাথে বক্তব্য রাখেন মহিলা নেত্রী রেণু চক্রবর্তী।[৫৭] দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০শে আগস্ট

থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর চৌদ্দদিনে সাড়ে তের হাজার নরনারী গ্রেপ্তার হন। যাঁদের মধ্যে দু'হাজার ছিলেন নারী। দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচীতে নারী শ্রমিকদের আইন অমান্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯৫৯ খ্রী. ৫ই সেপ্টেম্বর আসানসোলে ৩১ জন মহিলাসহ মোট ৩৮ জন আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার হন। মহিলাদের মধ্যে ২৫ জন স্থানীয় পৌরসভার শ্রমিক ছিলেন। আইন অমান্যকারীদের ২৫ টাকা জরিমানা অনাদায়ে কোর্ট চলা পর্যন্ত আটক রাখা হয় বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কাল্পিং-এ ২২জন আইন অমান্য করে ৭ই সেপ্টেম্বর জেলে যান—যারমধ্যে ১২জন ছিলেন মহিলা।[৫৮]

আইন অমান্যের পাশাপাশি বামপন্থী মহিলারা খাদ্যের দাবিতে মানুষকে সংগঠিত করার জন্য প্রচার শুরু করেন। বামপন্থী নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের কথায়— " ১৯৫৯ সনেই আবার আমাদের গ্রামে গ্রামে জিলায় জিলায় প্রচারে নামতে হল। সেইবছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্য নষ্ট হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু যা ছিল তা নিঃশব্দে কালোবাজারে চলে যায় আর কাঠের পুতুলের মতো সরকার নীরব দর্শক হয়ে থাকেন— এমন অবস্থা কে কবে দেখেছে?"[৫৯] তথ্য থেকে জানা যায় মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচী ছিল ৩১ শে আগস্ট তারিখে কলকাতা সহ সমস্ত জেলা সদরগুলিতে যুগপৎ কেন্দ্রীয় গণ অভিযান। উল্লেখ পাওয়া যায় যে, উক্ত কর্মসূচীকে কার্যকর করার আগে আটক আইনের প্রয়োগ ঘটিয়ে সারা রাজ্য জুড়ে ৬০০ নারী সহ ৭০০০ মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয় সরকারের পক্ষ থেকে।[৬০] ঐ দিন খাদ্যের দাবিতে ময়দানে এক বড় জমায়েতে অন্যান্যদের সাথে মণিকুন্তলা সেন বক্তব্য রাখেন বলে তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সভা শেষে একটি মিছিল রাইটার্সের দিকে গেলে পুলিশের লাঠির আঘাতে ৮০ জন মারা যান।

তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন— "আমরা রাজ্য জয় করতে আসিনি, শুধু দুমুঠা অন্ন চাইতে এসেছি। আমরা কাউকে রক্তচক্ষু দেখাতেও আসিনি— কারো রক্তচক্ষু দেখতেও চাইনা। খাদ্যমন্ত্রী যদি শুনতে পান তো স্পষ্টই বলছি— আমরা খাদ্য ছাড়া আর কিছু চাইতে আসিনি। তিনি নিষ্ঠুর হয়ে এদের ফিরিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু ইতিহাস কখনও এই ব্যবহার ক্ষমা করবে না।"[৬১] মণিকুন্তলা সেনের মতে নেতারা প্রকাশ্যে ছিলেন না এবং তাঁকেও নাকি নির্দেশ দেওয়া হয় বক্তৃতা করে অলক্ষ্যে সভা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে।[৬২]

১৩৬৬সালের ২৪শে ভাদ্র 'স্বাধীনতা'-তে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, পুলিশের লাঠিগুলিতে মৃত্যুর সংখ্যা ৮০টিরও অধিক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায় ৩৯টি বলে স্বীকার করেন।[৬৩] ৩১শে আগস্টের ঘটনার প্রতিবাদে ১লা সেপ্টেম্বর ছাত্রদের এবং ৩রা

সেপ্টেম্বর রাজ্যব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। আর ৩১শে আগস্ট থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে অন্যান্য গণসংগঠনের সাথে জাতীয় মহিলা ফেডারেশন এক বিবৃতিতে দমন নীতি বন্ধ করার আবেদন জানায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রেসনোটে জানানো হয় যে, ৩১শে আগস্টের ঘটনায় ৬৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এঁদের মধ্যে ১০ (দশ) জন মহিলা ছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, মহিলারা ৩১শে আগস্ট মনুমেন্ট ময়দানের জমায়েতে অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০শে আগস্ট থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর চৌদ্দ দিনে সাড়ে সতের হাজার পুরুষ ও মহিলা গ্রেপ্তার হন বলে তথ্যে পাওয়া যায়। জানা যায় এর মধ্যে দুই হাজার ছিলেন মহিলা।[৬৪] ৩১শে আগস্টের ঘটনায় অন্যানদের সাথে মহিলারা সরকারের সমালোচনা করেন। ১০ই সেপ্টেম্বর দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে বেলঘরিয়ায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় মহিলা নেত্রী মণিকুন্তলা সেন এই আন্দোলনকে ব্যাপকতর করে তোলার পাশাপাশি ৩১শে আগস্টের হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য তদন্ত, দোষী অফিসারদের শাস্তি, নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ও বন্দীমুক্তির দাবিসহ সর্বসম্মত এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ৩১শে আগস্ট থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে নীতিগ্রহণ করে আন্দোলনগুলিকে দমন করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় বিভিন্ন গণসংগঠন। অন্যান্য গণসংগঠনের সঙ্গে জাতীয় মহিলা ফেডারেশনও এক বিবৃতিতে এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে দমননীতি বন্ধ করার আবেদন জানান।

১৯৫৯ সালের ৩১শে আগস্ট ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বামপন্থী মহিলা বিধায়ক মণিকুন্তলা সেন ২৫ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় পুলিশি বর্বরতার তীব্র নিন্দা করে বক্তব্য রাখেন। তা থেকে জানা যায় ৩১শে আগস্ট কুড়ি হাজার কৃষক এসেছিল এবং সেই কৃষকদের মধ্যে খুব কম করে ধরলেও এক-তৃতীয়াংশ মেয়ে ছিল এবং মিছিলের পুরোভাগে মেয়েরা ছিল। মিছিলে থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন নিরস্ত্র, নিরন্ন অসহায় মেয়েদের উপর পুলিশের অত্যাচার। ইংরেজ শাসনের সময়ও এইরকম নারীদের উপর অত্যাচার হয় নি বলে তিনি মনে করেন।

মণিকুন্তলা সেনের বক্তব্য থেকে কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের দিন তমলুকের একটি সংবাদ পাওয়া যায়। তিনি বলেন— "শুধু কি কলকাতায় এরচেয়েও জঘন্য অত্যাচার হয়েছে তমলুকে। অজয়বাবু জানেন — ৩১শে আগস্ট সেখানে প্রসেশন গিয়েছিল—সেখানকার এস.ডি.ও আশ্বাস দিয়েছিলেন—কলকাতায় খবর পাঠিয়েছি, কলকাতা থেকে খবর পেলে আমি বলব—প্রসেশন সেখানে থেকে গেল—৫-৭ হাজার লোক—তারমধ্যে মেয়ে ছিল, ছোটো ছোটো

শিশু সন্তান ছিল, সেখানে লাইট-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এবং পাড়ার ও স্থানীয় লোকেরা খাবার-দাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই অবস্থায় রাত ৩টার সময় আলো নিভিয়ে দিয়ে তাদের পুলিশ আক্রমণ করে কলকাতা থেকে কন্ট্রোল রুম থেকে খবর যাবার পর। কন্ট্রোল রুম থেকে বিধানবাবু ডাইরেকশন দিয়েছিলেন পিটিয়ে শেষ করে দাও। সেই নির্দেশ অনুযায়ী রাত ৩টার সময় আলো নিভিয়ে দিয়ে সেই সমবেত জনতাকে মারা হয়েছিল। এই জঘন্য ব্যাপারের পর সেখানকার বার লাইব্রেরি থেকে ইউনেনিমাস প্রস্তাব পাশ করেছিলেন এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে, একথা কি অজয়বাবু জানেন না?"[৬৫]

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতির সমালোচনা লোকসভাতেও উত্থাপিত হয়। বামপন্থী মহিলা সাংসদ রেণু চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বর্ণনা করে ১৯৫৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর বিতর্ক সভায় বলেন — "Of course, the hon'ble Minister has given us figures and statistics which are completely belied by facts, but I would just like to point out that under article 73 of the constitution, the Central Government has the authority to exercise executive powers to see that any law that is passed by this house is properly executed or implemented.

Whatever quantity of rice or atta my be sent by the centre, the fact is that the villagers are not getting it. Therefore, we want that is going on there about distribution, because that is the main thing that will bring down the prices; the Food Minister wants to take to bring about an improvement on this issue."[৬৬]

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের খাদ্য সমস্যা ও বামপন্থী নারীরা:

১৯৫৯ এর অনুরূপ খাদ্য সঙ্কট ১৯৬৬ সালে দেখা দেয়। তবে আলোচনা থেকে দেখা যায় ১৯৫৯ এর খাদ্য আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা, কিন্তু ১৯৬৬ এর আন্দোলন বাংলার মফঃস্বলে বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে ছিল। বার অ্যাসোসিয়েশন অব্ ইণ্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক কেন্দ্র দ্বারা গঠিত কমিশনের রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যে সব স্থানে আন্দোলনের তীব্রতা বেশি ছিল, সেইসব অঞ্চলে পুলিশের ভূমিকা ও অতি সক্রিয়তা চোখে পড়েছিল। সেই স্থানগুলি হল— বসিরহাট, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, বারাসত, কৃষ্ণনগর, বৈদ্যবাটি, শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর, হিন্দুমোটর, আসালসোল, খড়দহ, বেহালা, শিবপুর প্রভৃতি।

খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি ১৭.০৭.১৯৬৫ তারিখে মাননীয় রাজ্যপালের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। সেই স্মারকলিপি ছিল নিম্নরূপ:

"মহাশয়,

পশ্চিমবঙ্গের মহিলা সমাজের পক্ষ হইতে পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির দিকে আমা আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। গ্রামাঞ্চলে চালের দাম কিলো প্রতি ১.৫০/১.৬০ পয়সা পর্যন্ত উঠিয়াছে। এবং সরকারী প্রতিশ্রুতি মত মডিফায়েড রেশনিং অধিকাংশ স্থলেই চালু হয় নাই অথবা হইলেও সরবরাহ নিতান্ত অনিয়মিত। সেইসঙ্গে তরকারী প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। মাছ তো বাজার হইতে অদর্শন, বা অগ্নিমূল্যে চোরা পথে পাওয়া যায়। সরকারের প্রতিশ্রুত সরিষার তেল সরবরাহের এখনও কোনও নিশ্চয়তা নাই। গ্রামাঞ্চলে চালের উচ্চমূল্য এই পরিস্থিতিতে আরও জটিল করিতেছে ও অন্যান্য দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে।

আমরা মহিলারা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে পরিবারের মুখে কি দিব? কি দিয়া তাহাদের বাঁচাইব? স্কুলে বালক বালিকাদের অনাহার বা অর্দ্ধাহারে মূর্চ্ছিত হইবার ঘটনা যদি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীতেই চলিতে থাকে তবে অন্যত্র, কি অবস্থা।

ধান্য উঠিবার সময় সরকার চাষীর নিকট হইতে সরাসরি ধান কিনিলেন না। সরকারী স্বীকৃতি মত এবার পশ্চিমবাংলায় যথেষ্ট ফসল হইয়াছিল, তাহা হইলে সেই ফসল গেল কোথায়? মজুতদার ও কালোবাজারী ব্যবসায়ীদের হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার, কি কার্যকরী ব্যবস্থা সরকার লইলেন? চাল হইতে শুরু করিয়া তেল পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের কার্যকরভাবে দমন করার উপযুক্ত প্রচেষ্টা সরকারের নাই, বরং তাহারাই বাজারের বিধাতা। খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন না করা এই সংকটের অন্যতম কারণ বলিয়া আমরা মনে করি।

এদিকে শিশুদের খাদ্যের অবস্থা গুরুতর রকমের ভয়াবহ। বেবিফুডের দায়িত্ব সরকারকে লওয়ার জন্য গত বছরে আমরা অনুরোধ করিয়াছিলাম, সরকার তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাহার উপর আবার কাগজে পড়িতেছি যে হরিণঘাটার দুগ্ধ সরবরাহ ভাঙিয়া পড়ার আশঙ্কা। এই সামান্য সরবরাহ কলিকাতার পক্ষে অপ্রতুল তাহা সকলেই বোঝেন। তথাপি ইহাও যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহা হইলে শিশুগুলির শুকাইয়া মরা ছাড়া কোনও গতি থাকিবে না। মা হইয়া আমরা তাহা কিরূপে সহ্য করিব?

এই পরিস্থিতিতে আমরা পশ্চিমবঙ্গের নারী সমাজের পক্ষ হইতে আপনার নিকট আবেদন করিতেছি যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কমাইবার জন্য সরকার অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সেই উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি দাবি করিতেছি।

১) গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র নিয়মিত সরবরাহ সহ মডিফায়েড রেশনিং অবিলম্বে চালু করুন।

২) কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে মেহনতী মানুষের জন্য রেশনের পরিমাণ বাড়ান হউক এবং রেশনের দাম কমান হউক।

৩) ডাল ও সরিষার তেল ন্যায্য দরে রেশন দোকান হইতে নিয়মিত দিবার ব্যবস্থা করা হউক।

৪) তরকারির অস্বাভাবিক বাজার দর ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সরকার হইতে সরবরাহ নিশ্চিত করা হউক।

৫) নিয়ন্ত্রিত মূল্যে মাছের নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করা হউক।

৬) মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ও পাইকারদের হাত হইতে বাজারকে মুক্ত করার জন্যে খাদ্যশস্য ও প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হউক।

৭) হরিণঘাটার দুগ্ধ সরবরাহ যাহাতে কোন মতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করা হউক এবং দুগ্ধের সরবরাহ বাড়ান হউক। সংকটজনক পরিস্থিতিতে শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীরা যাহাতে অগ্রাধিকার পান তাহার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা হোক।

আমরা আপনার নিকট আবেদন করিয়ে নারী হিসাবে ও রাজ্যপাল হিসাবে আপনি আমাদের দুশ্চিন্তা বুঝুন ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন।"[৬৭]

১৭.০৭.১৯৫৬ তারিখ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির পেশ করা মাননীয় রাজ্যপালের নিকট স্মারকলিপি থেকে সেই সময়কার অবস্থার কিছুটা চিত্র পাওয়া যায়।[৬৮] গ্রামাঞ্চলে সেই সময় চালের দাম ছিল কিলো প্রতি ১.৫০/১.৬০ পয়সা। জানা যায় সরকারী প্রতিশ্রুতি মত মডিফায়েড রেশনিং অধিকাংশ স্থানে চালু হয়নি অথবা হলেও সরবরাহ নিতান্ত অনিয়মিত ছিল। প্রয়োজনীয় খাদ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল। মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হয় যে, মজুতদার ও কালোবাজারি ব্যবসায়ীদের দমন করার কোন সরকারি ব্যবস্থা না থাকায় এই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সঙ্কট ভয়াবহ আকার নেয় শিশুদের খাদ্যের ক্ষেত্রে। হরিণঘাটার দুগ্ধ সরবরাহ ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা এই সঙ্কটকে ঘণীভূত করে বলে মহিলারা রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ জানান। তাই, এই সঙ্কট মোচনের জন্য যে দাবিগুলি মহিলারা রাখেন সেগুলি হল –সর্বত্র নিয়মিত রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা, খাদ্যশস্য ও প্রধান প্রধান খাদ্য দ্রব্যের বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা,

হরিণঘাটার দুগ্ধ প্রকল্পকে রক্ষা করা ইত্যাদি।[৬৯]

দাবি উত্থাপনের পাশাপাশি খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে ১৯৬৬ এর আন্দোলনে যাঁরা নিহত হন তাঁদের পরিবারে মহিলা সমিতির নেত্রী ও কর্মীদের যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির ডাকে ১০ মার্চ ১৯৬৬ সারা রাজ্যব্যাপী বন্ধে কিছু মানুষ মারা যান বলে তথ্যে পাওয়া যায়। এরই প্রতিবাদে ১৩ই মার্চ সংগঠিত মৌনমিছিলে অন্যান্যদের সাথে মহিলা নেত্রী রেণু চক্রবর্তী নেতৃত্ব দেন বলে জানা যায়।[৭০] পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ১৮ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির চুঁচুড়া শাখার উদ্যোগে জেলা শাসকের নিকট প্রতিবাদের সংবাদ পাওয়া যায়। চন্দননগরের গড়ের ধার, শূকসনাতনতলা, ফটকগোড়া, বাউরিপাড়া প্রভৃতি এলাকায় পুলিশ জোর করে পুরুষদের গ্রেপ্তার করলে মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল এই এলাকাগুলিতে যান বলে ঘরে বাইরের সংবাদ থেকে জানা যায়।[৭১] অনুরূপভাবে ২১শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে আটজন প্রতিনিধি রিষড়া ও কোন্নগরের কলোনিগুলিতে যাওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

২৮ শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা ফেডারেশনের আহ্বানে বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের মুক্তি, খাদ্য ও কেরোসিনের দাবি এবং পুলিশের গুলিচালনার প্রতিবাদে কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিল ও মনুমেন্ট ময়দানে একটা সমাবেশ হয়। এই সমাবেশে পৌরহিত্য করেন অনিলাদেবী। এছাড়া, জ্যোতি চক্রবর্তী, পঙ্কজ আচার্য, নিরুপমা চ্যাটার্জী, সুধা রায়, গীতা মুখার্জী, ইলা মিত্র প্রমুখ নেত্রী ভাষণ দেন বলে জানা যায়। সমাবেশের শেষে রাজ্যপালের কাছে তাঁরা একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে ১৯৫৯ ও ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের খাদ্য সঙ্কট বাংলায় প্রবল আকার ধারণ করেছিল। খাদ্য সঙ্কট সমাধানের চেষ্টায় বামপন্থী মহিলারা তাঁদের সীমিত শক্তি নিয়ে পুরুষদের পাশাপাশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সভা সমাবেশে বা মিছিলে অংশগ্রহণ, সরকারের কাছে দাবী আদায়ের জন্য প্রতিবেদন জমা দেওয়া, আইন অমান্য করা— এই সমস্তই তাদের আন্দোলনের বিভিন্ন রূপ ছিল। এমনকি সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধেও তাঁরা কথা বলেন। পাশাপাশি দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারগুলিতেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের উপস্থিতির কথা জানা যায়। এই সময়ের আন্দোলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে শুধু কলকাতাকেন্দ্রিক নয়, বিভিন্ন জেলায় এমনকি মফঃস্বল অঞ্চলগুলিতেও নারীদের অংশগ্রহণের চিত্রটি বিভিন্ন তথ্যে উঠে এসেছে।

১৯৬৭-১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে খাদ্য সংকট ও বামপন্থী নারী :

১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৭খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক দিক থেকে এক অস্থির সময়কাল। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের পরাজয় ও প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। ঐ বছরই যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গঠিত হয় অন্তর্বর্তীকালীন পি.ডি.এফ সরকার। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ এই সরকারের পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালে আবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। ১৯৭২খ্রিষ্টাব্দ এর নির্বাচনে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন হয়। ১৯৭৭ সালে ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রে জনতা দল ক্ষমতায় আসে এবং পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়। এই দীর্ঘ দশ বছর সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী মহিলাদের বহু ধরনের কাজের মধ্যে অন্যতম ছিল খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি ও অন্যান্য মহিলা সংগঠনগুলি যুক্তভাবে খাদ্য আন্দোলন সংগঠিত করে বলে জানা যায়। যেমন— ১৯৬৭ সালের ১১ই জুন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি ও ভারতীয় জাতীয় মহিলা ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত মহিলা সংগঠনগুলি যৌথভাবে মনুমেন্ট ময়দান থেকে একটি বড় আকারের মিছিল করে কলকাতার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এবং এই মিছিল থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি রাজ্যপালের কাছে একটি স্মারকলিপি দেন খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটি দাবি জানিয়ে। স্মারকলিপিতে মহিলারা বলেনঃ "পশ্চিমবঙ্গের মহিলা সমাজের পক্ষ থেকে গণডেপুটেশনে আগত মহিলারা, আমরা আপনার কাছে খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী কথা উপস্থিত করতে চাই। ...এই অবস্থায় নিম্নলিখিত জরুরী দাবি কটি আপনার কাছে আমরা উপস্থিত করছিঃ

১) গ্রামাঞ্চলে ক খ গ সকল শ্রেণীকে অবিলম্বে চালসহ মডিফায়েড রেশন দিতে হবে।

২) বিধিবদ্ধ রেশনের এলাকা বাড়াতে হবে।

৩) রেশনের দাম কমাতে হবে।

৪) চিনির রেশন বাড়াতে হবে।

৫) কেরোসিনের নিয়মিত পর্যাপ্ত সরবরাহ দিতে হবে।

৬) গ্রামাঞ্চলে দুঃস্থদের জন্য রিলিফ অবিলম্বে বাড়িয়ে শতকরা অন্তর ১০জনকে দিতে হবে। দুর্গত এলাকায় রিলিফ কিচেন খুলতে হবে।

৭) টেস্ট রিলিফের কাজের মারফত গ্রামাঞ্চলে ও অর্ধশহর অঞ্চলে মেয়েদের কাজ দিতে হবে।

৮) চোরকারবারী ও মজুতদারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া আপনার মারফত আমরা দিল্লীর সরকারের কাছে দাবি করি।

"পশ্চিমবঙ্গে পর্যাপ্ত রেশন দেবার জন্য যা কিছু ঘাটতি তা ভারত সরকারকে সরবরাহ করতে হবে। বাংলার ঘাটতি পূরণের দায়িত্ব ভারত সরকারের।"

ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত

বিভিন্ন মহিলা সমিতির প্রতিনিধিগণ।"[৭২]

১৯৬৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ১লা অক্টোবর কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির দ্বাদশ সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে মোট ১১টি প্রস্তাব গৃহীত হয় — যার মধ্যে খাদ্য সংকটের প্রস্তাব ছিল অন্যতম।

খাদ্য সংকট ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সমস্যা সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে অব্যাহত থাকে। তাই জানা যায় ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ ১৩মে এ.বি.টি.এ. হলে চারটি বামপন্থী মহিলা সংগঠনের একটি কনভেনশন হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদসহ একাধিক দাবি উত্থাপিত হয় এই কনভেনশনে। এই কনভেনশন থেকে এই দাবিগুলির ভিত্তিতে জেলায় জেলায় সভা-সমাবেশ-মিছিল ও কনভেনশন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৭৩] ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ ২৬ সেপ্টেম্বর দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ও ন্যায্য দরে খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের দাবিতে পাঁচটি বামপন্থী মহিলা সংগঠন— পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি, নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ, মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ, অগ্রণী মহিলা পরিষদ ও অগ্রগামী মহিলা সমিতি কলকাতায় একটি সমাবেশের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের দাবিপত্র পেশ করেন।

১৯৭৮ সালের ৫ই -৯ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ত্রয়োদশ সম্মেলনে মহিলা ফ্রন্টের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৯৭৩ সালের ২০শে আগস্ট জনস্বার্থবিরোধী খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির উদ্যোগে একটি বড় মিছিল হয়। ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে জেলায় জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনে সারা পশ্চিমবঙ্গে দু'হাজার মহিলা অংশগ্রহণ করেন বলে জানা যায়।[৭৪]

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ ১লা আগস্ট বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড ব্লকে সাধারণ খেতমজুর ও মধ্যবিত্ত মহিলারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানো, কেটে নেওয়া রেশন ফিরিয়ে দেওয়া সহ রেশন বৃদ্ধি, ব্যাপক খয়রাতি সাহায্য, টেস্ট রিলিফ প্রভৃতির দাবিতে বর্ধমান জেলার গণতান্ত্রিক

মহিলা সমিতির সভানেত্রী আশালতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নমিতা পালের নেতৃত্বে বি.ডি.ও-এর কাছে ডেপুটেশন দেন।[৭৫]

১৯৭৩ সালের ২রা আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি হুগলী জেলা কমিটির শ্রীরামপুরের অন্তর্গত বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটির মহিলারা মহকুমা শাসকের কাছে এক ডেপুটেশন দেন। জেলা সম্পাদিকা মুক্তা কুমারের নেত্রীত্বে পারুল দাশগুপ্তা, শুভ্রা সান্যাল, দীপ্তি ঘোষ, যুথিকা ব্যানার্জী এই ৫জনের একটি প্রতিনিধিদল মহকুমা শাসককে এক স্মারকলিপি দেন। রেশন কাটা, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি বিরুদ্ধে এবং আরো কিছু দাবিতে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়।[৭৬] ১৯৭৩ সালের ২০শে আগস্ট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যসংকট ও রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবিতে বেলা ৩টায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে এক সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়।[৭৭]

এই খাদ্য মিছিল ও সমাবেশে কলকাতা, ২৪পরগণা, হাওড়া, হুগলি, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা থেকে প্রায় দু'হাজার মহিলা যোগদান করেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা পঙ্কজ আচার্যের লেখা থেকে এ বিষয়ে কিছুটা অবগত হওয়া যায়। 'একসাথে - তে লেখেন— "পশ্চিমবাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা মহানগরীর রাজপথে গত ২০ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী মা-বোনেরা পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতৃত্বে কংগ্রেসী সরকারের জনস্বার্থবিরোধী খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানালেন। সুদূর বীরভূম, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, ২৪ পরগণার গ্রামাঞ্চল থেকে ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষক মেয়েরা এসেছিলেন সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে। কলকাতা ও শহরতলীর মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত গরিব ঘরের খেটে খাওয়া মা বোনেরা এসেছিলেন। দীর্ঘ দুই বৎসর পরে রাজধানী কলকাতার বুকে হাজার হাজার মহিলাদের পোস্টারে, ফেস্টুনে ও পতাকায় সজ্জিত বর্ণাঢ্য এই বিশাল মিছিল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় প্রাণবন্ত ছিল। স্লোগানে স্লোগানে রাজপথ মুখর করে চলেছিলেন সংগ্রামী মহিলারা, রাস্তার দুইধারে দণ্ডায়মান শতসহস্র দর্শকের বাঁচার দাবি যেন মিছিলের স্লোগানে রূপ নিয়ে আরও বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।"[৭৮]

মিছিলের শেষে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভানেত্রী জ্যোতি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ১৩জনের একটি প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে নিম্নলিখিত দাবিগুলি উত্থাপন করেনঃ

১) খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে

দাম বেঁধে দিতে হবে।

২) নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম ন্যায্যমূল্যে বেঁধে দিতে হবে এবং বাঁধাদরে সরবরাহের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

৩) রেশনে চাল যে পরিমাণে কমানো হয়েছে তা অবিলম্বে পূরণ করতে হবে এবং রেশনের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

৪) সংশোধিত রেশন এলাকায় খাদ্যশস্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে হবে।

৫)গ্রামাঞ্চলে ব্যক্তিগত রেশন কার্ড চালু করতে হবে।

৬) দুঃস্থদের জন্য অবিলম্বে ব্যাপক রিলিফ দিতে হবে।

৭) জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে।

৮) বেকারদের কাজ অথবা কাজ সাপেক্ষে বেকারভাতা দিতে হবে।

৯) বর্ধিত সেচকর এবং খাজনা হ্রাস করতে হবে।

১০) পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

১১) মজুতদার, চোরাকারবারী ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[৭৯] ১৯৭৩ সালের ২০শে আগস্ট বর্ধমান জেলা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পরিচালনায় সস্তাদরে খাদ্যসহ দশ দফা দাবিতে বর্ধমান জেলা শাসকের কাছে তিনশো মহিলা এক ডেপুটেশন দেন। জেলা সম্পাদিকা অর্চনা গুহ ও সহ-সভানেত্রী রানী কোঙার বক্তব্য রাখেন।[৮০]

সরকারের খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে ১৯৭৩ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির আহ্বানে সহস্রাধিক মহিলা জেলা শাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বলে জানা যায়। মহিলাদের এই সমাবেশে ভাষণ দেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদিকা শ্বেতা চন্দ্র এবং অন্যান্যরা। সমিতির পক্ষ থেকে শ্বেতা চন্দ্র, ঝর্ণা রায়, গীতা চৌধুরী ও বেলা সরকারকে নিয়ে গঠিত এক প্রতিনিধিদল জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করে বিভিন্ন দাবি নিয়ে আলোচনা করেন।[৮১] রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি, খাদ্যের দাবিতে রাধামোহনপুর, শালবনী, চন্দ্রকোণারোড, গোয়ালতোড়, মেদিনীপুর, খড়্গাপুর, ঝাড়গ্রাম এই সাতটি ব্লকে মহিলা মিছিল ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে কলকাতা, হাওড়া, ২৪পরগণা, হুগলী, বাঁকুড়াতেও মহিলা সমিতির নেতৃত্বে মিছিল ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।[৮২] ঐ একই দাবিতে ১৯৭৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর শ্যামপুর থানা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির উদ্যোগে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত প্রায় দুইশত মহিলার এক বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা হয়।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের শেষাশেষি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির বাজার দর বৃদ্ধি ও খাদ্য সংকট তীব্র হয়ে ওঠে। তাই মহিলাদের নেতৃত্বে জেলায় জেলায় খাদ্যের দাবি ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে বি.ডি.ও, এস.ডি.ও এবং ডি.এম.কে ঘেরাও করার কর্মসূচী নেওয়া হয় বলে জানা যায়। মিছিল করে ডেপুটেশন দেওয়া, বৈঠক সভা ও পথসভা করা এবং পোস্টারিং করা হয়। ১৯৭৩ সালের ১২ই নভেম্বর থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় জেলায় এবং ১৫নভেম্বর কলকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে মহিলারা খাদ্যের দাবিতে আইন অমান্য আন্দোলন করেন। এই আইন অমান্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষক ও খেতমজুর পরিবারের মহিলাদের বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদিকার সংগৃহীত জেলাভিত্তিক রিপোর্টটি থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আইন অমান্যকারীদের একটি চিত্র পাওয়া যায়। রিপোর্টটি নীচে দেওয়া হল:

"হাওড়া জেলায় ১০৯জন মহিলা আইন অমান্য করে গ্রেপ্তারবরণ করেন। উলুবেড়িয়া, আমতা ও হাওড়া কোর্টে আইন অমান্য করা হয়। জেলা সমিতির সহসভানেত্রীদ্বয় মালতী দিন্দা ও অমিয়া নন্দী এবং জেলা সম্পাদিকা জয়ন্তী গোস্বামী মহিলা আইন অমান্যকারীদের নেতৃত্ব দেন। হুগলীতে ৭০জন মহিলা আইন অমান্য করেন চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর কোর্টে। মহিলা সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব দেন রাজ্য সমিতির অন্যতম সম্পাদিকা প্রভা চ্যাটার্জী ও জেলা মহিলা সমিতির সহ-সভানেত্রী অপর্ণা মল্লিক। মালদহতে ১৩৩জন মহিলা আইন অমান্য করেন। নেতৃত্ব দেন জেলার মহিলা নেত্রী অনিতা ঝা।

বর্ধমানে ৪৬২ জন মহিলা আইন অমান্য করেন। আসানসোলে নেতৃত্ব দেন ইন্দুমতী চ্যাটার্জী এবং এখানে বিপুল সংখ্যক কয়লা খনির নারী শ্রমিক আইন অমান্য করেন। বর্ধমান শহরে রানী কোঙার নেতৃত্ব দেন এবং কাটোয়াতে জেলা মহিলা সমিতির সভানেত্রী আশা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন ও রাজলক্ষ্মী চক্রবর্তী অপরদিন মহিলাদের নেতৃত্ব দেন। এখানে পুলিশ মহিলাদের আইন অমান্যের পরে গরালগাছের জঙ্গলে পুলিশ বেষ্টিত করে রাত দশটা পর্যন্ত আটকে রাখে পরে ছেড়ে দেয়।

পশ্চিমদিনাজপুরে - বালুরঘাট কোর্টে ৩০জন মহিলা আইন অমান্য করেন।

মেদিনীপুরে - ৯৪জন মহিলা আইন অমান্য করেন।

কোচবিহারে - ১১জন মহিলা আইন অমান্য করেন।

২৪ পরগণায় - ১৭৫জন মহিলা আইন অমান্য করেন। ১৫ই নভেম্বর মহেশতলা থেকে কলকাতা

অভিমুখে যে মিছিল আসছিল পুলিসপথে তাদের গতিরোধ করে। সেখানে আইন অমান্য করা হয়। ২৭জন মহিলা আইন অমান্য করেন।

রানাঘাটে - ১৩জন মহিলা আইন অমান্য করেন। বিভা ঘোষ সংসদ সদস্যা নেতৃত্ব দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুষ্পিতা চক্রবর্তী, অনিমা ব্যানার্জী। এখানে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ফলে ৫জন মহিলা আহত হন।

দার্জিলিং জেলায় - ১৫৪জন মহিলা আইন অমান্য করেন। শিলিগুড়িতে নেতৃত্ব দেন অঞ্জলি বাগচী ও দার্জিলিং -এ জেঠিমায়াই। দার্জিলিং এ দেড় শতাধিক চা-বাগানের নারীশ্রমিক আইন অমান্য করেন।

জলপাইগুড়ি - ৯৫জন মহিলা আইন অমান্য করেন। জেলার গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভানেত্রী প্রতিভা মুখার্জী নেতৃত্ব দেন - তিনি পুলিশের লাঠিচার্জে গুরুতরভাবে আহত হন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ভ্রমক্রমে আমাদের সমিতির সহ-সভানেত্রী প্রতিভা মুখার্জীকে এস.ইউ.সি-র প্রাক্তন মন্ত্রী প্রতিভা মুখার্জী বলে লেখা হয়েছে।

বাঁকুড়াতে ২১০জন মহিলা আইন অমান্য করেন বাঁকুড়া কোর্টে। জেলা মহিলা সমিতির সম্পাদিকা সুমিত্রা দে নেতৃত্ব দেন। তাঁর সাথে ছিলেন রাজশ্রী মিত্র ও শোভা ব্যানার্জী।

মুর্শিদাবাদে এখানে খাদ্য, রিলিফ ও কাজের দাবিতে গণআন্দোলনে মহিলারা ব্যাপকভাবে সাড়া দেন। বহরমপুরে খাদ্যের দাবিতে মহিলাদের সহস্রাধিক সংখ্যায় যোগদান আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অক্টোবর মাসে খড়গ্রাম থানায় নগর বলকের বিডিও কে ঘেরাও করেছিল খাদ্যের দাবিতে মহিলা মিছিল। বিডিও বাধ্য হয়েছিলেন বলকের গুদাম থেকে মিছিলকারীদের কলাই দিতে। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে, কান্দীতে সহস্র সহস্র মানুষ আইন অমান্য করতে গেছে। ১৪ই বহরমপুরে পুলিশ বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রের ন্যায় ব্যূহ তৈরি করেছিলেন। ৫ সহস্রাধিক জনতার নেতৃত্বে আইন অমান্যকারী দল এই ব্যূহ ভেঙে ভেতরে ঢুকতে গেলেই পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে ও লাঠিচার্জ করে। কিন্তু জনতা অটল। সেদিন বহরমপুরের সংগ্রামী জনতার সঙ্গে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদান করেছেন মহিলা সমিতির নেতৃত্ব মহিলাগণ। লাঠির ঘায়ে বহু মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। জেলা সমিতির নেত্রী ঝর্ণা রায়, কৃষ্ণা ভৌমিক প্রভৃতি ৫০জন সেদিন আহত হন। ৫জনকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।”[৮৩]

১৯৭৩ সালের ১৫ই নভেম্বর কলকাতায় কেন্দ্রীয় আইন অমান্য কর্মসূচী পালিত হয়। এই কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে পুলিশের লাঠির আঘাতে বেশকিছু মহিলা আহত হন বলে

জানা যায়। আহতদের মধ্যে মায়া রায়, মায়া ভট্টাচার্য, সুব্রতা নন্দী, সরলা চৌধুরী, শান্তি মজুমদার, অমিয় নন্দী, জ্যোৎস্না দত্ত, সুমতি মুখার্জি, পুতুল হাজরা, কল্যাণী দাস, ইতি বসু, মঞ্জু দেবী, রেখা গোস্বামী, রমা কুণ্ডু প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। ১৭ই নভেম্বর নয়টি বামপন্থী দলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্য গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি খাদ্যের দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালের ডাকে যোগদান করে। এই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য রাজ্য মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে প্রায় দু'হাজার পোস্টার ছাপানো হয় বলে জানা যায়। জেলায় জেলায় ও পোস্টার করা হয়। এই ধর্মঘট করার পেছনে প্রধান দফা দাবি ছিল:

১) প্রতিটি সাবালক মানুষের জন্য দৈনিক চাল ও গম মিলিয়ে ৪৫০ গ্রাম ডাল রেশনে দিতে হবে। খাদ্যের দাম কিলো প্রতি ১টাকার বেশি করা চলবে না। ইতোমধ্যে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় যে রেশন কাটা হয়েছে তা পূরণ করে মাথাপিছু সপ্তাহে ২৬০০গ্রাম খাদ্যশস্য রেশনে সরবরাহ করতে হবে।

২) গ্রামাঞ্চলে সংশোধিত রেশনের পরিমাণ সপ্তাহে মাথাপিছু ১৫০০ গ্রাম করতে হবে এবং তার সরবরাহ নিয়মিত ও নিশ্চিত করতে হবে।

৩) গ্রামাঞ্চলে ২৫ শতাংশ জনগণকে খয়রাতি সাহায্য দৈনিক মাথাপিছু ১ কেজি হারে খাদ্যশস্য দিতে হবে।

৪) সরষের তেল, কয়লা, ডাল, কেরোসিন, কাপড়, চিনি, বেবিফুড প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ ১৯৬৯ সালের দরে করা তেহবে।

৫) খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের মজুত উদ্ধার করে জনগণের মধ্যে তা বন্টন করতে হবে।

৬) মজুতদার, কালোবাজারী, মুনাফাখোর ও ভেজালকারীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

৭) জরুরী অবস্থা, ডি.আই. আর. মিসা প্রত্যাহার, প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং শ্রমিক, কৃষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত কর্মীদের উপর থেকে সমস্ত মিথ্যা মামলা তুলে নিতে হবে।'[৮৪]

খাদ্যদ্রব্য ও কাজের দাবিতে ১৯৭৪সালের জানুয়ারি মাস থেকেই মহিলাদের নানা কর্মসূচীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন জানুয়ারি মাসে জলপাইগুড়িতে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, সোস্যালিস্ট পার্টির মহিলা কর্মী ও এস.ইউ.সি-র মহিলা কর্মীরা সমবেতভাবে মিছিল করেন ও ডেপুটেশন দেন বলে জানা যায়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, রেশনে গম

বন্ধ করা, চালের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে এই ডেপুটেশন হয়।[৮৫] ১৯৭৪ খ্রি. ১১-১২মার্চ রাজভবনের সামনে দশ দফা দাবি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ডাকে মহিলারা ২৪ঘন্টার গণ-অবস্থান করেন।

জানা যায় রাজভবনের সামনে অবস্থানে পশ্চিমবঙ্গের ১৩টি জেলা থেকে প্রায় ১০ হাজার মহিলা যোগ দেন। যোগদানকারী মহিলাদের মধ্যে বেশীরভাগই ক্ষেতমজুর ভাগচাষী, কৃষক, শ্রমিক মহিলাদের উপস্থিতি ছিল এই অবস্থানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি এই অবস্থানে একটি দাবিপত্র প্রকাশ করে। দাবিপত্রটি ছিল নিম্নরূপ:

‘‘আমাদের আশু দাবি:

১) বিধিবদ্ধ রেশনে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য দৈনিক অন্তত ৪৫০ গ্রাম খাদ্যশস্য দিতে হবে।

২) গ্রামাঞ্চলে সংশোধিত এলাকায় পরিবারগত রেশন-কার্ডের পরিবর্তে ব্যক্তিগত রেশন কার্ড চালু করতে হবে এবং সংশোধিত রেশনের পরিমাণ সপ্তাহে অন্তত ১৫০০গ্রাম করতে হবে।

৩) গ্রামাঞ্চলের শতকরা ২৫জনকে খয়রাতি সাহায্য দৈনিক অন্তত ১ কেজি হারে দিতে হবে।

৪) পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র শহরে ও গ্রামে ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যথা চাল, ডাল, সরষের তেল, বেবিফুড প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করে জনগণের মধ্যে বন্টন করতে হবে। কালোবাজারি, মুনাফাখোর, ভেজালকারীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

৫) দুঃস্থ এলাকায় রিলিফ ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) ছাঁটাই, লে অফ, কৃষক উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে। জমিদার, জোতদার, জমির চোরকারবারীদের হাত থেকে জমি উদ্ধার করে বিনামূল্যে গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরের হাতে দিয়ে প্রকৃত ভূমিসংস্কারের দ্বারা বেকার সমস্যা ও খাদ্য সংকটের স্থায়ী সমাধানের পথে অগ্রসর হতে হবে।

৭) নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক কর্মপ্রার্থী নারীদের বেকার তালিকাভুক্ত করতে হবে ও তাদের কর্মসংস্থান করতে হবে।

৮) সর্বক্ষেত্রে নারীদের চাকরির সমানাধিকার, সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাপকভাবে কুটিরশিল্প ও লঘু শিল্পের বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

৯) জনগণের জীবন-জীবিকার সংগ্রাম ও নিরাপত্তার জন্য, খাদ্যসমস্যা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ যাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন সংগঠিত করতে

পারে তার জন্য জরুরী অবস্থা, ভারতরক্ষা আইন ও মিসা প্রভৃতি দমনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে। সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে ও দমনপীড়ন সন্ত্রাস বন্ধ করে জনগণের পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে।

প: ব: গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি

১১মার্চ ১৯৭৪ ৬/১, ডা: অমল রায়চৌধুরী লেন

কলকাতা-৯"[৮৬]

দাবিপত্রটি থেকে বোঝা যায় মহিলাদের দাবিগুলি ছিল রেশনে এক টাকা কেজি চাল, গ্রামাঞ্চলে সংশোধিত রেশন, পশ্চিমবাংলার সর্বত্র ন্যায্যমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ, দুঃস্থ অঞ্চলে রিলিফ, নারীদের কর্মসংস্থান ও চাকরিক্ষেত্রে সমানাধিকার এবং জমিদার জোতদার জমির চোরাকারবারীদের হাত থেকে জমি উদ্ধার করে বিনামূল্যে গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের হাতে দিয়ে প্রকৃত ভূমি সংস্কারের দ্বারা বেকার সমস্যা ও খাদ্যসংকটের স্থায়ী সমাধানের পথে অগ্রসর ইত্যাদি।[৮৭]

১৯৭৪ সালের ১১ই মার্চ রাজভবনের সামনে অবস্থানের আগে মহিলারা নানা জায়গায় সভা সংগঠিত করেন। যেমন খাদ্য সংকট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে ২৪শে ফেব্রুয়ারী ৩৬টি ট্রেড ইউনিয়ন ও গণসংগঠন মিলিত হয়ে জলপাইগুড়িতে এক গণতান্ত্রিক কনভেনশন সংগঠিত করে। এখানে উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ সমর্থন করে আলোচনায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির শচী ব্যানার্জী। ভয়াবহ খাদ্য সংকট ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৯৭৪ সালের ১১ই মার্চ রাজভবনের সামনে মহিলাদের গণঅবস্থানকে সমর্থন জানিয়ে ৪ঠা মার্চ হাওড়া জেলার বাগনান দক্ষিণ অঞ্চলে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির উদ্যোগে নুন্টিয়ায় একটি সভা হয়। সভা পরিচালনা করেন সন্ধ্যা ঘোষ। ঐ একই দাবিতে বাগনানের বাক্‌সি অঞ্চলে একটি সভা হয়।[৮৮]

দ্বিতীয় দফায় অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মহিলারা আন্দোলন করেন বলে জানা যায়। ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটে বিভিন্ন গণসংগঠনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি মিছিল সংগঠিত করে এবং স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে ১২দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারকপত্র পেশ করে।[৮৯]

১৯৭৪ সালের ২৫শে মার্চ পাঁচশতাধিক খেতমজুর মহিলা চন্দ্রকোণা ২ নং ব্লক অফিসে

সস্তাদরে খাদ্য কেরোসিন, কাজ ও রিলিফের দাবিতে গণ ডেপুটেশন দেন। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদিকা নন্দরানী ডল, ডলি চক্রবর্তী ও ভারতী মণ্ডলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেন।[১০] ১৯৭৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল রানীগঞ্জ শহরের রাজপথে তিন সহস্রাধিক মহিলা খাদ্য, শিক্ষা, কাজ ও '৬৯ সালের দরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ ইত্যাদি দাবিতে একটি মিছিল করেন। অনুরূপভাবে আলিপুরদুয়ারের মহিলারাও খাদ্যের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং মহকুমা শাসকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে ডেপুটেশন দেন।[১১] খাদ্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির খড়্গপুর শাখার উদ্যোগে খরিদা দুর্গামন্দিরে প্রায় একশত মহিলার উপস্থিতিতে একটি কনভেনশন হয়। এই কনভেনশনে গ্রামীন খেতমজুর এবং শহরের কিছু শ্রমজীবী মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। নন্দরানী ডল ও সাধনা পাত্র জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন। প্রস্তাবের সমর্থনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন লীলা বিশ্বাস, প্রফুল্লবালা রায়, মঞ্জু মিত্র, মীরা দাশগুপ্ত, বন্দনা মৈত্র, মিলু দাস প্রমুখ।[১২] ১৯৭৪ সালের ১৬ই এপ্রিল খাদ্য, কাজ এবং সন্ত্রাসবন্ধ ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে কৃষ্ণনগরে জেলা শাসকের দফতরে সহস্রাধিক মহিলা মিছিল করে ডেপুটেশন দেন।[১৩]

খাদ্যের দাবিতে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৯৭৪সালের ৩রা মে ৯টি বামপন্থী দলের আহ্বানে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয় সারা ভারতবর্ষে। এই প্রতিবাদ দিবসে সমস্ত বামপন্থী মহিলা গণ সংগঠনগুলি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন বলে জানা যায় - যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। জানা যায় কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কার্যকরী সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকা কনক মুখোপাধ্যায় ও পঙ্কজ আচার্যের নেতৃত্বে ১১৫জন মহিলা আইন অমান্য করেন। ১৯৭৪ সালের ৭মে সারা রাজ্যে সাধারণ ধর্মঘটে মহিলারা অংশগ্রহণ করেন।

স্থানীয় ভিত্তিতে যে সমস্ত এলাকায় পূর্বে শুধুমাত্র মহিলাদের নেতৃত্বে কোন আন্দোলন সংগঠিত হয়নি সেইসমস্ত এলাকার মহিলারা খাদ্য সমস্যা সমাধানে সংগঠিত হতে থাকেন। যেমন ১৯৭৪ সালের ৩০শে মে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য হ্রাসের ও পর্যাপ্ত সরবরাহের দাবিতে রাজগঞ্জ বিডিও অফিসে এক মহিলা বিক্ষোভ হয়। এর আগে এখানে কোন মহিলা মিছিল হয়নি। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদিকা অন্নপূর্ণা মজুমদার বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তৃতা দেন।[১৪]

১৯৭৪সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে খাদ্যের জন্য আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি বাঁকুড়া জেলা কমিটির ডাকে খাদ্য, কাজ ও কাপড়ের দাবিতে বাঁকুড়া জেলা শাসকের অফিসের সামনে পাঁচ শতাধিক মহিলার কেন্দ্রীয় জমায়েত ও বিক্ষোভ হয় বলে জানা যায়। বিষ্ণুপুর, বড়জোড়া, খাতড়া, মেজিয়া, নিত্যানন্দপুরের মহিলারা বাঁকুড়ায় সমবেত হন। জেলা কমিটির পক্ষ থেকে পাঁচজনের প্রতিনিধিদল জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। বাঁকুড়া জেলাকে দুর্ভিক্ষপীড়িত জেলা হিসাবে ঘোষণা করা, রেশনে ৪৫০গ্রাম চাল-গম শতকরা ২ জনের পরিবর্তে শতকরা ২০জনকে সরবরাহ, আরো বেশি করে লঙ্গরখানা খোলা ইত্যাদি দাবি জানান হয়। জেলাশাসক দাবিগুলি পূরণে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নি। কেবল জানান যে, টি.আর.এ-র কাজে দৈনিক ৪০০-৫০০জনের কাজের ব্যবস্থা হবে ও বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে সারা জেলায় দশটি লঙ্গরখানা খোলা হবে। জানা যায় জেলা শাসকের এই প্রতিশ্রুতি শুনে মহিলারা আরো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরে যান।[১৫]

১৯৭৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর পাঁচটি বামপন্থী মহিলা সংগঠনের উদ্যোগে যুক্ত রাজ্য কনভেনশন হয় খাদ্যের দাবিতে ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে। কনক মুখার্জী (গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি), ভক্তি মুখার্জী (নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ), বাদল মুখার্জী (মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ), শান্তি সরকার (অগ্রণী মহিলা পরিষদ) এবং রেবা মুখার্জী (পশ্চিমবঙ্গ অগ্রগামী মহিলা সংঘ) কে নিয়ে গঠিত সভানেত্রীমণ্ডলী কনভেনশন পরিচালনা করেন। কনভেনশনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সম্পাদিকা পঙ্কজ আচার্য। প্রস্তাবে অবিলম্বে খাদ্য, ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের দাবিতে এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান হয়। মূল প্রস্তাবের সমর্থনে সাধনা চৌধুরী (মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ), গীতা সেনগুপ্ত (নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ), সন্ধ্যা ভট্টাচার্য্য (অগ্রণী মহিলা পরিষদ) এবং সান্ত্বনা আঢ্য (পশ্চিমবঙ্গ অগ্রগামী মহিলা সংঘ) সর্বগ্রাসী খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মমতা নিয়োগী (নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ) প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবের সমর্থনে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রী মঞ্জরী গুপ্তা, কৃষ্ণা সেন (মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ), রেবা মুখার্জী (পশ্চিমবঙ্গ অগ্রগামী মহিলা সংঘ) বক্তব্য রাখেন। সভানেত্রীমণ্ডলীর পক্ষ থেকে বাদল মুখার্জী (মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ) এবং কনক মুখার্জী (গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি)

বক্তব্য রাখেন। কনভেনশন থেকে এগার দফা দাবির ভিত্তিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়ে প্রতিনিধিরা ফিরে যান। দাবিগুলি হল—গ্রাম-শহরে ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সরবরাহ এবং পর্যাপ্ত রেশন দিতে হবে, '৬৯ সালের দরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে হবে, ছাত্র-ছাত্রীদের '৬৯ সালের দরে শিক্ষাসামগ্রী দিতে হবে, মজুত উদ্ধার এবং কালো টাকা বাজেয়াপ্ত করতে হবে ইত্যাদি।[৯৬]

১৯৭৪সালের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীরামপুর টাউন হলে বামপন্থী মহিলা সংগঠনগুলির আহ্বানে বামপন্থী গণতান্ত্রিক মহিলা কনভেনশন হয়। পাঁচ শতাধিক মহিলা এতে যোগ দেন। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জেলা সভানেত্রী পুষ্প ঘোষ, অগ্রগামী মহিলা পরিষদের বেলা ঘোষ ও কৃষক নেত্রী লক্ষ্মী রানী পাখিরাকে নিয়ে সভানেত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়। কনভেনশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন সন্ধ্যা চ্যাটার্জী। রাজ্য গণকনভেনশনে গৃহীত দাবিগুলির ভিত্তিতে মহিলাদের বামপন্থী মোর্চা গড়ে তোলার মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন জেলা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সম্পাদিকা মুক্তা কুমার। প্রস্তাব সমর্থন করেন অগ্রগামী মহিলা পরিষদের নীহার দাস ও মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘের নীলিমা পাল। জেলার সর্বত্র বৈঠক, সভা, মিছিল ও সমাবেশ, ব্লক ও মহকুমাস্তরে গণ অবস্থান ও গণ ডেপুটেশন এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর চুঁচুড়া কোর্টে জেলার কেন্দ্রীয় মহিলা সমাবেশের কর্মসূচী উত্থাপন করেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির মিতালী কুমার। বন্দীমুক্তি ও বন্দীদের রাজনৈতিক মর্যাদা বিষয়ক প্রস্তাবে বিশেষভাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিতা ও রোগাক্রান্ত কৃষক নেত্রী ভারতী তরফদারের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করা হয়।[৯৭]

নয়টি বামপন্থী দলের আহ্বানে সস্তাদরে খাদ্য, শতকরা ২০ ভাগ জি.আর, অধিক পরিমাণে টি.আর., সকল রকম উচ্ছেদ বন্ধ, সকল রাজবন্দীদের মুক্তি ও অন্যান্য দাবিতে ১৯৭৪ সালের ১১ই অক্টোবর দশ হাজার কৃষক, খেতমজুর, শ্রমিক, ছাত্র, যুব, মহিলা, বর্ধমান টাউন হলে বেলা একটায় জমায়েত হন। জমায়েতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল— প্রায় হাজারের উপর মহিলার যোগদান। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ফেস্টুন হাতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহিলারা মিছিলে আসেন বলে জানা যায়।[৯৮] খাদ্য, কাজ ও রিলিফের দাবিতে মুর্শিদাবাদেও বিক্ষোভ, অবস্থান, ঘেরাও, ধর্ণা ইত্যাদি কর্মসূচীতে মহিলারা বেশকিছু সংখ্যায় অংশ নেন বলে তথ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯৯]

খাদ্যের দাবিতে বিভিন্ন জেলায় মহিলাদের নেতৃত্বে ভুখা মিছিল সংগঠিত হয়। ১৯৭৪ সালের ১৯শে অক্টোবর কলকাতায় একটি বড় কেন্দ্রীয় ভুখা মিছিল সংগঠিত হয়। জলপাইগুড়ি

জেলার কাঠামবাড়িতে ১৯৭৪ সালের ৮ই নভেম্বর ৭৫জন মহিলার উপস্থিতিতে একটি কনভেনশন হয়। মূলতঃ খাদ্যসমস্যার মোকাবিলার জন্য এই কনভেনশন হয়। কনভেনশন থেকে পনের জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি গীতা সরকার, সহ-সভাপতি অলোকা চক্রবর্তী ও ননী দাস, সম্পাদিকা চিত্রা কুণ্ডু, সহ-সম্পাদিকা সন্ধ্যা সেন ও মিনতি মজুমদার সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।[১০০] এইভাবে দেখা যায় ১৯৭৪ সালে বামপন্থী মহিলারা খাদ্যের দাবিতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। মঞ্জরী গুপ্তের লেখা "দিকে দিকে অভিযান" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকেও এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। 'একসাথে' - তে তিনি লেখেন—"১৯৭৩ এর শেষভাগ থেকেই দিকে দিকে জনগণের বিক্ষোভ ফেটে পড়তে থাকে। ... খাদ্য চায় যে মানুষ তাকে বোঝাতে হবে কৃষকের হাতে জমি না এলে জমিদারি সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না হলে খাদ্য মেলে না। কাজ চায় যে মানুষ তাকে বোঝাতে হবে কৃষকের হাতে জমি না এলে কৃষকের অবস্থার উন্নতি না হলে শিল্পের বিকাশ হয় না, কাজ পাওয়া যায় না। শিক্ষা চায় যে মানুষ তাকে বোঝাতে হবে কোটি কোটি মানুষের ঘরে ক্ষুধার অন্ন না থাকলে শিক্ষার আলো জ্বালানো যায় না।.... আজকের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি তাঁদের গৌরবময় ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও আরও গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন।"[১০১]

১৯৭৫সালের ২৮-৩০ মার্চ হাওড়া জেলার সালকিয়াতে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পঞ্চদশ রাজ্য সম্মেলন হয় বলে জানা যায়। সম্মেলনে মোট ১৯টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব ছিল খাদ্য সংকট ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি। ১৯৭৫সালের ১৪ই মে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি বিভিন্ন জেলায় মহিলাদের নিয়ে ভুখা মিছিল সংগঠিত করে। এইসময় মহিলাদের যে সমস্ত কর্মসূচীর কথা জানা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ, খাদ্যদ্রব্য নিয়মিত সরবরাহের দাবি প্রভৃতি।

১৯৭৫-১৯৭৭ সাল জরুরী অবস্থার সময় সভা-সমিতি, মিছিল সমাবেশের অবাধ গতি না থাকায় মহিলারা মূলত সাংস্কৃতিক কর্মসূচী নেন বলে জানা যায়। তবে খাদ্যের জন্য আন্দোলন সীমিত হলেও মহিলারা বজায় রাখেন। যেমন- ১৯৭৬সালের নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কলকাতায় ১৪৪ধারা অমান্য করে।

১৯৭৭ সালে জরুরী অবস্থার সময়ও খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য মহিলারা আন্দোলন করে বলে জানা যায়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং খাদ্যশস্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির

ন্যায্য দামে সরকারী বন্টন ব্যবস্থা সংগঠিত করার দাবিতে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত মহিলাদের একটি সমাবেশ হয় ১৯৭৭সালের ১৭ জানুয়ারী। সমাবেশ থেকে পাঁচজন প্রতিনিধি রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি দেন। দশ দফা দাবি সম্বলিত এই স্মারকলিপির মূল বিষয় ছিল খাদ্য সমস্যার সমাধান।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য কমিটির পক্ষে লিখিত এই স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়:

১) সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমিয়ে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে হবে।

২) খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের পাইকারী ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে।

৩) নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সুলভ মূল্যে দেবার জন্য সরকারী ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) চাষযোগ্য জমির সুষ্ঠু বিনিময় বন্দোবস্ত করতে হবে, কৃষকদের বকেয়া ঋণ মুকুব ও সুলভ ঋণের বন্দোবস্ত করতে হবে।

৫) সেচের ও জল নিকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) চোরাকারবারী ও মজুতদারী কঠোর হস্তে দমন করতে হবে

৭) সকলের জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে হবে, কাজ সাপেক্ষে বেকারভাতা দিতে হবে।

৮) প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতনহার প্রবর্তন করতে হবে।

৯) বাধ্যতামূলক জমা আইন বাতিল করতে হবে।

১০) বোনাস কাটার আইন বাতিল করতে হবে।[১০২]

১৯৬৭-১৯৭৭ এই দশ বছর সময়কালে নারীদের কর্মসূচীর মূল অভিমুখ ছিল খাদ্য সমস্যার সমাধান। এই সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন গণসংগঠনের নারীরা জোটবদ্ধ হয়েছিলেন। মিছিল, সমাবেশের পাশাপাশি ডেপুটেশন দেওয়া ও গণ অবস্থানের মত কর্মসূচীও নারীরা গ্রহণ করেছেন। সর্বোপরি, আইন অমান্যের মত কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে জেলবন্দীও হয়েছেন।

মন্তব্য:

উপরের আলোচনা থেকে ১৯৪৭সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত খাদ্য আন্দোলনে বামপন্থী মহিলাদের ভূমিকা এবং খাদ্য সমস্যা সমাধানে তাঁদের নানা ধরনের কর্মসূচী লক্ষ্য করা যায়। এই কর্মসূচী পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে

১৯৫৮ সাল পর্যন্ত মহিলারা মূলত রেশনিং ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর জোর দেন। প্রচলিত রেশনিং ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং নতুন নতুন রেশন দোকান খোলার জন্য মহিলারা নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। গোপন মজুত উদ্ধার করা, সভা-মিছিল সংগঠিত করে মহিলাদের সংঘবদ্ধ করা, সংসদ অভিযান করে সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায় করা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা, প্রতিটি পরিবারে তথ্য নেওয়া, জেলার জেলার জেলাশাসকের কাছ থেকে খাদ্যের জন্য বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করার মত কর্মসূচী গ্রহণ করেন। পাশাপাশি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেদের উদ্যোগে লঙ্গরখানা খোলা, ধান-চাল সংগ্রহ করা, দুগ্ধকেন্দ্র চালানোর মত নানা কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেন। এককভাবে সমিতির উদ্যোগে যেমন কিছু কর্মসূচী নেওয়া হয় তেমনি দ্রুততার সঙ্গে সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন গণসংগঠনের সাথে যৌথ কর্মসূচী পালন করেন মহিলারা। বিভিন্ন সম্মেলনে খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণের পাশাপাশি আইন অমান্য করা, প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্বাক্ষর সম্বলিত পোস্টকার্ড প্রেরণ করেন মহিলারা।

১৯৫৯সালে খাদ্যসংকট চরমে পৌঁছায়। এই সংকট মোকাবিলা করার জন্য গড়ে ওঠা মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে মহিলারা দুটি পর্যায়ের আন্দোলনেই অংশ নেন। আইন অমান্য করে বেশকিছু মহিলা কারাবরণ করেন। বামপন্থী মহিলা সাংসদ ও বিধায়ক যথাক্রমে সংসদে ও বিধানসভায় এই খাদ্য সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং সরকারী নীতির নিন্দা করেন। ১৯৫৯ সালে খাদ্যের দাবিতে দলে দলে গ্রাম ছেড়ে ক্ষুধার্ত লোকেরা খাদ্যের আশায় কলকাতায় আসতে শুরু করেন এবং কলকাতার ফুটপাতে আশ্রয় নেন। ফলে কলকাতায় ফুটপাতজীবনের বাড়াবাড়ি সেই সময়েই শুরু হয়। তাই, ১৯৫৯সালের খাদ্য আন্দোলন মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক ছিল বলা যায়।

১৯৫৯এর খাদ্য আন্দোলন কলকাতা কেন্দ্রিক থাকলেও ১৯৬৬-এর খাদ্য আন্দোলন বিভিন্ন জেলায় এমনকি মফঃস্বল জেলাগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্রামীন মহিলাদের উপস্থিতির চিত্রটিও পরিস্ফুট হয়। রাজ্যপালের কাছে দাবি উত্থাপনের পাশাপাশি খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে ১৯৬৬-এর খাদ্য আন্দোলনে নিহতদের পরিবারবর্গের পাশে দাঁড়ান মহিলারা। বিভিন্ন গ্রামীন এলাকায় খাদ্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী পুরুষদের জোর করে গ্রেপ্তার করলে মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল এলাকাগুলিতে যান বলে তথ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৯৬৭-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে এক অস্থির সময়কাল। বারবার সরকারের

পরিবর্তন, মধ্যবর্তী নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি শাসনের ফলে বামপন্থী মহিলারা বিভিন্ন গণসংগঠনের সাথে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করেন। জেলায় জেলায় আইন অমান্য করে কারাবরণ করা ছাড়াও বিভিন্ন বামপন্থী মহিলা সংগঠনের উদ্যোগে যুক্ত রাজ্য কনভেনশন হয়। সারাদিনব্যাপী রাজভবনের সামনে অবস্থান করে রাজ্যপালের কাছে দাবিপত্র পেশ, জেলায় জেলায় ভুখা মিছিল করা হয় মহিলাদের পক্ষ থেকে। এইভাবে দেখা যায় স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়া পর্যন্ত বামপন্থী মহিলারা সীমিত শক্তি নিয়ে খাদ্য সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে আসেন এবং অন্যান্য মহিলাদের সংগঠিত করেন।

তথ্যসূত্র :

১। চক্রবর্তী রেণু, *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা (১৯৪০-১৯৯৮)*, অনুবাদ পুষ্পময়ী বোস ও মণিকুন্তলা সেন, মনীষা (তারিখ বিহীন) পৃ. ২৮-২৯

২। সেন মণিকুন্তলা, *সেদিনের কথা*, নবপত্র প্রকাশনা, পৃ. ৭৬-৭৭

৩। চক্রবর্তী রেণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৪। সেন মণিকুন্তলা,পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭

৫। চক্রবর্তী রেণু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৬। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি - মণিকুন্তলা সেন জনজাগরণে নারীজাগরণে, থীমা ২০১০, পৃ. ৭১

৭। চক্রবর্তী রেণু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৮। চক্রবর্তী রেণু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৯। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বামফ্রন্ট, *ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের ৫০ বছর*,২০০৯ আগস্ট,পৃ.৪-৫

১০। চক্রবর্তী রেণু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

১১। সেন মণিকুন্তলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

১২। A Brief Note of Mani Kuntala Sen, Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Sd/H.N. Sircar, 2.4.48, Police File No.- 619/36

১৩। By order of the Governor, Sd/L.A.D. Costa. Police File No.- 619/36

১৪। পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬, ১৯৫০ সালের ১৬ই গভর্ণরের পক্ষ থেকে মণিকুন্তলা সেন সম্পর্কে যে যে অভিযোগ আনেন তারমধ্যে খড়্গাপুরে রেলওয়ে কর্মী ও তাঁদের

পরিবারবর্গকে নিয়ে রেশনের দাবিতে আন্দোলন ছিল অন্যতম।

১৫। C.A.B. reports on 6.9.48, Police File no. 789 (46)

১৬। মুখোপাধ্যায় কনক, *নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা,* পৃ. ১১০

১৭। ঘরে বাইরে, ১৩৫৯-৬০, ২য় বর্ষ, পৃ. ৩৪

১৮। ঘরে বাইরে, ১৩৫৯-৬০, ৫ম সংখ্যা তমলুক কোর্টে এস.ডি.ও-র সদর দপ্তরে খাদ্যের দাবিতে কৃষক সমিতি ও মহিলা সমিতির নেতৃত্বে মিছিলে নেতৃত্ব দেন গীতা মুখার্জী। এই মিছিলের বিবরণ 'ঘরে বাইরে'-তে লেখা '*একটি মিছিল*'- নামক প্রবন্ধে পাওয়া যায়।

১৯। ঘরে বাইরে, ১৩৫৯-৬০, ৫ম সংখ্যা

২০। ঘরে বাইরে, ১৩৫৯-৬০, ৫ম সংখ্যা

২১। ঘরে বাইরে, ১৩৫৯-৬০, ৫ম সংখ্যা

২২। ঘরে বাইরে, ১৩৫৯-৬০, ৫ম সংখ্যা

২৩। পুলিশ ফাইল নং - ৩৮৯০/৪৯(P) F

২৪। ঘরে বাইরে, ১৩৫৯-৬০, শারদীয়া, পৃ. ২৮৭-২৮৮

২৫। ঘরে বাইরে, ১৩৫৯-৬০, শারদীয়া, পৃ. ২৮৭-২৮৮

২৬। ঘরে বাইরে, আন্দোলনে মেয়েরা, ১৩৬২-৬৩

২৭। মুখোপাধ্যায় কনক, *নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা,* পৃ. ১৪২

২৮। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

২৯। পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬

৩০। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

৩৮। বসুমতি পত্রিকা, ৩.১.১৯৫৯

৩৯। স্বাধীনতা পত্রিকা, ১.১.১৯৫৯

৪০। যুগান্তর পত্রিকা, ২.১.১৯৫৯

৪১। Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the constitution of India, 28th September 1959; ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী সিরিজ - ৩, কলকাতা ১৯৬৭, পৃ. ৭৫

৪২। মজুমদার দিলীপ, *পশ্চিমবঙ্গের গণ আন্দোলন ও খাদ্য আন্দোলন,* পৃ. ১৫

৪৩। Das Suranjan & Bandyopadhyay Premansu Kumar : *Food Movement of 1959,* P.63

৪৪। স্বাধীনতা পত্রিকা, ২৫.২.১৯৫৯; ১৯৫৯ সালের ৪ঠা আগস্ট লোকসভার বিতর্কেও রেণু চক্রবর্তী নানা প্রশ্ন তুলে ধরেন। Lok Sabha Debates, 4 August 1959, Lok Sabha Debates, [2nd Series, Vol. 32/1, Cols. 307-317]

৪৫। যুগান্তর পত্রিকা,১.১.১৯৫৯

৪৬। পুলিশ ফাইল নং - ৩৮৫২/৪৯

৪৭। দেশহিতৈষী, ১৯৯৪

৪৮। Das Suranjan & Bandyopadhyay Premamsu Kumar পূর্বোক্ত

৪৯। স্বাধীনতা, ৮.৯.১৯৫৯

৫০। Amrita Bazar Patrika, 26 August 1959

৫১। মজুমদার দিলীপ : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

৫২। Amrita Bazar Patrika, 22 August, 1959

৫৩। মজুমদার দিলীপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৫৪। মজুমদার দিলীপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৫৫। মজুমদার দিলীপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৫৬। স্বাধীনতা, ১৩৬৬ সন ৬ই ভাদ্র

৫৭। স্বাধীনতা, ৭ই ভাদ্র, ১৩৬৬ সন

৫৮। স্বাধীনতা, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

৫৯। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, জনজাগরণে নারীজাগরণে, থীমা প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ২৫৭

৬০। মজুমদার দিলীপ, পূর্বোক্ত পৃ. ৪৪

৬১। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮-২৫৯

৬২। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ.২৫৮-২৫৯

৬৩। স্বাধীনতা, ২৪শে ভাদ্র,১৩৬৬ সন

৬৪। স্বাধীনতা, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

৬৫। Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the Provisions of the Constitution of India, 25th September 1959;মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫০-৩৫৫

১৯৫৯ সালের ৩১শে আগস্ট খাদ্যের দাবিতে মিছিলে পুলিশ যে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল তার প্রতিবাদ জানিয়ে ১৯৫৯ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর বিধানসভায় মণিকুন্তলা সেন যে বক্তব্য রাখেন তার থেকে প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারী হিসাবে বেশকিছু তথ্য তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায়।

৬৬। Lok Sabha Debates, © Food Situation in West Bengal, [2 September 1959, Lok Sabha Debates, 2nd series, vol.34/1. cols. 5874-90]

৬৭। ঘরে বাইরে, ১৩৭২-৭৩

৬৮। ঘরে বাইরে, ১৩৭২-৭৩

৬৯। ঘরে বাইরে, ১৩৭২-৭৩ পৃ. ৭৬

৭০। নন্দন, ২০১৫, ৪ঠা জুলাই : পৃ. ৬৪

৭১। ঘরে বাইরে, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭২

৭২। মুখোপাধ্যায় কনক, *নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা,* পৃ. ১৭৫-১৭৬

৭৩। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫-২০৬

৭৪। বিশ্বাস অনিল,*বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য,* ৫ম খণ্ড,পৃ. ৫২১-৫২৬

৭৫। গণশক্তি, ১৯৭৩সাল ৬ই আগস্ট

৭৬। গণশক্তি, ১৯৭৩সাল ৬ই আগস্ট

৭৭। গণশক্তি, ১৯৭৩সাল ১৪ই আগস্ট

৭৮। আচার্য পঙ্কজ, *আন্দোলনের পথে পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী মহিলারা,* একসাথে, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০

৭৯। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত পৃ. ২১৭-২১৮

৮০। গণশক্তি, ১৯৭৩ সালের ২৮ শে আগস্ট

৮১। গণশক্তি, ১৯৭৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর

৮২। গণশক্তি, ১৯৭৩ সালের ৩রা অক্টোবর

৮৩। আচার্য পঙ্কজ নির্বাচিত রচনা,*খাদ্য আন্দোলনে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি,* পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ১৯৮৩ জুন, পৃ. ৩৩-৩৮

৮৪। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯-২২১

৮৫। গণশক্তি, ১৯৭৪ সালের ২৩শে জানুয়ারি

৮৬। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১-২২২

৮৭। গণশক্তি, ১৯৭৪ সালের ১২ই ও ১৩ই মার্চ

৮৮। গণশক্তি, ১৯৭৪ সালের ৮ই মার্চ

৮৯। গণশক্তি, ১৯৭৪ সালের ২৫শে মার্চ

৯০। গণশক্তি, ১৯৭৪ সালের ৩০শে মার্চ

৯১। গণশক্তি, ১৯৭৪ সালের ১০ই এপ্রিল

৯২। গণশক্তি, ১৯৭৪ সালের ১১ই এপ্রিল

৯৩। গণশক্তি, ১৯৭৪ সালের ২১শে এপ্রিল

৯৪। গণশক্তি, ১৯৭৪ সালের ২রা জুন

৯৫। গণশক্তি, ১৯৭৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর

৯৬। গণশক্তি, ১৯৭৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর

৯৭। গণশক্তি, ১৯৭৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর

৯৮। গণশক্তি, ১৯৭৪ সালের ১৩ই অক্টোবর

৯৯। গণশক্তি, ১৯৭৪ সালের ১৩ই অক্টোবর

১০০। গণশক্তি, ১৯৭৪ সালের ৮ই নভেম্বর

১০১। মঞ্জরী গুপ্ত, *দিকে দিকে গণ অভিযান*, একসাথে, বৈশাখ, ১৩৮১

১০২। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলার বামপন্থী নারীদের পরিচিতি, বিবরণ ও বিশ্লেষণ

১৯৪৭-১৯৭৭খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় বামপন্থী নারীদের সংগঠন, আন্দোলন ও কার্যকলাপ এই গবেষণাপত্রের মূল আলোচ্য বিষয়। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণতা দিতে গেলে যে সমস্ত নারীরা বামপন্থী আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন তাঁদের পরিচিতি, তাঁদের জীবন, কাজের বিভিন্ন দিক ও চিন্তাভাবনা আলোচনা করা জরুরী। বামপন্থী নারী আন্দোলনের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে গেলে একদিকে যেমন নারীদের সংগঠনে যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপট আলোচনা করা প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মহিলারা কিভাবে রাজনীতির আঙিনায় যুক্ত হয়েছিলেন এবং অনেকক্ষেত্রে সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন করেও কিভাবে নিজেদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে নিযুক্ত রেখেছিলেন তাও বিশ্লেষণ করা দরকার। আর এইসমস্ত দিক আলোচনা করতে গিয়ে যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নে পর্যালোচনা করা হল।

ছাত্র আন্দোলন থেকে বামপন্থী নারী আন্দোলন :

ছাত্রাবস্থায় অনেক ছাত্রী বামপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিতে নিজেদের যুক্ত করেন। কমিউনিস্ট পার্টি, লেবার পার্টি, কংগ্রেস সোস্যলিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর.এস.পি প্রভৃতি দলের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রীরা প্রথমে ছাত্রীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলবার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন। তারই ফলস্বরূপ ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে একটি ছাত্রী সংঘ বা Girls Students' Association গড়ে ওঠে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মহিলা কর্মীরা এগিয়ে এসে এই সংগঠনটি গড়ে তোলেন। যেমন- কমিউনিস্ট পার্টির কনক দাশগুপ্ত (মুখার্জি), শান্তি সরকার (বসু), কল্যাণী মুখার্জি, চিনু ঘোষ, প্রীতি লাহিড়ী(ব্যানার্জী), লেবার পার্টির উমা ঘোষ, গীতা ব্যানার্জি, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির অনিমা ব্যানার্জি কে নিয়ে প্রথম গার্লস স্টুডেন্টস্ কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে থাকা ছাত্রীরা যেমন ছিলেন নারী সমাজের শিক্ষিত অংশ তেমনি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ, বলা যায়, অবিভক্ত বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রথম সারির নেত্রী মণিকুন্তলা সেন ছাত্রাবস্থায় বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে মহিলাদের নিয়ে সংগঠন

গড়ার কাজে জেলায় জেলায় ঘুরেছেন।[১] ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়েই রাজনীতিতে প্রবেশ করেন কনক মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৯খ্রি. গার্লস স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিকা ছিলেন। ১৯৪৩ খ্রি. যোগ দেন মহিলা আন্দোলনে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।[২] স্কুলে পড়ার সময়ই গীতা মুখার্জি ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন। বেআইনী কমিউনিস্ট গ্রুপের সদস্যা হন। ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব দাবিদাওয়ার বহু আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার ফলশ্রুতিতে অবিভক্ত বাংলার বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। অসাধারণ বাগ্মী সংসদ গীতা মুখার্জি সংসদের বাইরে ও ভিতরে মহিলাদের অধিকারের জন্য নিরলস লড়াই চালান। রাজশাহী জেলার চাপাই নবাবগঞ্জের নাচোল এলাকায় তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র ছাত্র অবস্থাতেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে বেথুন কলেজে পড়াকালীনই তিনি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যা হন। নারী আন্দোলনের প্রগতিশীল ইতিবাচক চিন্তাচেতনার জন্য ক্রমপর্যায়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৬২-৭৮ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত চারবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন।[৩] ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হয়ে সুরমা উপত্যকায় কাছাড় জেলায় বামপন্থী মতাদর্শকে জনপ্রিয় করে তোলেন অপর্ণা পালচৌধুরী। কলেজে পড়ার সময়ই সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি তাঁকে রাজনীতিতে আগ্রহী করে তোলে। ১৯৪১খ্রিষ্টাব্দে ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রী সংগঠনের সম্পাদিকা হন তিনি। সিলেটে যে নানকর গোলামি প্রথা চালু ছিল, তার বিরুদ্ধে মহিলা সমিতির নেতৃত্বে অপর্ণা পালচৌধুরী লড়াই করেন।[৪] বিলেতে পড়তে গিয়ে কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্তের প্রভাবে সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশে ফেরেন রেণু চক্রবর্তী। কমিউনিস্ট পার্টিতে তিনি যোগ দেন। ১৯৫২-৬২ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী রূপে লোকসভায় নির্বাচিত হন। চারের দশকের ছাত্র আন্দোলনের প্রথম সারির নেত্রী ছিলেন অলকা চট্টোপাধ্যায়। তিনি সারা বাংলা ছাত্রী সংঘের সম্পাদিকা ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসি বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা হন। বামপন্থী মহিলা নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের অনুপ্রেরণায় ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতে যুক্ত হন অনিলা দেবী। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি তৈরির সময়েই তিনি প্রত্যক্ষ সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা হন। পরবর্তীকালে বামফ্রন্ট আমলে শিক্ষক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৫] বাঁকুড়া জেলার প্রথম মহিলা কমিউনিস্ট সদস্যা ভক্তি ঘোষ। দাদা অজিত সিংহের প্রভাবে ছাত্রী অবস্থাতেই রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং পরে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে মহিলা আন্দোলনে যুক্ত

হয়ে পড়েন। তিনি বাঁকুড়া জেলা পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সভানেত্রী এবং রাজ্য সংগঠনের সহ-সভানেত্রী ছিলেন।[৬] ছাত্রাবস্থাতেই রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন ময়মনসিংহের মায়া চক্রবর্তী। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন। বেথুন কলেজে পড়ার সময় থেকেই ছাত্রী সংঘ এবং পরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন লেখিকা সুপ্রিয়া আচার্য। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। নারীমুক্তি আন্দোলনে ও প্রগতিশীল সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুপ্রিয়া আচার্যের অবদান উল্লেখযোগ্য। বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী নেত্রী ছিলেন অনুপমা বসু। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সময়ই তিনি যুক্ত হন ছাত্রী সংঘের সঙ্গে। পরবর্তীকালে বামপন্থী রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে যুক্ত হয়ে পড়েন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজে। পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে থেকে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ছাত্রীজীবনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন আরতি ঘোষ। শ্রীরামপুর কলেজে তিনি ছাত্র সংসদের সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। কৃষক ও মহিলা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেওয়ার ফলে বেশ কয়েক বছর কারান্তরালে ছিলেন। মেদিনীপুরের রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক বিভাগের ছাত্রী থাকাকালীন ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন ছায়া বেরা। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি পরিচালিত সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা একসাথের তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখিকা। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে নন্দনপুর কেন্দ্রে পরপর চারবার নির্বাচিত বিধায়ক ছিলেন। [৭]

সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যকলাপ থেকে বামপন্থী আন্দোলনে আগত নারীরা :

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বিপ্লবী দল থেকে অনেক মহিলা পরবর্তীকালে বামপন্থী মতাদর্শে আকৃষ্ট হন এবং নারী আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকজনের দৃষ্টান্ত সংক্ষেপে তুলে ধরা যায়। মাস্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবীদলের অন্যতম সদস্যা ছিলেন কল্পনা দত্ত (যোশী)[৮]। কলেজ জীবনে পূর্ণেন্দু দস্তিদারের সংস্পর্শে এসে মাস্টারদা সূর্য সেনের দলে যোগ দেন। চট্টগ্রামে মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গী ছিলেন কল্পনা। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে গান্ধীজির মধ্যস্থতায় কারামুক্ত হয়ে যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসাবে বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় চট্টগ্রাম থেকে কাজ করেছেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের অন্যতম কর্মী ছিলেন ইন্দুমতি সিংহ।[৯] চট্টগ্রাম

অস্ত্রাগার লুন্ঠনের অন্যতম নেতা অনন্ত সিংহের বড় বোন ছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনে ধৃত বিপ্লবীদের মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন ইন্দুমতি সিংহ। রাজবন্দী হিসাবে প্রায় ছয় বছর জেলে থাকেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি বামপন্থী আদর্শে আকৃষ্ট হন এবং সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে আন্দোলনে সামিল হন। সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধানের পর পুলিশ তাঁর উপরে অমানুষিক অত্যাচার চালায়। কিন্তু কোন তথ্যই পুলিশ ইন্দুমতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারে নি। দেশ বিভাজনের পর তিনি কলকাতাতে তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেন কমলা মুখোপাধ্যায়।[১০] দাদা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সাইমন কমিশন বয়কট উপলক্ষে স্কুলে ধর্মঘট করার অপরাধে বহিস্কৃত হন এবং যুগান্তর দলের সংস্পর্শে আসেন। বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে গোপনে জড়িত ছিলেন বলে পুলিশ তাঁকে প্রথমে সিউড়ি ও পরে হিজলী জেলে বন্দী রাখে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পেয়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা নেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা ছিলেন আমরণ। উজ্জ্বলা রক্ষিত রায় ও তাঁর ভাই গোপনে বিপ্লবী দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ১৮ই মে তাঁকে কলকাতার ভবানীপুরে যুগান্তর দলের কর্মী শোভারানি দত্তর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পেয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক দলে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গঠিত সোসালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন।[১১]

যুগান্তর বিপ্লবী দলের কর্মীদের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক কাজে যুক্ত হন বাংলাদেশের ব্রজযোগিনীর ইন্দুসুধা ঘোষ। নিষিদ্ধ পুস্তক রাখা, রিভলবার রাখা এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে স্টেটসম্যান - সম্পাদক ওয়াটসনকে গুলি করার ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক কর্মীদের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে তিনি গ্রেপ্তার হন। মুক্তি পাওয়ার পর রথীন চক্রবর্তীর সংস্পর্শে আসেন এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। কলকাতার নারী সেবাসংঘের আবাসিক সুপারিনটেণ্ডেন্ট হিসেবে মহিলাদের সংঘটিত করেন।[১২] বিপ্লবী ভানু চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কাকা পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, প্রধানত তাঁরই প্রভাবে কিশোর বয়সে যোগ দেন যশোর-খুলনা যুবক সংঘে। ১৯৩০খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবী সংস্থার নির্দেশে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর

অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে ওঠে 'বান্ধব মহিলা সমিতি'। পরে বিপ্লবী নেতা ননীগোপাল বসু তাঁকে কমিউনিজমে দীক্ষা দেন। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন এবং কৃষক মহিলাদের সংগঠিত কাজে যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়।

স্বদেশী আন্দোলনে যুগান্তর দলের সক্রিয় সদস্যা ছিলেন শান্তি প্রধান। ১৯৩২-৩৪ খ্রি. একটি ষড়যন্ত্রের মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৪ মাস জেলে ছিলেন। মুক্তি পাওয়ার পর কিছুদিন তিনি আসামে নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন ও পার্টির গোপন কেন্দ্র থেকে কাজ পরিচালনা করেন। আজীবন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে যুগান্তর দলে যোগদান করেন সুহাসিনী গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর শশধর আচার্য ও তিনি নেতাদের নির্দেশে স্বামী-স্ত্রী সেজে অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত, জীবন ঘোষাল, প্রমুখদের চন্দননগরে আশ্রয় কেন্দ্রে রাখেন। ঐ বছরই গ্রেপ্তার হন এবং পুলিশের নির্মম অত্যাচারেও তিনি বিপ্লবীদের সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। ১৯৩২-৩৮ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত তিনি হিজলী জেলে বন্দী ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন ও সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৮খ্রিষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হলে একবছর বন্দী ছিলেন।[১৩] বীরভূমের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মহিলা সদস্যা সরোজিনী খাণ্ডার (নায়েক) বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। তাঁর কনিষ্ঠ ভাই হারানচন্দ্রের সংস্পর্শেই দুবরাজপুরের উপকণ্ঠে হালসোত গ্রামে বিপ্লবীদের একটি গোপন কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন সরোজিনী খাণ্ডার। বিপ্লবীদের শুধু আশ্রয়দাত্রী ছিলেন না, বৈপ্লবিক কাজের সহায়তার জন্য তাঁদের অর্থ সাহায্যও করতেন। আঙুলে ছুঁচ ফোটানো, হাতের সব নখ উপড়ে ফেলা প্রভৃতি শারীরিক নির্যাতন সত্ত্বেও পুলিশ তাঁর মুখ দিয়ে কোনো স্বীকারোক্তি বার করতে পারে নি। এরপর তিনি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে যোগ দেন এবং কৃষক মহিলাদের সংগঠিত করেন। অনুরূপভাবে যুগান্তর বিপ্লবীদের আশ্রয় দান, খাদ্য জোগান, অস্ত্রশস্ত্র রাখা, কাগজপত্র দেওয়া নেওয়া প্রভৃতি কাজে যুক্ত ছিলেন সুশীলা মিত্র। পরে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা হন এবং আঞ্চলিক মহিলা সমিতির পক্ষে কাজ করে যান।

১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে বিপ্লবী দলে যোগ দেন উমা সেন (দাশগুপ্ত)। দাদা অমরেন্দ্রনাথ সেনের পাশাপাশি সত্যভূষণ গুপ্ত, হেমেন গুপ্ত, শান্তিগোপাল সেন, জ্যোতিষ গুহ প্রমুখ বিপ্লবীরা উমা সেনকে বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে যোগ দেন ফরওয়ার্ড ব্লকে। বরিশালে বিপ্লবীদের গুপ্ত কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন ঊষা গুহঠাকুরতা। পুলিশের সন্দেহের দৃষ্টি

এড়িয়ে ঝুঁকি নিয়ে অনেক কাজ করেন। মনোরমা বসুর সমাজসেবামূলক কাজের প্রধান সহায়ক ছিলেন তিনি। এইসময় সমাজসেবামূলক কাজের পাশাপাশি মার্কসবাদে দীক্ষা লাভ করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদও অর্জন করেন।

অনুশীলন সমিতির অন্যতম সদস্যা রেণুকা রায়। ছাত্রী অবস্থাতেই তিনি বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল জেলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। স্কুল জীবনেই ঢাকায় লীলা নাগ প্রতিষ্ঠিত 'দীপালি সংঘ' -এর সদস্যা হিসাবে নানা বৈপ্লবিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন লতিকা সেন। তাঁর তিন ভাই-ই বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মহিলা সদস্যাদের মধ্যে একজন ছিলেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ২৭এপ্রিল রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলনে যে মিছিল বের হয় তাতে অংশগ্রহণ করে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।[১৪] স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রভা চ্যাটার্জী। খুল্লতাত প্রাণতোষ চ্যাটার্জী এবং পরিতোষ চ্যাটার্জির সান্নিধ্যে তিনি বিপ্লবী কাজে যুক্ত হন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন এবং আমৃত্যু তিনি কাজ করে যান। মণিকুন্তলা সেনের রচনা থেকে জানা যায় যে, ''যশোর-খুলনায় ছিলেন ভানুদি ও চারুলতা ঘোষ। দুজনেই এককালে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে পার্টিতে আসেন। ...রিলিফের জন্য অনেক ছোট-বড়ো মিছিল নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও রিলিফের কাজ শুরু করা—এসব এঁরা নিজেরাই করেছেন।''[১৫]

ভারতীয় কংগ্রেস থেকে বামপন্থায় অনুপ্রাণিত নারীরা :

বিপ্লবী দল থেকে যেমন অনেকেই বামপন্থী রাজনীতিতে আসেন অনুরূপভাবে স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার পর অনেক কর্মী বামপন্থী রাজনীতিতে নিজেদের যুক্ত করেন। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন মনোরমা বসু। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। চল্লিশের দশকের প্রথমে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা হন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তোলেন ও তার প্রথম সভানেত্রী হন। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও মহিলা সংগঠনের বিশিষ্ট নেত্রী ছিলেন নলিনীবালা মিশ্র। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় তৎকালীন বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী খুলনায় এলে নলিনীবালা ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে প্রায় দেড়হাজার নরনারী ১২ মাইল পথ পরিক্রমা করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লঙ্গরখানার দাবি পেশ করে।

৪০-এর দশকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারারুদ্ধ হন বাঁকুড়া জেলার সত্যবালা মুখোপাধ্যায় (চট্টোপাধ্যায়)। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে জেলায় যে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয় তিনি তার একমাত্র মহিলা সদস্যা ছিলেন। পরবর্তীকালে সত্যবালা কমিউনিস্ট পার্টির কর্মপন্থায় যুক্ত হন। চল্লিশের দশকের প্রথমদিকে তিনি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা হন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গোপন আস্তানার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারীর ভূমিকায় ছিলেন রানু চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির এবং ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী হলে কারাগারে বন্দী হন। 'বাংলাদেশের স্মৃতি' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন জেলের স্মৃতিকথা।[১৬] গান্ধীজির গণ-আন্দোলনের দ্বারা দিনাজপুর জেলায় যাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আশালতা চক্রবর্তী ছিলেন অন্যতম। কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হন ও কারাবরণ করেন। এরপর ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আশালতা চক্রবর্তী কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। দিনাজপুর শহর ও গ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার করা মহিলা সদস্য সংগ্রহে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

জ্যোতি চক্রবর্তী ও সুশীলা মিত্র সহ কয়েকজন দেশপ্রেমিক নারী কংগ্রেসের মধ্যে মহিলা সংগঠন গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করেন। 'সেবা সমিতি' নামে একটি সংগঠন গড়েন। জ্যোতি চক্রবর্তী হন ওই সংগঠনের সম্পাদিকা এবং সুশীলা মিত্র হন সভানেত্রী। বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন দুজনেই। কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ক্রমশ জ্যোতি চক্রবর্তী জাতীয় কংগ্রেসের আপস নীতির বিরুদ্ধে বামপন্থীদের সাথে যুক্ত হতে থাকেন। ১৯৫৪সালে কলকাতা জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সহ-সম্পাদিকা এবং ১৯৫৮ সালে সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির সদস্যা নির্বাচিত হন।[১৭]

কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বামপন্থী নারী আন্দোলনে আগমন :

কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অনেকেই নেত্রীত্বে অধিষ্ঠিত হন। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কণ্ঠমণি বর্মন। তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ছিলেন তিনি। চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির ইটাহার আঞ্চলিক কমিটির সদস্যাও ছিলেন। তেভাগা দাবি আদায়ের পাশাপাশি নারীর মৌলিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তিনি ছিলেন অগ্রণী। নিজ প্রচেষ্টায় সাক্ষরতা অর্জন করেছিলেন এবং এই কাজে মহিলাদের যুক্ত করতেও চেষ্টা করেছিলেন। বড়া কমলাপুরের কৃষক আন্দোলনের

মহিলা কর্মী ছিলেন চারুবালা হাজরা। তিনি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যা ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে তিনি গোপনে দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করেছেন বলে জানা যায়। দিনাজপুর জেলায় আধিয়ার প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করে জনপ্রিয় নেত্রী হয়ে ওঠেন জয়মণি বর্মণ। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম সংগঠনের কাজ চালিয়ে যান জয়মণি। এরই মধ্যে দিয়ে তিনি অর্জন করেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। ধনিয়াখালি থানা কৃষক সমিতির সহ-সভানেত্রী ছিলেন চামেলী বসু। ধনিয়াখালি থানার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা হিসাবে পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে পার্টি, মহিলা ও কৃষক সভা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। জলপাইগুড়ি জেলার তেভাগা আন্দোলনের একজন দক্ষ কর্মী তিলকতারিনী দেবী (নন্দী)। বোদার পাঁচপীড় কৃষক সমিতি গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল বলে জানা যায়। চল্লিশের দশকে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একজন দক্ষ কর্মী ছিলেন। দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন রানি দাশগুপ্ত। ১৭ বছর বয়সে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠন করে তিনি দিনাজপুরের মহিলাদের সংগঠিত করেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা ছিলেন। ১৯৬৪-৯৪ খ্রি. পর্যন্ত ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সম্পাদিকা ছিলেন। উত্তর ২৪ পরগণা হাড়োয়া ব্লকের তেভাগা ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সরমা সিং। ১৯৮৮ খ্রি. ব্লক কৃষক সভার সভানেত্রী হন। আমৃত্যু কমিউনিস্ট পার্টি (মা.) সদস্যা ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রি. দিনাজপুরে তেভাগা আন্দোলনে কৃষকদের উপর পুলিশ গুলি চালালে কৃষকদের আত্মগোপন করতে সাহায্য করেন। স্নেহলতা সিংহ। তিনি উদ্বাস্তু আন্দোলন ও মহিলা আন্দোলনের প্রথম সারির নেত্রী ছিলেন। অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুরে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সদস্যা ছিলেন এবং আমৃত্যু তিনি ওই পদে ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী বিমলা মাজী। কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হন এবং কৃষক রমণীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।[১৮]

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বামপন্থায় অনুপ্রাণিত নারী:

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী মধ্যবিত্ত কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন পরিবারে অমিয়া দত্তের জন্ম হয় ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে। বিলাতি বস্ত্র পোড়ানো, গ্রামে মহিলাদের মুষ্টিভিক্ষা তোলা, স্বদেশিয়ানায় বিশ্বাসী যুবকদের আদর্শ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। পরে তিনি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে

২৭শে এপ্রিল রাজবন্দীদের মিছিলে যে চারজন নিহত হন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বাড়ির পরিবেশে স্বাদেশিকতার ছোঁয়া থাকায় স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন অমিয়া সেন। দাদাদের অনুপ্রেরণায় তিনি কমিউনিস্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। আত্মীয় পরিজনদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি গোপনে পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।[১৯] অবিভক্ত বাংলায় রক্ষণশীল সমাজের বাধা অতিক্রম করে যাঁরা সাহসের সঙ্গে নারী আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পঙ্কজ আচার্য। দাদা উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবীদলের সদস্য। এই দলের সংযোগকারীর কাজ করতেন পঙ্কজ আচার্য। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যাপদ লাভ করেন এবং আমরণ এই কাজে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায় সমাজসেবী ও নারী আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। ১৯২১সালে গান্ধীজির আহ্বানে অনশন পালন করেন এবং ১৯৩০-৩১ সালে আইন অমান্য করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৩ সালে মন্বন্তরের সময় কৃষ্ণনগরে কমিউনিস্ট নেতা অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে নদীয়া জেলায় 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গড়ে তুলতে এগিয়ে এসেছিলেন। সমিতির মুখপত্র 'ঘরে বাইরে'-র সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হলে অন্যান্য বহু মহিলা নেত্রীদের সঙ্গে মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়ও গ্রেপ্তার হন। পারিবারিক পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থান উঁচুতে হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রথমে কংগ্রেস ও পরে বামপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সংগ্রামী জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন।[২০] রংপুরে তেভাগা আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল রানি মুখার্জির। স্বামী সুধীর মুখার্জির অনুপ্রেরণায় তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হন। ৪৩এর মন্বন্তরে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল মহিলা সমিতি। সে কাজে নেতৃত্ব দেন রানি মুখার্জি। ছাত্রীজীবনে স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন কল্যানী মিশ্র (দাস)। ডাক্তারি পড়ে কর্মরতা অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যাপদ লাভ করেন। আমরণ তিনি কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ও গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। শ্রীহট্ট শহরের মেডিক্যাল কলেজে পড়তে পড়তে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যান অনিমা সিংহ। ছাত্র রাজনীতি করার সময়ই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা হন। পরবর্তীকালে তিনি কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং আমৃত্যু তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতির কাজ করেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বামপন্থী নারী আন্দোলনে মহিলাদের যোগদানের প্রেক্ষাপট ছিল নানাধরনের। জাতীয় কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় থাকা কিছু মহিলা যেমন বামপন্থী আন্দোলনে এসেছেন, সেইরকমই বিপ্লববাদের সাথে যুক্ত মহিলারাও এসেছিলেন। বামপন্থী ছাত্রী

আন্দোলনের সাথে যুক্ত মহিলারা ক্রমশঃ নারী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমেও অনেক মহিলা বামপন্থী নারী রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। মূলতঃ রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয় তাদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছিল, সেক্ষেত্রে নারীদের অবস্থার উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

প্রাথমিক পর্যায়ে বামপন্থী মহিলাদের কার্যক্ষেত্রের উৎসস্থল:

প্রাক স্বাধীনতাপর্বে অবিভক্ত বাংলায় গড়ে ওঠা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রাথমিকপর্বে সারা বাংলায় সমস্ত জেলায় সক্রিয় ছিল না। ১৯৪৩ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। তার আগে প্রস্তুতিপর্বে মোট ১২টি জেলায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ও জেলা কমিটি গঠন করা হয়। এই ১২টি জেলা হল— কলকাতা, হুগলী, বর্ধমান, বরিশাল, ঢাকা, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও কুমিল্লা।[২১] অর্থাৎ কলকাতা, হুগলী ও বর্ধমান ছাড়া বাকী জেলাগুলি ছিল পূর্ববঙ্গের। এর থেকে বলা যায় যে, প্রথমপর্বে নারী আন্দোলন পূর্ববঙ্গে সক্রিয় ছিল। তাই দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গড়ে ওঠা ‘মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’তে প্রথম পর্বে যাঁরা নেতৃত্ব দেন তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুজন ছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের যশোর, খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, রংপুর, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি এলাকা থেকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় প্রথম পর্বের মহিলা নেত্রী মণিকুন্তলা সেন ছিলেন বরিশালের মেয়ে। বরিশালের বিপ্লবী আবহাওয়া তাঁকে যে আকৃষ্ট করে তিনি তাঁর আত্মজীবনী ‘সেদিনের কথা’ - তে তা বারবার উল্লেখ করেছেন।[২২] সারা বাংলার নারী আন্দোলনকে সংগঠিত করার কাজে তিনি মুখ্য ভূমিকা নেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সূচনাপর্বের অন্যতম উদ্যোক্তা যুঁইফুল রায় ছিলেন বরিশালের মেয়ে। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩৮-৩৯ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে মার্কসবাদের চর্চা শুরু করেন। মনোরমা বসু, সরযূ সেন, কিরণবালা গুপ্তা প্রমুখ মহিলা নেত্রীদের সঙ্গে তিনি ‘বরিশাল মহিলা সমিতি’ নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে তিনি আত্মরক্ষা সমিতির অন্যতম সংগঠকে পরিণত হন। সারা বাংলায় নারী আন্দোলনকে সংগঠিতভাবে পরিচালনার জন্য যে ৫জন মহিলা সদস্যকে নিয়ে প্রাদেশিক মহিলা ফ্রাকশন ও পরে প্রাদেশিক স্পেশাল মেল গঠন করা হয় যুঁইফুল রায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।[২৩]

বরিশাল জেলার বানরীপাড়া থানার নরোত্তমপুর গ্রামে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৯৭ সালের ১৮ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন মনোরমা বসু। আইন অমান্য আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলনসহ বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হন। চল্লিশের দশকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। বরিশালে মহিলাদের সংগঠিত করার কাজে তিনি মুখ্য ভূমিকা নেন। এছাড়া ছিলেন শোভা সেন, বিভা দাস, রেণু বসু, সরযু সেন, বীণা সেন, কিরণ দাস, অমিয় সেন, বাণী দাশগুপ্ত, তৃপ্তি দাশগুপ্ত, কিরণবালা দেবী, লাবণ্যপ্রভা চ্যাটার্জী প্রমুখ। অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলায় সম্পন্ন বনেদী পরিবারে ১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন ভানু দেবী। খুলনা জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম সম্পাদিকা ছিলেন তিনি। ত্রিশের দশকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত খুলনায় অভাবী হিন্দু-মুসলমান মেয়েদের মাঝে গিয়ে নেতৃত্ব দেন তিনি ও চারুলতা ঘোষ।

বাংলাদেশের যশোরে ১৯২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন গীতা মুখার্জী। ১৯৪২ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদলাভ করেন। মহিলা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী, সুযোগ্য সাংসদ ছিলেন তিনি।[২৪]বাংলাদেশের যশোরে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ৩০ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন বামপন্থী নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী কনক মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৮খ্রিষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৩৯ সালে গার্লস স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিকা ছিলেন। পরবর্তীকালে নারী আন্দোলনের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন এবং সারা বাংলায় নারী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।[২৫] ১৯১৩সালের ১৬ই নভেম্বর 'মহিলা আত্মরক্ষা' সমিতির কলকাতা জেলার সম্পাদিকা অনিলা দেবী যশোরে জ্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

১৯০০ সালের এপ্রিল মাসে অধুনা বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার মাইজদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন জ্যোতি চক্রবর্তী। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। পরে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার সলিধ গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন গীতা সরকার। কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে রাজবন্দীদের দাবী আদায়ের জন্য ১৯৪৯ সালের ২৭শে এপ্রিল মিছিলে পুলিশের গুলিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই মিছিলেই মৃত্যু হয় অমিয়া সরকারের। তাঁরও জন্ম ১৯২৫ সালে অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলাদেশের প্রথম মহিলা নারী সদস্যা ছিলেন লতিকা সেন। তিনিও ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার পাইকপাড়া গ্রামে ১৩১৯সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন।[২৬]

শ্রীহট্ট জেলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একজন প্রথম সারির নেত্রী ছিলেন অপর্ণা পালচৌধুরী। প্রথমে ছাত্র আন্দোলন ও পরে মহিলাদের মধ্যে গণসংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। শ্রীহট্ট জেলার ও পরে আসামে মহিলা ফ্রন্টের প্রসার ঘটানোর সূচনা হয় শ্রীহট্টের জেলা মহিলা সঙেঘর মাধ্যমে। এই সঙেঘর শশীপ্রভা দে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। শ্রীহট্ট জেলায় মহিলা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান ছিল তাঁরা হলেন ছাত্রী নেত্রী ডাঃ কল্যাণী দাস, অঞ্জলি দাস, হেনা দত্ত, মায়া গুপ্ত প্রমুখ। পরে মহিলা সমিতিতে যোগ দেন ইলা ভট্টাচার্য, মণি দত্ত, ছায়া চৌধুরী, সাধনা গুপ্ত, কণিকা দাস, গৌরী শর্মা, অসিতা পালচৌধুরী, অপর্ণা ধর, তুলসী ভট্টাচার্য, মানসী ভট্টাচার্য, মাধুরী ভট্টাচার্য, চঞ্চলা ভট্টাচায, সুষমা দে প্রমুখ।[২৭]

ঢাকা জেলায় যে সমস্ত বামপন্থী মহিলা নেত্রী মহিলাদের সংগঠিত করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নিবেদিতা নাগ। ১৯১৮সালের ৪ঠা আগস্ট বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের আমলাপাড়ায় মাতামহের বাড়িতে তাঁর জন্ম।[২৮] তিনি ঢাকা জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন। পরে তিনি ২৪পরগণায় মহিলা সমিতি গঠনের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। এছাড়া বিশেষ ভূমিকা নেন হিরন্ময়ী রায়, ডলি বসু, নিরুপমা গুপ্ত, সুদেবী মুখোপাধ্যায় এবং তার দুই মেয়ে বেবি ও বিউটি, রাধারানী সাহা, বীণা সেনগুপ্ত, উমা রায়, কল্যাণী চক্রবর্তী, কণা পাল প্রমুখ।[২৯]

প্রথম পর্যায়েই রংপুরে মহিলা আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠে। গ্রামে ও শহরে বেশকিছু সংখ্যক মহিলা কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনের কাজে যুক্ত হন। তাঁরা পরে কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত মহিলাদের নিয়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তোলেন। মহিলা কর্মীদের মধ্যে ছিলেন লিলি দে, রেবা রায়, রেখা রায়, সুশীলা রায়, সরলা রায় প্রমুখ।[৩০]এছাড়া মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠনে রংপুরে—অগ্রণী ভূমিকা নেন রানি মুখার্জী।[৩১]

পাবনা জেলায় মহিলা সমিতি পরিচালনা করতেন প্রতিমা ব্যানার্জী, মায়া সান্যাল, মায়া মৈত্র, প্রীতি লাহিড়ী প্রমুখ।[৩২]

কলকাতা জেলায় মহিলাদের সংগঠিত করার কাজে অন্যতম ভূমিকা ছিল লতিকা দাস, মণিকুন্তলা সেন, কনক মুখার্জী, সুধা রায়, ১৯৩৮সালে প্রথম রাজবন্দী মহিলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা কমলা চ্যাটার্জী প্রমুখ। এছাড়া, কলকাতার অন্যান্য মহিলা কর্মীরা হলেন— মাধুরী দাশগুপ্ত, অমিয় সাঁতরা, শান্তি দেবী, সুপ্রিয়া আচার্য, আশা রায়, ইরা শর্মা, শচী বিশ্বাস, রেবেকা পাল,

পঙ্কজ আচার্য, ইন্দুসুধা ঘোষ, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, ইন্দিরা সেন, চিন্তালতা সেন, নিরুপমা গুপ্তা, মুক্তি মিত্র, ইরা সান্যাল, নাজিমুন্নেসা আহমেদ, এলা রীড, অনিলা দেবী, কমলা চ্যাটার্জী, রেণু চক্রবর্তী প্রমুখ। এঁদের মধ্যে এলা রীড ছাড়া আর সবাই ছিলেন সবসময়ের কর্মী।[৩৩] এছাড়া রেণু চক্রবর্তীর মা, বীণা, সুষমা সেন, নীলিমা সেন, করুণা ব্যানার্জী, অণু দাশগুপ্ত, উমা চক্রবর্তী (স্নেহানবীশ) সুচিত্রা মিত্র, বাবলি সরকার, লীলা মজুমদার প্রমুক গঠনমূলক কাজে অংশ নেন বলে জানা যায়।[৩৪]

হুগলী জেলাতেও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয় প্রধানত কমিউনিস্ট মেয়ে কর্মীদের দ্বারা—যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মুক্তা কুমার, সন্ধ্যা চ্যাটার্জী, প্রতিভা গাঙ্গুলী প্রমুখ। এছাড়াও আরো কর্মী ছিলেন। যেমন; মুকুল সেন, আরতি চ্যাটার্জী, কৃষ্ণা চ্যাটার্জী, শেফালী চ্যাটার্জী, প্রভাবতী বিশ্বাস, চারুশীলা শীল, নলিনী মণ্ডল, হাসি ঘোষ প্রমুখ।[৩৫] মণিকুন্তলা সেনের লেখা থেকে জানা যায় যে, নেত্রীস্থানীয় ছিলেন মায়া চ্যাটার্জী, গৌরী চ্যাটার্জী, সুহাসিনী সেন, অমিয়া সেন, রেণু প্রমুখ।[৩৬]

বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলন ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম যুগের অন্যতম নেত্রী ছিলেন বর্ধমানের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতৃত্ব সৈয়দ শাহে দুল্লাহের স্ত্রী রাবিয়া বেগম।[৩৭] এছাড়া হবিবুল্লা সাহেবের স্ত্রী মাকুসুদা, করিম সাহেবের স্ত্রী সামসুন নীহার, বিনয় চৌধুরীর স্ত্রী শেফালী চৌধুরী, নলিনী বক্সি, হরেকৃষ্ণ কোঙারের স্ত্রী বিভা কোঙার, শিবরানী মুখার্জী, সুফিয়া কামাল প্রমুখ।[৩৮]

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনের পর অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ধীরে ধীরে সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। এইসমস্ত জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বাঁকুড়া জেলা। বাঁকুড়া জেলায় মহিলা সংগঠন ও গণ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন ভক্তি সেন (ঘোষ) ও মুক্তি সেন।[৩৯] বাঁকুড়া জেলার প্রথম মহিলা কমিউনিস্ট সদস্যা ছিলেন ভক্তি ঘোষ। তিনি ছিলেন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বাঁকুড়া জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাত্রী।[৪০] এছাড়া সোনামুখীর পাশাপাশি পাত্রসায়র, ইন্দাস, বেলেতোড়, বেতুড় প্রভৃতি গ্রামে মহিলাদের সংগঠিত করেন সত্যরানী হালদার।[৪১]

হাওড়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় সমিতি গড়ে উঠে কয়েকজন বামপন্থী মহিলা কর্মীর মাধ্যমে। যেমনঃ ডোমজুড়ের আন্দুলে সমিতি গড়ে ওঠে আশা সামন্তকে কেন্দ্র করে, সালকিয়ায় সুরুচি দেবী ও মীনা দেবীর পরিচালনায়, শ্যামবাজারে শান্তা বসু, বাগনানে নিরুপমা চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে শাখা সমিতি তৈরি হয়।[৪২]এছাড়া ছিলেন শৈলজা দে,[৪৩] প্রীতি লাহিড়ী প্রমুখ।[৪৪]

অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলার মহিলাদের সংগঠিত করার কাজে যাঁরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন নিবেদিতা নাগ, প্রতিভা গাঙ্গুলী, পঙ্কজ আচার্য, শোভা গাঙ্গুলী, গীতা ব্যানার্জী, মায়া চক্রবর্তী, কমলা দাস প্রমুখ।[৪৫]

মেদিনীপুর জেলায় মহিলাদের সংগঠিত করার কাজে যিনি অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা সাধনা পাত্র। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মেদিনীপুর জেলা কমিটির প্রথম সম্পাদিকা এবং পরে সভানেত্রী হন সাধনা পাত্র।[৪৬] এছাড়া অন্যান্য নেত্রীরা হলেন অনুপমা পট্টনায়ক, ঊষা চক্রবর্তী, সরোজিনী, বিমলা মাজী(বাতাসী)[৪৭],গীতা মুখার্জি প্রমুখ।[৪৮]

জলপাইগুড়ি জেলায় কর্মীসংখ্যা ছিল কম। বেলা লাহিড়ী ও মণিকুন্তলা সেন সমিতি গঠনের কাজে যেতেন। এখানকার নেত্রী ছিলেন গায়ত্রী দেবী।[৪৯] শচী সরকার, কল্পনা নিয়োগী, লায়লা সামাদ প্রমুখ।[৫০] জলপাইগুড়ির সঙ্গে সঙ্গে শিলিগুড়িতেও সমিতি তৈরি হয়। সমিতি চালাতেন চারু মজুমদারের স্ত্রী লীলা মজুমদার এবং মনোরঞ্জন রায়ের স্ত্রী সাবিত্রী রায়।[৫১]

দার্জিলিং জেলায় ১৯৪৩ সালে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে ওঠে। জানা যায় ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত এখানে কোন কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন ছিল না। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাধ্যমে এখানে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির গণ সংগঠন গড়ে ওঠে। নৃপেন্দ্রনারায়ণ হিন্দু পাবলিক স্কুলে ১৯৪৩ সালে প্রথম মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলন হয়। কনক মুখার্জী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। জানা যায় দার্জিলিঙের বিধায়ক রতনলাল ব্রাহ্মণের স্ত্রী হরিমায়াকে কর্মসমিতিতে এবং রণমায়া রাইনীকে সম্পাদিকা করা হয়েছিল। প্রথম চারজন উমা মণ্ডল, বনলতা মণ্ডল, পঙ্কজ গুহঠাকুরতা ও মীরা চট্টোপাধ্যায়কে পার্টির সভ্যপদ দিয়ে পার্টি ইউনিট গঠিত হয়েছিল ১৯৪৩সালে।[৫২] বীরভূম জেলায় ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। ঐ বছর ৫ই এপ্রিল সিউড়ীতে প্রথম সম্মেলন হয়। বীরভূম জেলা কমিটির প্রথম সভানেত্রী হন অমিয়া দাশগুপ্ত। সহ সভাপতি হাসেনা খাতুন। সম্পাদিকা হন বীণা মজুমদার এবং সহ-সম্পাদিকা সুষমা নাথ। অফিস সম্পাদিকা প্রভা লোহা, কোষাধ্যক্ষ সত্যবালা চ্যাটার্জী। জেলায় প্রথম পার্টি সভ্যা মল্লারপুরের সত্যবালা চ্যাটার্জী।[৫৩] ৮জনকে নিয়ে কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।[৫৪] কাজেই, উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠনের প্রথম পর্বে সারা বাংলায় এই সমিতি সক্রিয় ছিল না। মূলত কলকাতা এবং পূর্ববঙ্গেই এই সমিতি সক্রিয় ছিল।

সংগঠনে মহিলাদের জীবনযাপন:

বামপন্থী মহিলারা সাম্যবাদী আদর্শকে প্রচারের ও প্রসারের জন্য মূল লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন শ্রমজীবি, কৃষক, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করা এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই-এ তাঁদের অংশগ্রহণ করানো। তাই, শ্রমজীবী, কৃষক বা অন্যান্য স্তরের নারীদের মধ্যে মতাদর্শ প্রচার করতে গিয়ে বা তাঁদের আন্দোলনে নিয়ে আসার জন্য বামপন্থী মহিলা নেত্রীরা এক একটি এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে বা বলা যায় ব্যাপকভাবে প্রতিদিন ট্রেনে, বাসে, পায়ে হেঁটে জেলায় জেলায় গ্রামে ও কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় কোন না কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতেন। এটা ছিল তাঁদের সারা বৎসরের প্রতিদিনকার কাজ— যা বামপন্থী নারী আন্দোলনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অবিভক্ত বাংলায় প্রাদেশিক কমিটির সংগঠকদের বিভিন্ন জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। জুঁইফুল বসু-র দায়িত্ব ছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি পূর্ববাংলার জেলাগুলি। মণিকুন্তলা সেন ছিলেন হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ইত্যাদি অঞ্চলে। কনক মুখোপাধ্যায়ের দায়িত্ব ছিল রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, রাজশাহী, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে। মণিকুন্তলা সেনের লেখা থেকে জানা যায় যে, কলকাতা ও তার দুপাশে চব্বিশ পরগণা জেলার বিস্তৃত এলাকার কতকগুলি জায়গায় সমিতির শাখা স্থাপনের জন্য এবং রিলিফের কাজ ও আন্দোলনের কাজ দেখাশোনার জন্য মহিলা কর্মীরা যাতায়াত করতেন। বেলা লাহিড়ী, মায়া লাহিড়ী, প্রীতি লাহিড়ী, বাণী দাশগুপ্ত, পঙ্কজ লাহিড়ী, মুক্তি মিত্র প্রমুখ কর্মীরা এ কাজে সাহায্য করতেন। এছাড়া, মাধুরী দাশগুপ্ত, লাবণ্য মিত্র, অমিয়া দত্ত মধ্য ও উত্তর কলকাতায় ছোট বড় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।[৫৫] রেণু চক্রবর্তী, অপর্ণা পাল চৌধুরী, কনক মুখার্জী, পঙ্কজ আচার্য, গীতা মুখার্জী, (বিশ্বনাথ মুখার্জীর স্ত্রী), গীতা মুখার্জী (সুভাষ মুখার্জীর স্ত্রী), বিমলা মাজী, ভক্তি ঘোষ, সন্ধ্যা চ্যাটার্জী, মমতা সেন, শেফালী চৌধুরী - এইরকম কেন্দ্রীয় ও জেলায় জেলায় মহিলা নেত্রীরা ছিলেন যাঁরা সংগঠন গড়ার জন্য তাঁদের অমূল্য সময় ব্যয় করেছেন।

সংগঠক হিসাবে কাজ করার পাশাপাশি মহিলা নেতৃত্বদের মধ্যে কয়েকজন সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মণিকুন্তলা সেন ও রেণু চক্রবর্তী যথাক্রমে বিধানসভা ও লোকসভায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জয়ী হন। পৌরসভা নির্বাচনেও মহিলাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন সন্ধ্যা চ্যাটার্জী চন্দননগর কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্বাচিত হন। শিবরানী মিত্র কেশপুর ইউনিয়ন

বোর্ড নির্বাচনে জয়ী হয়ে পশ্চিমবাংলার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। রেবেকা পাল শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত হন। নিপুণা ব্যানার্জী আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, গীতা মুখার্জী তমলুক মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নিযুক্ত হন।[৫৬]

বামপন্থী নারীদের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁদের সাধারণ জীবনযাপন প্রণালী— যা সাধারণ মহিলাদের আকৃষ্ট করেছিল। নারী নেতৃত্বরা অনেকসময় নীচু তলার মহিলাদের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ার জন্য অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছল্য ও একটি বিষয় ছিল। উদাহরণস্বরূপ মণিকুন্তলা সেনের উল্লেখ করা যায়। তমলুক মহকুমায় কাজ করতে গিয়ে সাধারণ মহিলাদের সঙ্গে নিজের দূরত্ব ঘোচাবার জন্য সাবান দিয়ে স্নান করা ও পেস্ট ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন— "পুকুরঘাটে আমার এই বিলাসিতাগুলো ছোটো ছেলেমেয়েরা বেশ নজর করে দেখত, আমি লজ্জা পেতাম। ওরা হয়তো আমাকে দূরের মানুষ ভাববে তাই ওসব ছেড়ে দিলাম। তাছাড়া কাপড় কাচার সাবানই বা কোথায় পাব? আমার ময়লা শাড়িও তো ওদের তুলনায় ফরসা। কয়েকদিন পরে আর এ নিয়ে কিছু মনেও হত না।"[৫৭]

একইরকম দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলতেন অন্যান্য বামপন্থী মহিলারা। জানা যায় বামপন্থী মহিলারা যখন যেখানে কাজ করেছেন এবং থেকেছেন তখন তাঁরা সাধারণ মহিলাদের মতই থাকতেন। মণিকুন্তলা সেন লিখেছেন—"গীতা মুখার্জীকে তো সর্বদাই দেখতাম যখন একত্রে মেদিনীপুরে কাজ করেছি। মেদিনীপুর চষে বেড়াতে গিয়ে শরীরটা ওর আধখানা হয়ে গিয়েছিল।"[৫৮] বামপন্থী মহিলারা কখনো সাধারণ মহিলাদের, কখনো কৃষক রমণীদের আবার কখনো শ্রমজীবী মহিলাদের নিয়ে এবং তাঁদের মধ্যে থেকে তাঁরা কাজ করেছেন। বামপন্থী মহিলাদের দৃঢ়তার সাথে কাজ প্রশাসনকেও ভীত করে তুলেছিল। ভক্তি ঘোষের জেল থেকে মুক্তির ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে পুলিশ রিপোর্টে। কারণ তিনি মুক্তি পেলেই বাঁকুড়ার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শক্তিবৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। প্রশাসনের পাশাপাশি কংগ্রেসও যে ভীত তা দাসপুর থানার কংগ্রেস কমিটির চিঠি থেকে স্পষ্ট।[৫৯] অর্থাৎ তাঁদের কাজের ক্ষেত্র ছিল বিভিন্ন ধরনের। যেমন- কৃষক রমনীদের নিয়ে কাজ করেছেন মেদিনীপুরের বিমলা মাজী, বীরভূমের সত্যবালা চ্যাটার্জী। শ্রমজীবী মহিলাদের মধ্যে কাজ করেছেন গীতা মুখার্জী (সুভাষ মুখার্জীর স্ত্রী)। তাঁর কাজের ক্ষেত্র ছিল বজবজ জুট মিলের মহিলাদের নিয়ে। মণিকুন্তলা সেন খড়্গাপুরে রেলওয়ে শ্রমিক মেয়েদের নিয়ে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেন। মেদিনীপুরে ঊষা চক্রবর্তী কাজ করেন

সাফাই কর্মীদের নিয়ে। বস্তি উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে মহিলাদের মধ্যে কাজ করেছিলেন ঊষা চক্রবর্তী ও সুচিত্রা মিত্র।[৬০]

বামপন্থী মহিলাদের জীবনযাপনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল কমিউন প্রথার সাথে পরিচিতি অর্জন। বামপন্থী মহিলা ও পুরুষ সদস্যরা সাংগঠনিক কাজের প্রয়োজনে একই জায়গায় বসবাস করতেন যেটি এক অর্থে হয়ে উঠত এক সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি— যাকে কমিউনিস্টরা কমিউন নামে অভিহিত করেন। ভারতবর্ষে এই কমিউন প্রথা তখন খুব বেশি প্রচলিত ছিল না। কলকাতা এবং মফঃস্বলে তখন কিছু কমিউনের কথা জানা যায়। কনক মুখার্জীর লেখা থেকে এরকমই কিছু কমিউনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—"আমরা- সোমনাথ লাহিড়ী ও শচী (বিশ্বাস), ঊষা (দত্ত) ইরা (ব্যানার্জী), ছবি(পাল) প্রমথ দা (ভৌমিক), তুষারদা (চ্যাটার্জী), বিভূতি গুহ, ডাঃ অনিল ব্যানার্জী প্রমুখ ছিলাম সার্পেন্টাইন লেনের কমিউনে। আর ভবানী সেন, ইন্দিরাদি, সতীশদা (পাকড়াশী), খোকাদা-জুনুদি, রমেন সেনরা থাকতেন আমাদের কাছেই গোকুল বড়াল স্ট্রিটের কমিউনে। তখন আমাদের কমিউনগুলো সব মিলে যেন ছিল এক বৃহৎ কমিউনিস্ট যৌথ পরিবার।"[৬১] জানা যায় ১৯৪৩সালে কমিউনিস্ট পার্টি সদস্য হওয়ার পর মণিকুন্তলা সেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ করেন। বরিশালের মনোরমা গুহ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে দক্ষিণকলকাতায় পার্টি কমিউনে থাকতেন মণিকুন্তলা সেন।

জানা যায় ৯৫নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ- এর তিনতলায় পার্টির রাজ্য কমিটির একটি কমিউন ছিল। সেখানে মুজফ্ফর আহ্মদ থাকতেন। আর তার সঙ্গে থাকতেন বঙ্কিম মুখার্জী, প্রমোদ দাশগুপ্ত, আব্দুল মোমিন প্রমুখ কয়েকজন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। ১৯৪৬ এর দাঙ্গার পর এই সমস্ত নেতারা ঐ কমিউন ছেড়ে ৭৭নং ধর্মতলা স্ট্রিটে আর একটি কমিউনে চলে আসেন। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিউনের বাড়ির দোতলায় কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির একটি কমিউন ছিল। সেখানে কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কুমুদ বিশ্বাস, সুধাংশু দাশগুপ্ত, নরেন সেন, গোপাল আচার্য্য, সুধীন ধর (স্বাধীনতার পর রাজশাহী জেলে রাজবন্দীদের উপর গুলি চালনায় শহীদের মৃত্যুবরণ করেন)প্রমুখ থাকতেন। পরে এই কমিউনটি স্থানান্তরিত হয়ে ৩৮ নং ক্রিক রোতে চলে আসে। এই কমিউনেই বিয়ে হয় শ্রমিক নেতা গোপাল আচার্য্যের সঙ্গে মহিলা নেত্রী পঙ্কজ ভট্টাচার্য্যের। চিৎপুরে আর একটি কমিউনের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে ঢাকার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের সঙ্গে থাকতেন নেপাল নাগ, নিবেদিতা নাগ, বঙ্গেশ্বর রায় প্রমুখ।[৬২]

মহিলা নেত্রী নিবেদিতা নাগের লেখা থেকে জানা যায় যে, বেশকিছু কমিউনের কথা। তিনি লেখেন— "আমার ছোট বোনটি ছাড়াও ওই কমিউনে অনেক মহিলা কমরেড আমাদের সঙ্গে বসবাস করে গেছেন। তারমধ্যে মনে আছে কমরেড নিরুপমা গুপ্ত, পঙ্কজ আচার্য, হাসিনা বেগম, রানী রায়, মিনু বসু প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট পার্টি সদস্য বিভিন্ন সংস্থায় তখন চাকুরীও করতেন।"৬৩

মহিলা ও পুরুষ সদস্যরা একসাথে যেমন কমিউনে থাকতেন তেমনই বামপন্থী মহিলারা নিজেদের উদ্যোগে মহিলা কমিউনও গড়ে তোলেন। তথ্য থেকে জানা যায় যে, মধ্য কলকাতায় শশীভূষণ দে স্ট্রিটে একটি তেতলার দুই কামরা ছোট ফ্ল্যাটে মহিলাদের একটি পার্টি কমিউন ছিল। এই কমিউনে থাকতেন মণিকুন্তলা সেন, যুঁইফুল বসু, কনক মুখার্জী— এই তিনজন কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। আর থাকতেন মলিনা সরকার ও ইরা সান্যাল- এই দুজন ছাত্রী।

আবার রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে বা কমিউনিস্ট পার্টি ও তার গণসংগঠনগুলি বে-আইনী ঘোষিত হলে দলের কর্মীরা কমিউন ছেড়ে গোপন আস্তানাতে থাকতেন। এই গোপন আস্তানাগুলো ডেন নামে পরিচিত ছিল। যেমন— বেলা লাহিড়ী, পঙ্কজ আচার্য, কনক মুখার্জী প্রমুখ মহিলা নেত্রীরা ডেনে থেকেছেন। এই ডেনের বাড়িগুলো ভাড়া নেওয়া হত কোনো একটি পরিবারের পরিচয়ে। ফলে এখানে মেয়েদের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকত পরিবারের একটা স্বাভাবিক চেহারা দেবার জন্য। কারণ মেয়েরা কারো না কারোর মা-বোন-স্ত্রী বা কন্যা এইরকম কোন পরিচয়ে থাকত। মাঝেমধ্যেই পুলিশের নজরদারি এড়াতে একটি ডেন থেকে আর একটি ডেনে সদস্যদের স্থানান্তরিত করা হত।

বাংলার মধ্যে যেমন ডেন ছিল তেমনই বাংলার বাইরেও কিছু ডেন ছিল। যেমন বোম্বেতে পার্টির কেন্দ্রীয় ডেনে কনক মুখার্জীকে বাংলা থেকে পাঠানো হয়। মূলতঃ গোপনীয়তা রক্ষার কারণে এবং নিরাপত্তার কারণে এইসমস্ত ডেনে কেউই প্রকৃত নামে পরিচিত ছিলেন না। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা 'টেক' নাম অর্থাৎ ছদ্মনাম ছিল। যেমন- কনক মুখার্জীর ছদ্মনাম ছিল কমল, জুঁইফুল রায়ের নাম ছিল আয়েষা, বেলা চ্যাটার্জীর নাম ছিল ছোড়দি, রেণু চক্রবর্তীর ছদ্মনাম ছিল যশোদা ইত্যাদি।৬৪

বামপন্থী নারী আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল নিজেদের আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। চরমলক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বামপন্থী নারীরা কখনো জেলখানায়, কখনো গোপন আস্তানায় থেকে কষ্টকর জীবনযাপন করেছেন। জেলের মধ্যে অমানুষিক আচরণ সহ্যও যে করেছেন তা

অনুপমা বাগচির চিঠি থেকেই প্রমাণিত।[৬৫] নিজেদের আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য আত্মীয় পরিজন থেকে দূরে থেকে শুধু নিজেরা কষ্ট স্বীকার করেন নি, সন্তানদের অন্যের কাছে রেখে, কখনো নিজেদের সাথে জেলখানায় তাদের বড় করেছেন। আবার ছেলের শরীর খারাপের জন্য ইচ্ছে থাকলেও মিটিং-এ না যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশের সংবাদও পাওয়া যায় হেনা বেরার লেখা চিঠি থেকে।[৬৬] স্বাভাবিক জীবন থেকে সন্তানদের বঞ্চিত করে নিজেদের আদর্শকে বড় করে দেখেছেন। যেমন: কনক মুখার্জীর ছেলে বাবলু (সমর) নিবেদিতা নাগের ছেলে সুজয়, অপর্ণা পাল চৌধুরীর ছেলে বাপ্পা, ইলা মিত্রের মোহন, নিরুপমা গুপ্তের মেয়ে কৃষ্ণা, রেখা চৌধুরীর মেয়ে বাবলি, সুজাতা দাশগুপ্তের ছেলে বন্দী, সন্ধ্যা চ্যাটার্জীর মেয়ে মিঠু, কমলা মুখার্জীর ছেলে বাবুয়া এমনি আরো অনেকে ছোটোবেলায় মার কাছ থেকে যা পাওয়া দরকার ছিল তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই সমস্ত মায়েরা বামপন্থী আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন — যা সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের অনেকখানি গ্রহণীয় করে তুলেছিল।

বামপন্থী মহিলাদের জীবনযাপনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল অনেকেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন নিজেদের আন্দোলনের সাথীকে। তারফলে সাংসারিক জীবনে পরবর্তীকালে নিজেদের আদর্শকে চালিত রাখতে পেরেছিলেন মহিলারা। আর বিয়ের পর থেকেই পাশাপাশি থাকতেন অনেক পরিবার মিলে পার্টি কমিউনে। যেমন- মণিকুন্তলা সেন বিয়ে করেন জলিমোহন কলকে, কনক মুখার্জী জীবন সাথী করেন সরোজ মুখার্জীকে, অপর্ণা পালচৌধুরী সুরথ পালচৌধুরীকে, পঙ্কজ আচার্য - শ্রমিক নেতা গোপাল আচার্যকে, গীতা রায়চৌধুরী-বিশ্বনাথ মুখার্জীকে, বেলা চ্যাটার্জী- সোমনাথ লাহিড়ীকে, শান্তি রায় - গণনাট্য আন্দোলনের নেতা সুধী প্রধানকে, জুঁইফুল বসু - কমিউনিস্ট নেতা সুধীন (খোকা) রায়কে, নিবেদিতা নাগ, নেপাল নাগকে, নিরুপমা গুপ্ত - নিরঞ্জন গুপ্তকে, (ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক), হাসিনা বেগম শ্রমিক নেতা আব্দুল মোমিনকে, রানী রায়-বঙ্গেশ্বর রায়কে, শেফালী চৌধুরী-বিনয় চৌধুরীকে, রাবেয়া - শাহেদুল্লাহ সাহেবকে, রীণা সেনগুপ্ত-কল্পতরু সেনগুপ্তকে, কণা পাল-জলধর পালকে, রাজশাহীর ইলা মিত্র-রমেন মিত্রকে, পূর্ব-পাকিস্তানের রেখা চৌধুরী - অরুণ চৌধুরীকে, রাণু চট্টোপাধ্যায়-অজিত চট্টোপাধ্যায়কে, সন্ধ্যা চ্যাটার্জী-কমল চ্যাটার্জীকে, লতিকা সেন-ডাঃ রণেন সেনকে, ভক্তি ঘোষ-উদয়ভানু ঘোষকে, বিমলা মাজী - অনন্ত মাজীকে এবং অনুরূপভাবে এই দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় আরো অনেকের মধ্যে।

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার পর অর্থনৈতিক দিক থেকেও মহিলাদের মধ্যে একটা মিল

লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ জীবনের সূচনাতে আর্থিক স্বচ্ছলতায় বড় হন। আবার কেউ কেউ দারিদ্রতার মধ্য থেকেই বড় হয়ে ওঠেন। কিন্তু রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার পর প্রত্যেকেই আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়েই নিজ নিজ আদর্শকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেন। যেমন মণিকুন্তলা সেনের বাবা একটি জমিদারী এস্টেটের কমন ম্যানেজার ছিলেন। অপর্ণা পালচৌধুরীর বাবা গিরিশচন্দ্র ধর P.W.D-র অ্যাকাউনটেন্ট ছিলেন। রেণু চক্রবর্তী, গীতা মুখার্জী, কনক মুখার্জী, অপর্ণা পালচৌধুরী, নিবেদিতা নাগ, শিবরানী মুখার্জী-এঁরা সকলেই স্বচ্ছল পরিবার থেকে এসেছিলেন। অপরদিকে বেশিরভাগ বামপন্থী মহিলাদের পারিবারিক অবস্থা ছিল অস্বচ্ছল।

আবার পারিবারিক স্বচ্ছলতা থাকলেও কমিউনিজম সম্পর্কে পরিবারের ঘোর আপত্তির জন্য মহিলা কর্মীরা কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন বলেও তথ্য থেকে জানা যায়, যা তাঁদের জীবনে সংগ্রামকে আরোও বাড়িয়ে দিয়েছিল। যেমন— বেলা চ্যাটার্জী, কনক দাশগুপ্ত, পঙ্কজ লাহিড়ী, শচী লাহিড়ী, মুক্তি ঘোষ, বাণী দাশগুপ্ত প্রমুখ।

মণিকুন্তলা সেন তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন—"... এদের অনেককেই রাজনীতি এবং বিশেষ করে কমিউনিজম সম্পর্কে পরিবারের ঘোর আপত্তির জন্য বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল এবং বহু কষ্ট স্বীকার করে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়েছিল। কী কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এরা যে সেরা কমিউনিস্ট কর্মী হতে পেরেছিল সেসব কাহিনী সত্যিই বিস্ময়কর। পার্টি এত মেয়ের খরচ দিতে সমর্থ হয় নি। তাই এই মেয়েরা টিউশনি ও ছোটোখাটো কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত।"[৬৭]

বামপন্থী নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আর একটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যে সমস্ত নারীরা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের অনেকের এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে মায়েদের বা অভিভাবিকাদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। যেমন মণিকুন্তলা সেন যখন তাঁর মাকে কমিউনিজমের বই পড়ে শোনান তখন তাঁর মা বলেন —"বই এর মধ্যে ভগবান না মানার কথা তো নেই। জীবেই তো ভগবান, জীব সেবাই তো ধর্ম। এই যদি রাজনীতি হয় তো আমার কোনও আপত্তি নেই। তুমি একাজ করলে তোমার নিজেরও উন্নতি হবে, আমারও আনন্দ হবে।"[৬৮]

শান্তিসুধার সঙ্গী হিসাবে যখন মণিকুন্তলা সেনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে তখন পাড়ার মহিলারা ও আত্মীয়রা সমালোচনা করলেও তাঁর মা তাঁর পাশে থেকেছেন। শুধু তাই নয়, কিছু করার জন্য মন যখন উতলা তখন তাঁর মা তাঁকে কলকাতায় বোর্ডিং এ পাঠিয়ে দেন এম.এ.

পড়ার পাশাপাশি মানুষের কাজ করার জন্য।

নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী অপর্ণা পাল চৌধুরীর কাছে মা-ই ছিলেন তাঁর প্রেরণার উৎস। তাঁর বাবা মেয়েদের পড়াশোনা করা, বেড়াতে যাওয়া পছন্দ করতেন না। কিন্তু তাঁর মা ইন্দুবালা ধর তাঁকে সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন। পড়াশোনা করার পাশাপাশি জনগণের জন্য কিছু করার।[৬৯]

ঢাকা জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা নিবেদিতা নাগের বাবা যখন 'on Religion' বইটি দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন তখন তাঁর মেজ কাকীমা (লীলাদেবী) পাশে দাঁড়ান। তাঁর আশ্বাস না পেলে প্রথমে ছাত্র ফেডারেশন ও পরে সমিতির কাজ করা নিবেদিতা নাগের সম্ভব হত না।

মেদিনীপুর জেলার কৃষক নেত্রী বিমলা মাজী বাল বিধবা হওয়ায় সামাজিক দিক থেকে নানা বাধা ছিল। কিন্তু পারিবারিক দিক থেকে মা তাঁকে কোন কষ্ট দেননি। উপরন্তু মণিকুন্তলা সেনের অনুপ্রেরণায় রাজনীতিতে যোগ দিলে মা তাঁকে সমস্তরকম সহযোগিতা করেন।[৭০]

বামপন্থী নারী আন্দোলনে সম্প্রদায়গত অংশগ্রহণঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় গড়ে ওঠা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ছিল দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর মহিলাদের একটি যৌথ রাজনৈতিক মঞ্চ। এই মঞ্চে যেমন প্রদেশ ও বিভিন্ন জেলার অনেক কংগ্রেস নেত্রী সমবেত হয়েছিলেন তেমনই মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার কোন কোন মহিলাও এতে যুক্ত হন। কংগ্রেস মহিলা সংঘ, মুসলিম উইমেন্স সেলফ্ ডিফেন্স লীগ, খ্রীষ্টান মহিলা সংগঠন (Y.W.C.A)প্রভৃতি বিভিন্ন দলমত ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মহিলারা একসঙ্গে দেশরক্ষা ও আত্মরক্ষার কাজে জোটবদ্ধ হন। তবে সমস্ত দল ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মহিলারা ঐক্যবদ্ধ হলেও ধীরে ধীরে দেখা যায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি মূলত চালিত হতে থাকে বামপন্থী মহিলাদের দ্বারা এবং এই বামপন্থী মহিলাদের মধ্যে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। মুসলিম মহিলাদের অংশগ্রহণ সব জেলায় সক্রিয় ছিল না এবং যে সমস্ত জেলায় মুসলিম মহিলারা অংশগ্রহণ করেন সেখানে তাদের অংশগ্রহণ ছিল খুব সামান্য। সম্ভবতঃ সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতা এর জন্য দায়ী ছিল।

প্রথম প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠনের পূর্বে ১২টি জেলার সম্মেলন হয় ও জেলা কমিটি গঠিত হয়। এই জেলাগুলির সম্পাদিকারা ছিলেন— কলকাতার অনিলা দেবী;

হুগলীর প্রতিভা গাঙ্গুলী; বর্ধমানের বিভা দত্ত (কোনার); যশোহর ঃ চারুশীলা রায়; খুলনা ঃ ভানু দেবী; বরিশাল ঃ বীণা সেন; ফরিদপুর ঃ উমা ঘোষ; ঢাকা ঃ নিবেদিতা নাগ; ময়মনসিংহের জ্যোৎস্না নিয়োগী; চট্টগ্রাম ঃ আরতি দাস; নোয়াখালিঃ জ্যোতি চক্রবর্তী; কুমিল্লাঃ বীণা ব্যানার্জী। এই জেলাগুলির সম্পাদিকাদের মধ্যে কেউই মুসলিম মহিলা ছিলেন না।[৭১]

১২টি জেলা ছাড়া যে সব জেলায় তখনো সম্মেলন হয়নি সেইসব জেলাগুলিতে সংগঠন তৈরি করার জন্য যে সমস্ত সংগঠকরা কাজ করতে থাকেন তাঁরা হলেনঃ ২৪ পরগণাঃ নিবেদিতা নাগ ও প্রতিভা গাঙ্গুলি, হাওড়াঃ প্রীতি লাহিড়ী; পাবনাঃ মায়া সান্যাল; রাজশাহীঃ অনুপমা বাগচী; রংপুরঃ রেবা রায়; দিনাজপুর ঃ আশা চক্রবর্তী; জলপাইগুড়িঃ গায়ত্রী রায়; বগুড়া ঃ রেণু গাঙ্গুলী; মেদিনীপুর ঃ অনুপমা পট্টনায়ক; বীরভূমঃ সত্যবালা চ্যাটার্জী; বাঁকুড়াঃ ভক্তি সিংহ; নদীয়াঃ মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়; মুর্শিদাবাদঃ আরতি রায় প্রমুখ। পরবর্তীকালে দু-একটি জেলা বাদ দিয়ে বাকী জেলাগুলির সংগঠকরাই হন জেলা সম্পাদিকা। এই সংগঠিকাদের মধ্যেও মুসলিম মহিলা নেতৃত্ব দেখা যায় নি।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির পক্ষ থেকে সারা প্রদেশে নারী আন্দোলনকে সংগঠিতভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রথমে পাঁচজন মহিলা সদস্যকে নিয়ে প্রাদেশিক মহিলা ফ্রাকশান ও পরে প্রাদেশিক স্পেশাল সেল গঠন করা হয়। এই পাঁচজন হলেন মণিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী, কমলা মুখার্জী, যুঁইফুল রায় ও কনক মুখার্জী। কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক সেলেও কোন মুসলিম রমনী ছিলেন না। প্রাদেশিক স্পেশাল সেল গঠন করার পর অনুরূপভাবে জেলায় জেলায় স্পেশাল সেল গঠন করা হতে থাকে। জানা যায় এইসময় অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির প্রাদেশিক মহিলা ফ্রন্টের নামে একটি মাসিক সংবাদ বুলেটিন ছাপা হতে থাকে। এই বুলেটিনের দ্বিতীয় সংখ্যায় ১৯৪৩সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, ছয়মাসের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মহিলা সদস্যা ছিলেন ১৫১জন।[৭২] এই ১৫১জনের মধ্যে কয়েকজন মাত্র ছিলেন মুসলিম মহিলা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কলকাতা ও ২৪পরগণা জেলায় ছিলেন নাজিমুন্নেসা আহমদ(মান্নী), দুখমন বিবি, গুলবাহার বিবি, বর্ধমানে ছিলেন রাবিয়া বেগম, মাকসুদা বেগম, সামসুন নাহার, বীরভূমে ছিলেন হাসেনা খাতুন, ঢাকা জেলায় ছিলেন নাদেরা বেগম প্রমুখ। তথ্য থেকে জানা যায় বীরভূম জেলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠনের সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের কয়েকজন ছাত্রী ও মহিলা এইসময়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সংগঠনে অংশ নেন। অর্থাৎ দেখা

যায় যে, কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা সদস্যাদের মধ্যে অল্প পরিমানেই মুসলিম মহিলা সদস্যা ছিলেন।

চল্লিশের দশকে এবং তার কিছু পরে যে সমস্ত মহিলা কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হন তাঁদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল। অনিলা দেবী-১৯৪৩, অপর্ণা পাল চৌধুরী-১৯৪২, অমিয়া দত্ত-১৯৪৩, অলকা চট্টোপাধ্যায় - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, আরতি ঘোষ - ১৯৪৬, আশালতা চক্রবর্তী - ১৯০৮, ইন্দুসুধা ঘোষ, ইরা শর্মা, ইলা মিত্র - ১৯৪৩, কনক মুখোপাধ্যায়-১৯৩৮, কণ্ঠমণি বর্মণ, কমলা মুখোপাধ্যায় - ১৯৩৮, কল্যাণী মিশ্র, গীতা মুখার্জী - ১৯০২, গীতা সরকার, চামেলী বসু, চারুবালা গাঙ্গুলী-১৯৪৭, চারুবালা হাজরা, চারুবালা ঘোষ, জয়মণি বর্মণ, জ্যোতি চক্রবর্তী - ১৯৪১, নলিনীবালা মিত্র - ৪০এর দশক, নিরুপমা গুপ্ত - ১৯৪২, পঙ্কজ আচার্য - ১৯৪৪, প্রতিভা গঙ্গোপাধ্যায়-১৯৪০, প্রভা চ্যাটার্জী -১৯৪৮, বিভা কোঙার-১৯৪৩, ভক্তি ঘোষ - ১৯৪০, ভানু দেবী - ১৯৩৮, মণিকুন্তলা সেন - ১৯৩৭, মায়া চক্রবর্তী-১৯৪৩, যুঁইফুল রায় - ১৯৩৮-৩৯, রানি দাশগুপ্ত, রানি মুখার্জী, রাবিয়া বেগম, রেণু চক্রবর্তী-১৯৩৮, রেণুকা রায় - ১৯৪৪, রেবা রায়চৌধুরী-১৯৪৩, লতিকা সেন -১৯৩৬, লিলি বকসি-১৯৪৬, শান্তি প্রধান, সরমা সিং, সাধনা ঘোষ - ১৯৫৮, সাধনা পাত্র-১৯৪৮, সীতা মুখোপাধ্যায় -১৯৪৬ , সুপ্রিয়া আচার্য-১৯৬৪, সুশীলা মিত্র-১৯৪৬, সুহাসিনী গঙ্গোপাধ্যায় - ১৯৩৯, স্নেহলতা সিংহ, সরোজিনী দেবী, সত্যবালা দেবী-চল্লিশের দশক, মাধুরী দাশগুপ্ত, জ্যোতি দেবী, রাণু চট্টোপাধ্যায়- ১৯৪৬, ঊষশী বসু প্রমুখ। এই তালিকাতেও একমাত্র মুসলিম সদস্যা হিসাবে বাবিয়া বেগমকে দেখা যায়।

তবে মুসলিম মহিলা নেত্রী কম থাকলেও বামপন্থী মহিলারা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়ের যে চেষ্টা করেন তা মণিকুন্তলা সেন তাঁর আত্মজীবনী 'সেদিনের কথা'-তে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন— "...সমিতি গড়ে উঠেছে কৃষক, মধ্যবিত্ত, হিন্দু আর মুসলমান মেয়েদের নিয়ে। স্বভাবতই মুসলিম মেয়েরা সংখ্যায় কম। কিন্তু কর্মীদের সব সময়ের লক্ষ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য গড়ে তোলা।"[৭৩]

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় ব্রিটিশ আমল থেকেই বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে তারতম্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল বামপন্থী নারী আন্দোলনেও তার কিছুটা প্রভাব পড়েছিল। তবে সমস্ত সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ব্যতীত কোন আন্দোলনই যে বলিষ্ঠ চরিত্র লাভ করতে পারে না তা বামপন্থী নেতৃত্বরা উপলব্ধি করেন। তাই, বামপন্থী মহিলারা তাঁদের নানা কর্মসূচীতে মুসলিম রমণীদের নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টা করেছিলেন আলোচ্য সময়কালে যা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে পূর্বেই উল্লেখ

করা হয়েছে। কাজেই বলা যায় বামপন্থী মহিলাদের পরিচালিত আন্দোলনে নেতৃত্ব হিসাবে মুসলিম মহিলাদের সংখ্যা অল্প থাকলেও তাঁদের কর্মসূচীতে সকল সম্প্রদায়কে একত্রীভূত করার চেষ্টা চলেছিল- যা বামপন্থী আন্দোলনের একটি ইতিবাচক দিক।

বিভিন্ন শ্রেণীর মহিলাদের বামপন্থী নারী আন্দোলনে অংশগ্রহণ:

ভারতের প্রবাহিত সমাজে উচ্চবর্ণের প্রাধান্য প্রায় সর্বত্র লক্ষ্যনীয়। বামপন্থী মহিলাদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সারা প্রদেশের নারী আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) প্রাদেশিক কমিটির পক্ষ থেকে যে ৫জন মহিলাকে নিয়ে প্রাদেশিক স্পেশ্যাল সেল গঠন করা হয় তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ছিলেন উচ্চবর্ণের। সেন, মুখার্জি, চক্রবর্তী, রায় প্রভৃতি বর্ণের মহিলারা নেতৃত্ব দেন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় জেলাগুলিতেও তার প্রতিফলন ঘটে।

তবে বামপন্থী মহিলা নেতৃত্বদের উদ্দেশ্য যেহেতু ছিল কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মহিলাদের বেশি বেশি করে সংগঠনে নিয়ে আসা তাই দেখা যায় ধীরে ধীরে এই আন্দোলনে বিভিন্ন বর্ণ থেকে মহিলাদের অংশগ্রহণ ঘটতে থাকে। বামপন্থী মহিলারা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করেন। এ ব্যাপারে তাঁদের পরিশ্রম ও উদ্যোগ যেমন প্রশংসনীয় তেমনই পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মহিলাদের নেত্রীতে প্রতিষ্ঠিত করাও উল্লেখের দাবি রাখে। মণিকুন্তলা সেন তাঁর 'সেদিনের কথা' তে লেখেন। "...আমাদের কাজ বস্তির অল্পরুজির সংসারের কল্যাণেই প্রধানত নিয়োজিত হত। যিনি এই কাজে আমাদের প্রথম পথ দেখান তিনি হলেন তৎকালীন পার্টি নেতা পি সি যোশী। নারীর বিশেষ অধিকারের জন্য আন্দোলনে আমাদের চেষ্টা করতে হবে সমাজের একেবারে উপরতলা বাদ দিয়ে মোটামুটি অন্যসব শ্রেণির মেয়েদের ঐক্যবদ্ধ করতে।"[৭৪] এই শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে বামপন্থী মহিলা নেত্রীরা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গিয়ে সেখানকার নিরক্ষর, বাল্যবিধবাদের সামনের সারিতে নিয়ে এসে নেত্রীত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় মেদিনীপুর জেলার ময়না থানার অন্তর্গত চাপবসান গ্রামের বিমলা মণ্ডল ছিলেন তেরো বছরের বাল বিধবা। আবার শ্রেণীগত দিক থেকে তিনি ছিলেন নিম্নবর্ণীয়। তাঁকে সমস্ত সামাজিক বাধা অতিক্রম করে মেদিনীপুর জেলার কৃষক নেত্রীতে উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করেছিলেন বামপন্থী মহিলা নেত্রীরা। অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পাবনার মায়া ভট্টাচার্য্যর ক্ষেত্রেও। এই বাল্য বিধবা ব্রাহ্মণ মহিলা বাড়ির ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও

বামপন্থী মহিলাদের অনুপ্রেরণায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। আবার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা নির্মলা সান্যালের রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে স্বামী পরিত্যক্তা শচী দেবী মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে এসেছিলেন।[৭৫]

আবার দেখা যায় এই সমস্ত বাল্যবিধবাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বরা বিশেষ ভূমিকা নেন। কমিউনিস্ট নেতা অনন্ত মাজী, বিমলা মাজীর সাথে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছিলেন। একইভাবে মায়া ভট্টাচার্য মায়া মৈত্র হয়ে আত্মরক্ষা সমিতির কর্মী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

মেদিনীপুর জেলার মহিলা নেত্রী সাধনা পাত্র ছিলেন নিরক্ষর। বামপন্থী মহিলা নেত্রী মণিকুন্তলা সেন, গীতা মুখার্জীর চেষ্টায় গ্রামে স্কুল বসানো হয়। সেখানেই মহিলাদের লেখাপড়া শেখানো হয়। পরে তিনি হয়ে ওঠেন বামপন্থী মহিলা আন্দোলনের নেত্রী। ধীরে ধীরে বামপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উচ্চশ্রেণী সহ বিভিন্ন শ্রেণী থেকে মহিলাদের আসা শুরু হয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে। যেমন- অনুপমা বাগচী, অনুপমা পট্টনায়ক, ভক্তি সিংহ, বিভা দাস, অঞ্জলি দাস, কমলা দাস, কিরণবালা দাস, জ্যোৎস্না নিয়োগী, তুলসী বক্সী, ঊষা দত্ত, কল্পনা দত্ত, সুষমা দত্ত, মৃণালিনী তলাপাত্র, অমিয়া সাঁতরা, নন্দরানী ডল, আশা সামন্ত, মুক্তা কুমার, মুক্তি ঘোষ, দক্ষবালা দাসী, শচী বিশ্বাস, বিভা কোঙার, গীতা মল্লিক, কমলা মাইতি, মনোরমা পাকড়াশী, শিপ্রা সাহা, মহারানী সাঁতরা, শান্তি প্রধান, ব্রজকিশোরী কুণ্ডু, ছায়া বেরা প্রমুখ আরো অনেকে। এইসমস্ত নেত্রীদের পদবী থেকেই বোঝা যায় এরা তথাকথিত উচ্চশ্রেণী বলতে যা বোঝায় সকলে সেই শ্রেণীভুক্ত হয়তো ছিলেন না। অর্থাৎ বামপন্থী মহিলাদের আন্দোলনের যে মূল লক্ষ্য নিম্নবর্ণীয়দের সংগঠনে নিয়ে আসা সেই লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন শ্রেণীকেই সংগঠনের নিয়ে আসার চেষ্টা করেন।

কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বামপন্থী মহিলারা আদিবাসী ও উপজাতি শ্রেণীভুক্ত কৃষক পরিবারের রমণীদের একটি অংশকে তাঁদের আন্দোলনে সামিল করতে পেরেছিলেন। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে বা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দুটি পর্যায়েই উপজাতি রমণীদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। মূলত বাংলার উত্তরাঞ্চলের এবং ময়মনসিংহ বা উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর রমণীরা তেভাগা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। বিশেষ করে ময়মনসিংহ পার্বত্য এলাকার হাজং উপজাতিভুক্ত মহিলারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ময়মনসিংহের হাজং নেত্রী রাসমণি, জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগানের শ্রমিক বুধনী ওঁরাওনীর

আত্মত্যাগের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। তেভাগা আন্দোলনে কৃষকসভার নেতৃত্বে বামপন্থী মহিলারা উপজাতি রমণীদের অংশগ্রহণ শুধু নয় তাদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু দু'একটি ক্ষেত্র এছাড়া তেভাগা আন্দোলনের পরবর্তীকালে সংগঠিত আন্দোলনগুলিতে তেমনভাবে আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ উল্লেখ করার মত ছিল না। বাঁকুড়া জেলার মহিলা নেত্রী ভক্তি ঘোষের গ্রেপ্তারের পর পুলিশ রিপোর্টে লেখা হয় — "She hopes good realisation during Gajan festival and wants to organise two women squad for the purpose. She has heard that good realisation is being made infactories and that Santals are being well organised." [76]

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায় বাংলায় বামপন্থী নারী আন্দোলনের প্রথমপর্বে নেতৃত্বদানে উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু বামপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত এই সমস্ত নেত্রীরাই বিভিন্ন কৃষক, শ্রমিক, পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মহিলাদের সামনের সারিতে আনার চেষ্টা করেছিলেন। উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁরা ততটা সফলতা অর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু সংগঠনে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মহিলাদের সমবেত করার চেষ্টা করেছিলেন বামপন্থী মহিলারা। এক্ষেত্রে তাঁরা পুরোপুরি সফলতা অর্জন করতে না পারলেও তাঁদের ত্যাগ ও প্রচেষ্টা জনমানসে তাঁদের গ্রহণীয় করে তুলেছিল এবং এই প্রচেষ্টা বাংলার বামপন্থী আন্দোলনের পথকে বেশ কিছুটা শক্তিশালী করেছিল বলা যায়।

শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চায় বামপন্থী মহিলা:

বামপন্থী মহিলারা সাম্যবাদী আদর্শে আকৃষ্ট হওয়ার পেছনে যেমন কিছু নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল তেমনই নিজেরাও এই আদর্শকে ভালোভাবে জানার জন্য গভীরভাবে নানা বই অধ্যয়ন করতেন। মহিলাদের বিভিন্ন রচনা ও পুলিশ ফাইলের রিপোর্ট থেকে তা কিছুটা অনুধাবন করা যায়। ডি.আই.বি. ইন্সপেক্টরকে লেখা মণিকুন্তলা সেনের চিঠি থেকে এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। খড়্গপুর জেলে থাকার সময় তার কাছ থেকে কিছু পুস্তক পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। ১৫.৪.১৯৪৯ তারিখে মণিকুন্তলা সেন ডি.আই.বি. ইন্সপেক্টরকে লেখেন যে, খড়্গপুর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ তাঁর বাসা থেকে কিছু বই নিয়ে আসে। তিনি জানান এই বইগুলি একখানিও বেআইনী নয় এবং রাজবন্দীদের যে সমস্ত বই পড়বার অনুমতি দেওয়া হয় এগুলি তারই অন্তর্ভুক্ত। তিনি যে সমস্ত বই-এর তালিকা দেন সেই বইগুলি হল—

"১) Helps to the Study of Communist Manifesto

২) History of the Communist Party [CPSG(B)]

৩) Political affairs

৪) বাংলায় কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ

৫) ঘরে বাইরে

৬) মুক্ত চীনের কৃষক (নামটি আমি হয়তো ঠিক লিখতে পারলাম না)। একখানা ছোট পুস্তিকা।"[৭৭]

মণিকুন্তলা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন কিভাবে বই পড়ে কমিউনিজমের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। প্রমথ সেন নামে এক ছাত্র তাঁকে মার্কসীয় বই পড়তে দিতেন। তিনি মাঝে মাঝে গণবাদী এবং এই ধরণের নিষিদ্ধ পুস্তক পড়তেন। তিনি লিখেছেন— "হঠাৎ একখানা বই, এ.বি.সি. অফ কমিউনিজম, আমার হাতে এসে গেল। কে দিয়েছিল মনে নেই। বইখানা খুব গোপনে আমি একটু একটু করে পড়লাম। এর মধ্যে যেন আমার ধর্ম ও রাজনীতি দুই-ই খুঁজে পেলাম। বইখানা তিনতলার চিলেকোঠার ঘরে বসে পড়তাম। কয়েকটি ছাত্রী জুটে গেল। তাদেরও পড়াতাম। লুকিয়ে রাখতাম একটা সুপারি রাখা মণ্ড পিপের মধ্যে।"[৭৮] অর্থাৎ যে সমস্ত ছাত্রী কমিউনিজমে আকৃষ্ট হতেন তাঁরা নিজেরা এই আদর্শকে জানার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যদেরও উদ্বুদ্ধ করতেন।

১৯৪৩ সালে ঢাকা জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা নিবেদিতা নাগ অমূল্য চন্দ নামে একজন পার্টি সভ্যের কাছে সাম্যবাদ সম্বন্ধে পড়াশোনা করেন। শুধু নিবেদিতা নাগ নন, সুদেবী মুখার্জী, নিরুপমা ব্যানার্জী, অমিয়া দত্ত, হেলেনা বসু, নীলিমা বসু, ডলি বসু প্রমুখ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মীরা এই আদর্শ সম্বন্ধে জানতে শুরু করেন। সাম্যবাদী আদর্শকে জানার জন্য নিবেদিতা নাগ বিভিন্ন বই যে অধ্যয়ন করতেন তা তাঁর লেখা থেকে জানা যায়। তিনি লিখেছেন—"একদিন বাবা আমার টেবিলে 'On Religion' বইটা দেখে ফেলেন। আমার বাবা খুবই ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন। বইটির প্রথম পৃষ্ঠা অর্থাৎ খুলেই তিনি প্রথম লাইনে দেখলেন 'Religion is the Opium of the Masses'। ধর্ম মানুষের মধ্যে আফিমের মতো কাজ করে। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বাবা বইটা ছুঁড়ে ফেললেন।"[৭৯]

প্রথম পর্বের বামপন্থী মহিলা নেত্রী অপর্ণা পালচৌধুরী তাঁর আত্মজীবনী 'নারী আন্দোলনের স্মৃতিকথা' তে লেখেন আসামে থাকাকালীন কোন প্রগতিশীল নীতিগত পুস্তক পড়ার সুযোগ তিনি পান নি। কিন্তু শিলচরে এসে সেই সমস্ত বাধা কেটে যায়। প্রথমে ছাত্র আন্দোলনে এবং পরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার পর তিনি পার্টির বুলেটিন পড়তেন। তিনিও যে বিভিন্ন মার্কসবাদীগ্রন্থ

পড়াশোনা করতেন তা তাঁর লেখায় পরিস্ফুট হয়। তিনি লেখেন— "আমরা মার্কসবাদী গ্রন্থে পড়েছিলাম মেয়েদের বুর্জোয়া সমাজ পণ্যদ্রব্যের মতো ব্যবহার করে, এটা যে কত সত্য তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। মহিলাদের ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই, এ সত্য বোঝাবার জন্য বৈঠক সভা চললো। আমাদের এ.জি সভা পরিচালনা করতেন বর্তমান মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা অচিন্ত্য ভট্টাচার্য। কমিউনিস্ট পার্টি আমরা কেন করবো, কিভাবে করবো তিনি তা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতেন। সমাজতন্ত্রের আদর্শ, কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন ও কাজকর্ম সম্পর্কে সেদিন যে প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা করেছিলাম, আজও তা অম্লান আছে।"[৮০]

বাংলার নারী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন রেণু চক্রবর্তী। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন জন ষ্ট্র্যাটীর বক্তৃতা তিনি শুনতে যান। তাঁর বক্তৃতা থেকেই সোস্যালিজম কি চায়, তার অর্থ কি তা তিনি জানতে পারেন। এর আগে কনভ্যান্ট স্কুলে পড়ায় তিনি সোস্যালিজম্ সম্পর্কে উল্টো কথাই শিখেছিলেন। তাতে বলা হত 'গরীবরা সর্বদাই আমাদের সঙ্গে থাকবে', অর্থাৎ গরীবের গরীবী আর মোচন করা যাবে না। গরীবদের জন্য কেবলমাত্র সদয় ব্যবহারই করা যায়।[৮১] কিন্তু জন ষ্ট্র্যাটীর কাছে শেখেন জাগ্রত জনসাধারণ এর পরিবর্তন ঘটাতে পারে। পাশাপাশি অধ্যয়নের মধ্য দিয়েও সাম্যবাদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। নারীর সত্যকারের মুক্তি সম্ভব হতে পারে অর্থনৈতিক শোষণমুক্ত সমাজে-একথা তিনি উপলব্ধি করেন লেনিনের একটি বক্তৃতা পড়ে। আন্তর্জাতিক নারীদিবস উপলক্ষে দেওয়া লেনিনের বক্তৃতা পড়েই তিনি নারীদের পক্ষে নতুন এক মতবাদের কথা প্রথম জানতে পারেন। এই বক্তৃতাতে লেনিন উল্লেখ করেন রাজনৈতিক জীবনে জনগণকে পুরোপুরি নিয়ে আসা যাবে না যতক্ষণ না নারীসমাজ এতে অংশগ্রহণ করে। এইভাবে রেণু চক্রবর্তী সাম্যবাদী দর্শনে আকৃষ্ট হন।

বামপন্থী মহিলা নেত্রী ছিলেন শেফালী রায়। ২.৩.১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয় তারমধ্যে অন্যতম ছিল—"Arrested on 2.3.49 in connection with Dum Dum Raid case, subsequently, Committed to Presidency Jail V/S 30(11) of W.B.S.A. on 12.3.49".[৮২] কলকাতা পুলিশের Confidential Diary থেকে জানা যায় শেফালী রায়কে গ্রেপ্তারের সময় তাঁর কাছ থেকে বেশকিছু বই বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্ত বইগুলি হল —

১) তেভাগা মধ্যবিত্ত

২) বিশ্বনারী সঙঘ

৩) ভগৎ সিং ও তার সহকর্মীরা

৪) Trade Union Records

৫) ঘরে বাইরে

মেদিনীপুর জেলার নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ছিলেন বিমলা মাজী। পুলিশের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, তাঁকে গ্রেপ্তারের সময় যে বাড়িতে তিনি থাকতেন সেখান থেকে বেশকিছু বই বাজেয়াপ্ত করা হয়। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় — "Source No. 2 - 24.3.49 : Bimala Majee who is probably now concealing in the house of Patil Mal of Nilkantha is organising the women of Tamluk, Panskura and Nandigram areas. Note Acting on this secret information, the Local Police raided the house of Patit Mal of Nilkanthya, P.S. Tamluk on the night of 24.3.49 and arrested Bimala Majee, an active and important organizer of the Mahila Atma Rakshya Samiti Bimala Majee is wanted in the Katagachhia Police firing case no 4 dated 10.3.49 U/S 148/353/307 I.P.C. A book entitled "Communist O Congress" and a leaflet entitled "Hatya-kanda O Doman Nitir Biruddhey Rukhe Darao" were recovered and seized from the house of Patil Mal)."[৮৩]

বাঁকুড়া জেলার নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ছিলেন ভক্তি ঘোষ। ১৬.৫.১৯৪৯ তারিখে তাঁর সম্পর্কে একটি রিপোর্ট লেখেন Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, C.I.D. West Bengal. সেই রিপোর্টে তিনি লেখেন — "Her (Bhakti Ghosh) place was searched on 29.4.49 early morning and a large number of communist literature was seized from the roof occupied by her. She was arrested on 29.4.49 at Bankura U/S 30(1) of the West Bengal Security Act and despatched to Midnapore Central Jail where from she has been comunicated to the Presidency Jail, Calcutta".[৮৪] রিপোর্টটি থেকেই বোঝা যায় যে, কমিউনিস্ট পার্টির নানা পত্রপত্রিকা তিনি অধ্যয়ন করতেন।

কনক মুখার্জী তাঁর আত্মজীবনী 'মনে মনে'- তে লিখেছেন—"মার্কসবাদের কি যেন একটা ইংরাজী চটি বই বাচ্চুদা দিলেন, চেষ্টা করে করে পড়তে বললেন। বইখানা জামার মধ্যে

করে লুকিয়ে এনে আমার স্কুলের বইপত্রের মধ্যে মিশিয়ে রাখলাম। রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে যখন আমি হ্যারিকেনের আলোয় পড়তাম, তখন অনেক চেষ্টা করে ডিকশনারি দেখে দেখে বইটার পাঠোদ্ধার করতে চেষ্টা করতাম। যতদূর মনে হয় বইখানি ছিল লেনিনের 'On Religion' কারণ তার মধ্যে ধর্মসম্পর্কীয় আলোচনা ছিল তা মনে আছে।....

স্কুলের পড়ার থেকে রাজনীতির বই পড়ার দিকেই আমার আগ্রহ বেশি হলো।”[৮৫]

বামপন্থী মহিলারা নিজেদের উন্নত করার লক্ষ্যে সদাব্যস্ততার মাঝেও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত লেখালেখির অভ্যাস বজায় রেখেছিলেন। তাঁদের এই লেখনী তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জানতে বিশেষ সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ মণিকুন্তলা সেনের উল্লেখ করা যায়। ‘ঘরে বাইরে’- তে তিনি নিয়মিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখতেন। এই ধারা বজায় থাকার জন্য পরবর্তীকালে নিজের আত্মজীবনী ‘সেদিনের কথা’ তে তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন।

সমসাময়িক কালেরই অন্যতম নেত্রী কনক মুখার্জী। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি অহরহ লেখার সংবাদ পাওয়া যায়। কারাভ্যন্তরে গিয়েও তাঁর লেখা থেমে থাকে নি। ‘ঘরে বাইরে’ ও ‘একসাথে’ পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘদিন। তাঁর রচিত গ্রন্থ :

কবিতা- দেশরক্ষার ডাক (১৯৪৩), রৌদ্রধারা (১৯৬০), কারাগার (১৯৬৯), শপথ নিলাম (১৯৭৪), সূর্য উঠবে বলে (১৯৭৭), নির্বাচিত কবিতা (১৯৮২), রক্ত গোলাপের কাঁটা (১৯৮৭), ঘুমায়োনা পারাবত (১৯৯৫)

গল্প- ফিরে পাওয়া (১৯৬২), নির্বাচিত গ্রন্থ (১৯৮৫), চাচী মা (১৯৯৭)

উপন্যাস- বৃন্তহীন (১৯৫৮), উজান (১৯৫৯), বন্দী ফাল্গুন (১৯৭০)

ভ্রমণ কাহিনী- চীন ভ্রমণের ডায়েরী থেকে (১৯৮০), একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে কয়েকদিন (১৯৮৪), চীন থেকে ফিরে (১৯৮৪)।

স্মৃতিকথা ও ইতিহাস- স্মৃতির মণিকোঠায় (সরোজ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ; ১৯৮৭), Women's Emancipation Movement in India (A Marxist View) (1989), নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা (১৯৯৩)।

অনুবাদ- নারী ও সমাজ (১৯৪৮), নারী: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত (১৯৮৩), নারীমুক্তি প্রশ্নে (মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন,স্টালিন) (১৯৮৪)।

১৯৯৮ সালে বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ‘ভুবন মোহিনী

পদক'-এ সম্মানিত করে।[৮৭]

বামপন্থী নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী রেণু চক্রবর্তী। ১৯৫২-১৯৬২ খ্রি. পর্যন্ত লোকসভার সাংসদ থাকাকালীন 'ঘরে বাইরে' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় লোকসভায় উত্থাপিত বিল ও বিভিন্ন সংবাদ তিনি পরিবেশন করতেন। ভারতের জাতীয় মহিলা ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিকা হিসাবে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে নারী আন্দোলনের কথা তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত করেন। পরবর্তীকালে আন্দোলনের কথা বিধৃত করেন তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'Communists in Indian Women's Movement.' এ।

অপর্ণা পালচৌধুরী 'একসাথে' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে তার রাজনৈতিক জীবনের কাহিনী প্রকাশ করেন। ধারাবাহিকভাবে তাঁর স্মৃতিকথা প্রকাশিত হতে থাকে। পরে সেটি 'নারী আন্দোলনের স্মৃতিকথা' নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়।

চল্লিশের দশকে বামপন্থী আন্দোলনে যোগ দেন পঙ্কজ আচার্য। ১৯৭৭ খ্রি. পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলে তিনি রাজ্য সমাজকল্যাণ পর্ষদের সভানেত্রী হন। সমস্ত সময়কাল জুড়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর ১৯টি নির্বাচিত প্রবন্ধকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি 'পঙ্কজ আচার্য নির্বাচিত রচনা' প্রকাশ করে। এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে 'একসাথে' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

অনুরূপভাবে বলা যায় নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী জ্যোতি চক্রবর্তী 'একসাথে' পত্রিকায় অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধগুলি একত্রিত করে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি 'জ্যোতি চক্রবর্তী রচনা সংগ্রহ' প্রকাশ করে। ১৩টি প্রবন্ধকে একত্রিত করে এটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলির প্রাঞ্জল ভাষা থেকেই বোঝা যায় তিনি শুধু একজন রাজনৈতিক সংগঠক ছিলেন না, একজন লেখিকাও ছিলেন।

বামপন্থী নারী আন্দোলনের অগ্রণী নেত্রী সাংসদ, অসাধারণ বাগ্মী গীতা মুখার্জী রাজনীতি নিয়ে আকণ্ঠ ডুবে থাকলেও সাহিত্য সংস্কৃতির জগতের সঙ্গেও বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। কনক মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন— "গীতা ছিল একেবারে কাজ পাগল। সবসময়ই কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে ভালবাসতো। ট্রেনের মধ্যে, প্লেনের মধ্যে বসেও যতটুকু পারে পড়াশোনা করে নিত। অসুখ বিসুখ তাকে দমাতে পারেনি। গীতা মুখার্জী ছিলেন সুলেখিকা ও সুবক্তা। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে 'ভারত উপকথা', 'ছোটদের রবীন্দ্রনাথ', ও অনুবাদ গ্রন্থ 'হে অতীত কথা কও' — এর মতো কয়েকটি বই উল্লেখযোগ্য।"[৮৭]

খুলনা জেলার নারী আন্দোলনের অগ্রণী নেত্রী ভানু দেবী (চট্টোপাধ্যায়)। জানা যায়, উচ্চশিক্ষার তাঁর সুযোগ ঘটে নি। স্কুলে মাত্র কয়েক ক্লাস পড়েছিলেন। কনক মুখোপাধ্যায় স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন— "... বাংলা সাহিত্য, রাজনীতির বিষয়ে তাঁর গভীর অধ্যয়ন ও দখল দেখে অবাক হয়েছি। খাতা ভর্তি তাঁর কবিতা লেখা ছিল। কিন্তু সেগুলি তো কোথাও ছাপা হয়নি বা কবি হিসাবে ভানুদির কোনো প্রচার হয়নি। বাংলার ঘরে ঘরে ভানুদির মতো কত যে স্বভাব কবি আপনি ফুটে ফুটে আপনি ঝরে গেছে সেখবর কয়জন জানে।"[৮৮]

অনুরূপভাবে, মেদিনীপুর জেলার মহিলা আন্দোলনের নেত্রী সাধনা পাত্র উচচশিক্ষা লাভের কোন সুযোগ পাননি। কিন্তু বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার পর তিনি যে সমস্ত বাংলা রাজনৈতিক পুস্তক-পুস্তিকা, গণশক্তি, একসাথে পড়তেন তা তথ্য থেকে জানা যায়। ১৯৯৪ সালে 'একসাথে' পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় সাধনা পাত্র 'কিছু কথা মনে পড়ে' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। রচনাটির মধ্য দিয়ে তাঁর সংগ্রামী জীবনের কথা সহজ ভাষায় বর্ণনা করেন।

ইলা মিত্র দীর্ঘ সাত বছর কারাবাস করার পর যখন সাংসারিক জীবন শুরু করেন তখন তাঁর ও তাঁর স্বামী রমেন মিত্রের কোন উপার্জন ছিল না। পার্টির সাহায্যেই সংসার চলত। এই আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি লাভের জন্য ইলা মিত্র অনুবাদের কাজ শুরু করেন। এর থেকে তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বেশ কয়েকখানি বই অনুবাদ করেন বলে জানা যায়। 'হিরোশিমার মেয়ে' অনুবাদ করে তিনি সোভিয়েত ল্যাণ্ড পত্রিকা থেকে নেহেরু পুরস্কার লাভ করেন।[৮৯]

দিনাজপুর জেলার মহিলা নেত্রী রানি দাশগুপ্ত বহু গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন। রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে তাঁর বিদেশী গল্পের অনুবাদ ছাপা হত। কালান্তর পত্রিকায় 'মেয়েদের দুনিয়া' কলমের প্রবর্তন করেন ও বহুদিন তার পরিচালনা করেন।

'বাংলাদেশের স্মৃতিকথা' — নামক আত্মজীবনী লেখেন রাণু চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪৬ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। তিন বছর জেলে থাকার যে অভিজ্ঞতা তাঁর হয় সেই স্মৃতি লিপিবদ্ধ করেন তাঁর স্মৃতিকথাতে।

মাধুরী দাশগুপ্ত 'একসাথে' পত্রিকাতে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। এই পত্রিকার প্রকাশনার প্রথম থেকেই তিনি জড়িত ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি 'একসাথে' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা ছিলেন।

এইভাবে দেখা যায় শিক্ষার পাশাপাশি বামপন্থী মহিলারা নিজেদের সংগ্রাম আন্দোলনের

কথা লিখে পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন। এই লেখাগুলি থেকে একদিকে যেমন তাঁদের মানসিকতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনই বিভিন্ন সময়ে তাঁরা কি কি কাজে যুক্ত থেকেছেন তারও পরিচয় পাওয়া যায়।

মন্তব্য:

উপরের আলোচনা থেকে বামপন্থী মহিলাদের একটি সার্বিক পরিচয় পাওয়া যায়। সংগঠনে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের আগমন ঘটেছিল বিভিন্ন স্তর থেকে। কেউ ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, কেউ বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, স্বদেশী আন্দোলন থেকে অনেকে, কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কেউ কেউ বামপন্থায় আকৃষ্ট হন। সংগঠনে যুক্ত হওয়ার পর তাঁদের জীবনযাপন পদ্ধতিতেও একটি অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কমিউনে বসবাস করে আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়েও নিজেদের আদর্শের প্রতি অবিচল থেকেছেন মহিলারা। প্রায় প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছেন প্রান্তিক মহিলাদের সংগঠনে যুক্ত করার। তাই, তাঁদের কাজের ক্ষেত্র ছিল মূলত কৃষক, শ্রমজীবী মহিলা ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মহিলাদের মধ্যে। সম্প্রদায়গত দিক থেকে মুসলিম মহিলাদের অংশগ্রহণ কম থাকলেও মহিলা নেত্রীদের লক্ষ্য ছিল সংগঠনে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখবে। প্রাথমিক পর্যায়ে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং পূর্ববঙ্গে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেশী থাকলেও ধীরে ধীরে সারা রাজ্য জুড়েই সংগঠনের ব্যাপ্তি ঘটতে থাকে। আর সংগঠনের এই বিস্তার ঘটানোর প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য মহিলারা বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আদর্শের প্রতি অবিচল থেকেছেন। আর তাঁদের এই দৃঢ়তার মূল কারণ তাঁহার জ্ঞান ও অধ্যয়ন। এই শিক্ষা এবং সংগ্রাম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতা লেখনীর মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন সাধারণ মহিলা ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে।

তথ্যসূত্র :

১। পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬ সেন মণিকুন্তলা, সেদিনের কথা

২। মুখোপাধ্যায় কনক, মনে মনে, একসাথে, ২০০৬

৩। মুখোপাধ্যায় কনক, স্মরণ করি, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ২০০৩, পৃ. ৫৪-৫৮

৪। পালচৌধুরী অপর্ণা, নারী আন্দোলনের স্মৃতিকথা

৫। গুপ্ত শ্যামলী, বঙ্গমহিলা চরিতাভিধান, সাহিত্যলোক, ২০০৯,পৃ.১৮-১৯

৬। Brief History of Srimati Bhakti Ghosh, Police File No.- 777/42

৭। গুপ্ত শ্যামলী, পূর্বোক্ত

৮। দাশগুপ্ত কমলা, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০১৫, পৃ. ১৩৪-১৩৮

৯। দাশগুপ্ত কমলা, পূর্বোক্ত

১০। দাশগুপ্ত কমলা, পূর্বোক্ত

১১। দাশগুপ্ত কমলা, পূর্বোক্ত

১২। গুপ্ত শ্যামলী, শতবর্ষের কৃতি বঙ্গনারী

১৩। দাশগুপ্তা কমলা, পূর্বোক্ত

১৪। মুখোপাধ্যায় কনক, স্মরণ করি

১৫। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, মণিকুন্তলা সেন জনজাগরণ নারীজাগরণে, থীমা, ২০১০ পৃ.১০১

১৬। চট্টোপাধ্যায় রাণু, বাংলাদেশের স্মৃতিকথা

১৭। চক্রবর্তী জ্যোতি, জ্যোতি চক্রবর্তী রচনা সংগ্রহ

১৮। History Sheet of Bimala Majee, Police File No.- 1628/49

১৯। মুখোপাধ্যায় কনক, সাতাশে এপ্রিল

২০। গুপ্ত শ্যামলী, বঙ্গমহিলা চরিতাভিধান, পৃ. ২৪২-২৪৩

২১। মুখোপাধ্যায় কনক, স্মরণ করি, পৃ. ৩৫

২২। মুখোপাধ্যায় কনক, স্মরণ করি

২২। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪-৩০

২৩। মুখোপাধ্যায় কনক, স্মরণ করি, পৃ. ৪৮-৪৯

২৪। মুখোপাধ্যায় কনক, স্মরণ করি

২৫। মুখোপাধ্যায় কনক, মনে মনে

২৬। মুখোপাধ্যায় কনক, সাতাশে এপ্রিল

২৭। মুখোপাধ্যায় সরোজ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা। পৃ.৪৯০ ও চট্টোপাধ্যায় রাণু, বাংলাদেশের স্মৃতিকথা, পৃ.১৭

২৮। গণশক্তি, ৬ই মে ২০১৩

২৯। চট্টোপাধ্যায় রাণু, পূর্বোক্ত, ২৭

৩০। মুখোপাধ্যায় সরোজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩

৩১। গুপ্ত শ্যামলী, বঙ্গমহিলা চরিতাভিধান

৩২। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫, মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ. ৪১; মুখোপাধ্যায় সরোজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩

৩৩। মুখোপাধ্যায় সরোজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬

৩৪। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২-৯৪

৩৫। চট্টোপাধ্যায় তুষার-স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলী জেলা, পৃ. ১৬৩; গুপ্ত শ্যামলী, বঙ্গমহিলা চরিতাভিধান পৃ. ২৬০

৩৬। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯

৩৭। গুপ্ত শ্যামলী, বঙ্গমহিলা চরিতাভিধান, পৃ. ২৮৭

৩৮। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭; গুপ্ত শ্যামলী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪০

৩৯। পুলিশ ফাইল নং ৭৭৭/৪২, মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

৪০। গুপ্ত শ্যামলী, পূর্বোক্ত,পৃ.২৩৭

৪১। গুপ্ত শ্যামলী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২২-৩২৩

৪২। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯-১০০

৪৩। মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ. ৪১

৪৪। মুখোপাধ্যায় সরোজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩

৪৫। নাগ নিবেদিতা, ঢাকা থেকে কলকাতা, পৃ. ৩৪; একসাথে ফাল্গুন, ১৪১৯, পৃ. ১৫ ; গুপ্ত শ্যামলী, বঙ্গমহিলা চরিতাভিধান, পৃ. ২৫৫

৪৬। পুলিশ ফাইল নং- ৭৮৯ (৪৬)

৪৭ ।পুলিশ ফাইল নং- ১৬২৮/৪৮

৪৮। গুপ্ত শ্যামলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪০ মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি গুপ্ত, পূর্বোক্ত

৪৯। মুখোপাধ্যায় সরোজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩

৫০। মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃ. ৪১

৫১। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

৫২। ঘোষ অসিত, আপন কথা, পূর্বদেশ, ২০১১, পৃ. ১৫-১৭

৫৩। মুখোপাধ্যায় সরোজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩

৫৪। বিশ্বাস অনিল, কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৩৭

৫৫। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

৫৬। মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা

৫৭। Sarkar Sujaya, Writing Women's History, Role of Autobiography and Sediner Katha, The Study of Social History Recent Trends, Ratna Ghosh (ed), Progressive Publishers, 2015, P. 299-314.

৫৮। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

৫৯। পুলিশ ফাইল নং, ৩৮৯০/৪৯

৬০। পুলিশ ফাইল নং, ৭৮৯/৪৬

৬১। মুখোপাধ্যায় কনক, স্মরণ করি, পৃ.৫০

৬২। মুখোপাধ্যায় কনক, মনে মনে, পৃ.১১৯-১২০

৬৩। নাগ নিবেদিতা, ঢাকা থেকে কলকাতা, পৃ. ৩১

৬৪। মুখোপাধ্যায় কনক, মনে মনে

৬৫। পুলিশ ফাইল নং - ৬১৯/৩৬

৬৬। পুলিশ ফাইল নং - ৬১৯/৩৬

৬৭। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৭

৬৮। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩

৬৯। পালচৌধুরী অপর্ণা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯

৭০। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৮

৭১। মুখোপাধ্যায় সরোজ, পূর্বোক্ত

৭২। মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা

৭৩। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত

৭৪। সেন মণিকুন্তলা, সেদিনের কথা, পৃ. ৯৭

৭৫। পুলিশ ফাইল নং, ৮৯৮/৪৪

৭৬। পুলিশ ফাইল নং, ৭৭৭/৪২

৭৭। পুলিশ ফাইল নং- ৬১৯/৩৬

৭৮। মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত,পৃ. ৩২

৭৯। নাগ নিবেদিতা, ঢাকা থেকে কলকাতা, পৃ. ২৬-২৭

৮০। পালচৌধুরী অপর্ণা, নারী আন্দোলনের স্মৃতিকথা, পৃ. ১৩-১৬

৮১। চক্রবর্তী রেণু, ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা, পৃ. ৫-৬

৮২। পুলিশ ফাইল নং ৭০২-৪৯(৩১)

৮৩। Police File No. 1628/49

৮৪। পুলিশ ফাইল নং ৭৭৭/৪২

৮৫। মুখোপাধ্যায় কনক, মনে মনে, পৃ. ৭৫

৮৬। গুপ্ত শ্যামলী,বঙ্গমহিলাচরিতাভিধান

৮৭। মুখোপাধ্যায় কনক, স্মরণ করি, পৃ.৫৩

৮৮। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৮

৮৯। মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৬

উপসংহার

এই গবেষণাপত্রে ১৯৪৭খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বামপন্থী মহিলাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যকলাপের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বামপন্থী মহিলা সংগঠন, মহিলাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও আন্দোলন সম্পর্কিত বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণাপত্রে যে দিকগুলি বিশেষভাবে উঠে এসেছে সেগুলি হলঃ

আলোচ্য সময়কালে বামপন্থী মহিলাদের সংগঠিত হওয়া এবং বিভিন্ন স্তরের মহিলাদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। প্রাথমিক পর্বে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মধ্যে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের মহিলাদের সঙ্গে বামপন্থী মহিলারা যুক্ত হয়ে গড়ে তোলেন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'[১]। ধীরে ধীরে এই সংগঠনের নেতৃত্বভার চলে আসে বামপন্থী মহিলাদের হাতে। ফলে এই সমিতি বিভিন্ন দলের মহিলাদের সমন্বয়ে গঠিত হলেও এটি মূলত পরিণত হয় বামপন্থী মহিলাদের সংগঠনে। কিন্তু এই সমিতির আবার অখণ্ড রূপ বজায় থাকে নি। সরকারের প্রতি সমিতির দৃষ্টিভঙ্গী বা নীতি নির্ধারণকে কেন্দ্র করে বামপন্থী মহিলাদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। ফলে এই সমিতিও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। আসলে বামপন্থী দলগুলির দ্বারা তাদের গণসংগঠনগুলি পরিচালিত হওয়ায় দলগুলির মধ্যেকার বিরোধের প্রভাব গণসংগঠনগুলির উপর পড়ে। শুধু তাই নয়, বামপন্থী মহিলাদের পক্ষ থেকে বারে বারে অভিযোগ আনা হয়েছে দলগুলির সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গীর[২]। বলা যায় সামন্ততান্ত্রিকতার ঝোঁক থেকে দলগুলি বেরিয়ে আসতে না পারায় নারীফ্রন্টের ব্যাপ্তি ও শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে তা প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বলা যায়, সমস্ত সময়কাল জুড়ে নানা সাংগঠনিক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বামপন্থী মহিলারা তাদের সংগঠনের অস্তিত্ব বজায় রেখে তার বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা করেন।

আলোচ্য পর্বে বামপন্থী মহিলারা আশু রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে সামিল হন। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল তেভাগা আন্দোলন। এই আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে বামপন্থী মহিলারা কৃষক রমণীদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে তাদের আন্দোলনে সামিল করান[৩]। ফলে বামপন্থী মহিলাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য কৃষক রমণীদের সংগঠনে নিয়ে আসা তা অনেকখানি পূরণ হয়েছিল বলা যায়। অনুরূপভাবে কারখানা ও রেলশ্রমিকদের আন্দোলনের সমর্থনে এবং তাদের পরিবারের পাশে থেকে শ্রমজীবী মহিলাদের আন্দোলনে কিছুটা পরিমাণে সামিল করতে পেরেছিলেন মহিলারা। যখন পুরুষরা

জনসভা করতে পারছেন না তখন মেয়েদের উপরই তাঁরা যে নির্ভর করছেন তা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। দেখা যায় যে, যে সমস্ত এলাকায় পুরুষরা প্রবেশ করতে পারছেন না সেখানে যে ধরনের কাজ পুরুষদের কাছে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেইসমস্ত কাজে মহিলাদের নিয়োগ করার চেষ্টা হয় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে। যেমন মেদিনীপুর জেলার 'Women's fraction committee এর সম্পাদক মৃণাল (পদবী নেই) মেদিনীপুর জেলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদককে চিঠিতে লেখেন—"এখানে আসিয়া মনে হইতেছে এবং কমরেডরাও বলিতেছেন কিষাণ এলাকার মতোই এখানেও মেয়েদেরকে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ অগ্রবর্তীর অংশগ্রহণ করিতে হইবে। পুলিশ হামলায় ছেলেদের মধ্যে Mass meeting করা বন্ধ হইয়াছে। এই Mass meeting করাইতে হইবে মেয়েদেরকে দিয়াই। বন্দীমুক্তির দাবী তুলিতে আগে বাহির হইয়া আসিবে মেয়েরাই, পুলিশের সহিত সাক্ষাৎ মোকাবিলা করিবার জন্য সামনে দাঁড়াইতে হইবে মেয়েদেরকেই"।[৪] এই চিঠি থেকেই জানা যায় মহিলা নেত্রীরা কোন কোন সময়, এমনকি বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে মফস্বল অঞ্চলে এককভাবেও নেতৃত্ব দিতেন , যেখানে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের সে অর্থে কোন রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল না। ভীষণ অসুবিধার মধ্যে তাদের কাজ করতে হত। তাতেও তাঁরা হতোদ্যম হতেন না। পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতেন। এই চিঠি থেকে আরো জানা যায় যে, কৃষক ও শ্রমিক উভয় শ্রেণীর মেয়েদেরই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনের পাশাপাশি বামপন্থী মহিলাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় বন্দীমুক্তি আন্দোলনে। বাইরের আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য জেলের ভেতরেও মহিলারা অনশন করেন এবং এই আন্দোলনে অংশ নিয়ে বামপন্থী মহিলারা পুলিশের গুলিতে নিহত হন[৫]।

বামপন্থী মহিলাদের কর্মসূচীর অন্যতম বিষয় ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের উন্নয়ন। আর এই উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা ছিল বাস্তুহারা সমস্যা। এই জ্বলন্ত আর্থ-সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে বামপন্থী মহিলারা সাধ্য অনুযায়ী বাস্তুহারাদের পাশে দাঁড়ান। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তা অল্প ছিল। কিন্তু সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়[৬]। নারীদের উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হল শিক্ষা। এই শর্তপূরণের লক্ষ্যে বামপন্থী মহিলারা যেমন নিজেরা শিক্ষিত হয়েছেন তেমনই সাধারণ মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন[৭]। অবশ্য বাংলার সর্বত্র এই উদ্যোগের বাস্তবায়ন ঘটে নি। শিক্ষাদানের পাশাপাশি নারীদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ছিল সামাজিক কুসংস্কারগুলিকে দূরীভূত করা। তাই হিন্দু কোড বিলের সমর্থনে

বা পণপ্রথা বিরোধী বিল পাশ করার ব্যাপারে বামপন্থী মহিলারা বিশেষ উদ্যোগী হন[৮]। তবে এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে গিয়ে গৃহস্থ বাড়ি থেকে শুরু করে হিন্দু মহাসভার মত দলের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁদের। আবার কংগ্রেসের শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সমেত বেশকিছু নেতৃত্ব বামপন্থীদের সঙ্গে থাকলেও কংগ্রেসের একাংশ হিন্দু কোড বিলের বিরোধিতা করেন। সেজন্য অবশ্য প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু দলের মধ্যে হুইপও জারি করেন[৯]। অন্যদিকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা জন্মশাসন নিয়ে বামপন্থী মহিলাদের উদ্যোগকেও কমিউনিস্ট পার্টি ঠিক পছন্দ করত না। কারণ, পার্টির যুক্তি ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। ফলে, বামপন্থী মহিলাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতির প্রচার কার্যকর করার ক্ষেত্রে পার্টির তরফ থেকেও তাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়[১০]।

নারীদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে বামপন্থী মহিলাদের উদ্যোগ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁরা বিশেষভাবে জোর দেন মহিলাদের জীবিকার উপর যা সেইসময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এক নতুন ধারণা ছিল। বিভিন্ন পেশায় মহিলাদের যুক্ত করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল মূল লক্ষ্য[১১]। এই লক্ষ্যপূরণে সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায়ের জন্য নানা পদক্ষেপ নেওয়া, সম্মেলনগুলিতে এ ব্যাপারে আলোচনা ও প্রস্তাব নেওয়ার পাশাপাশি মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য নিজেদের উদ্যোগে নানা কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলার মত কর্মসূচী নেন মহিলারা। পাশাপাশি কর্মক্ষম মহিলাদের সন্তানদের রাখার জন্য ক্রেশের ব্যবস্থা করার উপর জোর দেন মহিলারা।

বামপন্থী মহিলারা নারীদের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের উন্নয়নের উপরও জোর দেন— যা ছিল তাঁদের আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিশুদের খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য নানা কেন্দ্র গড়ে তোলা, শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ভবিষ্যতকে সুনিশ্চিত করার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা, শিশুশ্রম বন্ধের উপর জোর দেওয়া, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও খেলাধূলার প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে তাদের উৎসাহিত করা, বিভিন্ন গণতন্ত্রী সংগঠন বুদ্ধিজীবী ও সমাজসেবীদের কাছে গিয়ে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় শিশুমঙ্গলের ব্যবস্থা করার জন্য কর্মসূচী নেন মহিলারা[১২]।

মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের পাশাপাশি বামপন্থী মহিলারা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। বিড়ি শ্রমিক, বাস কর্মচারী, মৎসজীবী, শিক্ষক সমাজের জীবন-জীবিকার সাথে যুক্ত বিভিন্ন দাবিতে সংগঠিত আন্দোলনগুলিতে মহিলাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত জীবিকার সাথে যুক্ত আন্দোলনকারী পরিবারগুলির মহিলাদের কাছে সাহায্যের

হাত বাড়িয়ে দেন বামপন্থী মহিলারা[১৩]।

বামপন্থী মহিলারা সংগঠিত হওয়ার প্রথম পর্ব থেকেই চেষ্টা করেছেন নারীদের মর্যাদা রক্ষা করার দিকে। মর্যাদাহানিকর কোন ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য সদা সতর্ক থেকেছেন মহিলারা। ৪৩-এর মন্বন্তরের সময়েও অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে হীন চরিত্রের লোকেরা যাতে মহিলাদের মর্যাদা নষ্ট না করে সেজন্য সীমিত শক্তি নিয়েও তারা চেষ্টা করেছেন। সর্বত্র যে তাঁরা পৌঁছতে পেরেছিলেন তা নয় কিন্তু যেখানে উপস্থিত থেকেছেন সেখানে তাঁরা সফল হয়েছেন। পতিতা ব্যবসা নিরোধ বিলের পক্ষে বিভিন্ন জায়গায় মহিলারা সভা সংগঠিত করে প্রচার করেছেন। আবার , ১৯৭০ সালের শেষাশেষি পশ্চিমবঙ্গে নারীর মর্যাদাহানিকর কিছু কিছু ঘটনা যখনই ঘটেছে তখনই মহিলারা প্রতিবাদে সরব হয়েছেন[১৪]।

১৯৪৭-১৯৭৭ এই সময়পর্বে বামপন্থী মহিলারা মূলতঃ যে আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশ নিয়েছিলেন তা হল খাদ্য আন্দোলন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের সেবা করার মহান ব্রত নিয়েই মহিলারা সংগঠিত হয়েছিলেন। সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষকে ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচানো। এই লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়েছেন। স্বাধীনতার পরও পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সময়ে খাদ্য সংকট প্রকটিত হয়েছে। এই খাদ্য সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে মহিলারা বিশেষভাবে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেন তা হলে রেশনিং ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রচলিত রেশনিং ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালানো, নতুন রেশন দোকান খোলার দাবিতে সরকারের কাছে দরবার করা, সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় লঙ্গরখানা ও দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র চালু করা, অন্যান্য গণ সংগঠনের সাথে যৌথভাবে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা, গোপন মজুত উদ্ধার করা, সভা-মিছিল সংগঠিত করে মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ করার মত কর্মসূচী নেন মহিলারা[১৫]। প্রয়োজনের তুলনায় তাঁদের উদ্যোগ যদিও ছিল সীমিত কিন্তু সেইসময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। খাদ্য আন্দোলনে বামপন্থী মহিলাদের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে আরো একটি দিক উঠে আসে তা হল সরকারও এই সংকট মোকাবিলা করতে গিয়ে বামপন্থী মহিলাদের কাছ থেকেই আরো স্বেচ্ছাসেবিকার তালিকা চেয়ে পাঠান।[১৬] যদিও সদস্য সংখ্যা কম থাকায় সরকারকে পুরোপুরি সাহায্য করা বামপন্থী মহিলাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবুও বলা যায় স্বেচ্ছাসেবিকা হিসাবে বামপন্থী মহিলাদের কাজ প্রশংসনীয় ছিল বলেই সরকারও তাঁদের উপর ভরসা করার সাহস পেয়েছিলেন।

আবার খাদ্যের দাবিতে মহিলা সমিতির একক উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে ও জেলায় জেলায়

আইন অমান্য করা, বিধানসভায় ও সংসদে বামপন্থী মহিলা সদস্যাদের প্রতিবাদ, খাদ্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী পুরুষদের পুলিশ গ্রেপ্তার করলে তাদের পরিবার ও এলাকাগুলিতে যাওয়ার মত কর্মসূচী নেন মহিলারা। জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নানা অভিনব পদ্ধতিও আবিষ্কার করেন তাঁরা।

আলোচ্য সময়কালে বামপন্থী মহিলাদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের সাথে নিজেদের যুক্ত করা। বিশ্বনারী সংঘের সাথে বামপন্থী মহিলাদের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। বিশ্বনারী সংঘের শাখা পশ্চিমবঙ্গেও গড়ে ওঠে এবং তার নেতৃত্বভার থাকে বামপন্থী মহিলাদের হাতে। বিশ্বমাতৃসম্মেলনেও বামপন্থী মহিলাদের উপস্থিতি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৭] এইভাবে বাংলার নারী আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেন বামপন্থী মহিলারা।

আবার, বামপন্থী দলের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা থাকায় আলোচ্য পর্বের মহিলা নেত্রী ও কর্মীদের মধ্যে সমস্ত রকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করে ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা চাওয়া পাওয়াকে দূরে সরিয়ে সংগঠনের স্বার্থকে বড় করে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে, তাঁরা অতি দ্রুত সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন। মণিকুন্তলা সেন তাই লিখেছেন— "কমিউনিস্ট কর্মীকে কী অসীম ধৈর্যের পরীক্ষাই না দিতে হয়। হাঁস-মুরগী যেমন নিজের বুকের উত্তাপ দিয়ে ডিমের খোলস ছাড়ায়, বাচ্চার চোখ ফোটায়, তেমন কমিউনিস্ট কর্মীরাও তাদের ধৈর্য ও ভালোবাসা দিয়ে ওদের চোখ ফোটাতে পারে। লৌহপিণ্ডকে পারে খাঁটি ইস্পাতে পরিণত করতে।"[১৮]

পাশাপাশি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় নেতৃত্বও উদ্যোগী হন বিভিন্ন প্রদেশে নারী-আন্দোলন সংগঠন গড়ে তুলতে। সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ পার্টি সম্পাদক পি.সি. যোশী, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, পি সুন্দরাইয়া, মুজফফর আহ্মদ প্রমুখ মহিলা ফ্রন্টের কাজের প্রতি বিশেষ জোর দেন। বাংলার কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ মুজফ্ফর আহ্মদ (তদানীন্তন পার্টির প্রাদেশিক সম্পাদক), ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, সরোজ মুখার্জী, সুধীন রায়, বঙ্কিম মুখার্জী প্রমুখ মহিলা ফ্রন্টকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক কমিটিতে উদ্যোগ নেন ও জেলাগুলিতে নেতৃত্ব গড়ে তোলার উপর বিশেষ জোর দেওয়ায় বাংলাতে মহিলাদের সংগঠন আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১৯]

বামপন্থী মহিলারা সীমিত শক্তি নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে কাজ করলেও আলোচ্য

পর্বের বামপন্থী মহিলাদের সংগঠিত হওয়া এবং বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে আন্দোলন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নানা বাধা অতিক্রম করে এগোতে হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের চলার পথটি সুগম ছিল না।

বামপন্থী মহিলাদের কাজের ক্ষেত্রে আর একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিজেদের মধ্যে আদর্শগত সংঘাত। বারবার মূলত আদর্শের প্রশ্নে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত সংগঠনে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। বামপন্থী মহিলাদের কাছে এটি ছিল একটি বড় সমস্যা এবং সেজন্য জনমানসে তার প্রভাবও পড়ে।

দলের প্রতি অনুগত থাকলেও এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দলের পুরুষ নেতৃত্ব ও সহকর্মীদের পাশে পেলেও কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ দলীয় নির্দেশ তাদের কাছে প্রতিকূল এবং অবমাননাকর হিসেবে মনে হত।

জানা যায় বন্দীমুক্তির দাবিতে বামপন্থী মহিলারা ৫৩ দিন অনশন করেন। যদিও সকলে তা খুশি মনে মেনে নিয়েছিলেন তা নয়। কিন্তু যেহেতু দলের নির্দেশ তাই সকলে মানতে বাধ্য ছিলেন। তবে যখন কমিউনিস্ট দলের তরফ থেকে নির্দেশ আসে নুন ও লেবু জল না খেয়ে শুধু জল খেতে হবে তখন অনেক মহিলা নেত্রীই উপলব্ধি করেন পার্টি চাইছে জেলের অভ্যন্তরে কিছু লোক মারা যাক। তা না হলে জেলের বাইরের আন্দোলন জোরদার হবে না। তাই এই নির্দেশ। কাজেই দেখা যায় বন্দীমুক্তির দাবিতে মহিলাদের আন্দোলন ছিল উল্লেখ করার মত যদিও এই আন্দোলন সম্পর্কে পার্টির সব সিদ্ধান্ত মহিলারা খুশি মনে মেনে নিতে পারেন নি[২০]।

অনুরূপভাবে অনেক জায়গায় ক্ষেতমজুর ও জোতদারের সহিংস লড়াই এর পথ ও নীতি বামপন্থী মহিলাদের যে পছন্দ হয় নি তা তাঁরা বিভিন্নভাবে স্বীকার করেছেন। যেমন মণিকুন্তলা সেনের লেখা থেকে জানা যায় কোন কোন গ্রামীন এলাকায় জোতদারদের কেটে টুকরো টুকরো করে হাঁড়িতে ভরে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হত। এই পন্থা মহিলা নেত্রীদের অপছন্দ ছিল।[২১]

এমনই আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কনক মুখার্জীর লেখা থেকে। জানা যায় কমিউনিস্ট নেতা পি সি যোশী, এক পার্টি মিটিং-এ নেতৃত্বদের যোগ্যতা এবং সর্বক্ষণ কর্মীরা যে ত্রিশ টাকা করে ভাতা পেতেন তা নিয়ে খুব অসম্মান করেন কর্মীদের। যার জন্য কনক মুখার্জী চাকরিতে যোগ দেন।[২২] আবার অনেক সময়ই তাঁদের দলের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। কিন্তু তাঁরা প্রতিবাদ করতে পারেন নি। এমনই এক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে ময়মনসিং এর নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষক সম্মেলনে। পিসি যোশী অতি রূঢ় ভাষায় মহিলাদের সমালোচনা করেন। অভিযোগ ছিল কৃষক রমণীদের মধ্যে যেভাবে মেলামেশা করা উচিত সেভাবে

বামপন্থী মহিলারা মেলামেশা করেন না। মনোরমা বসু থেকে শুরু করে অনেক প্রবীণ মহিলাকর্মী যাঁরা নিরন্তর কৃষক রমণীদের মধ্যে কাজ করতেন তাঁরা এই সমালোচনা গ্রহণ করতে পারেন নি। আবার প্রতিবাদ করার সাহসও পান নি বলে তথ্যে পাওয়া যায়। একটি সূত্র থেকে জানা যায় এরপর কনক মুখার্জী পার্টির সারাক্ষণের কর্মীপদ থেকে ইস্তফা দেন[২৩]। যদিও কনক মুখার্জী 'মনে মনে' তে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন[২৪]।

কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত হলেও নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে বামপন্থী মহিলারা সকলে যে কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতে পারেন নি তা তাঁদের লেখনী থেকে জানা যায়। যেমন ১৯৫২সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১০০টি আসনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রার্থী দেয়। আর ১০০টি সীটের মধ্যে মাত্র ১টি সীটে মহিলাপ্রার্থী দাঁড় করানো হয়। আবার যে সীটে বিরোধী দল এবং পার্টির কোন দাবিদার ছিল না - সেরকম ১টি সীটে মহিলা প্রার্থী দাঁড় করায় পার্টি। মহিলা নেত্রীদের লেখা থেকে জানা যায় আরো কিছু সীটে মহিলা কর্মীদের দাঁড় করালে জেতা হয়তো যেত। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির আস্থা ছিল না মহিলাদের উপর। দেখা যায় ১০০টি সীটের মধ্যে ২৮টি সীটে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরা জিতেছিলেন এবং অবশ্যই মহিলা প্রার্থী সমেত[২৫]। শুধু নির্বাচন নয় পার্টির বিভিন্ন সম্মেলনে গঠিত কমিটিগুলিতেও মহিলা প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল খুব অল্প অথবা কোন কোন কমিটিতে মহিলাদের কোন স্থান দেওয়াই হত না।

তাই দেখা যায় আলোচ্যসময়কালে বামপন্থী মহিলা আন্দোলন সম্পর্কে পার্টির মধ্যেকার উদাসীনতা এর চলার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একথা ঠিক যে মহিলারা তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে পুরুষ সহকর্মীদের সাহায্য পেয়েছেন, আবার তাঁদের উদাসীনতাও লক্ষ্য করেছেন—যা তাঁদের বিভিন্ন লেখার মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

পারিবারিক ও সামাজিক বাধা, কখনো কখনো দলের পুরুষ নেতৃত্বদের উদাসীনতা এবং এর পাশাপাশি সরকারের বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর মোকাবিলা করে সংগঠনকে প্রসারিত করা, বিভিন্ন স্তরের নারীদের সচেতন করা এবং নারীমুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। অর্থাৎ বামপন্থী মহিলাদের কাছে এই পর্বটি ছিল একটি লড়াই-এর পর্ব, শূন্য থেকে আরম্ভ করে কিছু পাওয়ার জন্য লড়াই। আর অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই লড়াই-এ সামিল হতে পেরেছিলেন বলেই পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী মহিলারা শক্তিশালী ভিতের উপর সংগঠনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ১৯৭৭-এর পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের এই আন্দোলনকামী মানসিকতা অন্যতম উপাদান হিসাবে কাজ করেছিল বলা যায়। পরবর্তীকালে

সংগঠনের বিস্তার ঘটাতে এই সংগ্রাম যেমন কার্যকরী হয়েছিল তেমনই সরকারের কাছ থেকে দাবি-দাওয়া আদায় করতে তাঁদের সহায়ক হয়ে উঠেছিল। প্রথম পর্বের মহিলাদের ত্যাগ ও প্রচেষ্টা পরবর্তীকালের বামপন্থী নারীদের সংগঠনকে প্রসারিত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

ফলস্বরূপ ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর ১৯৭৮ সালের জুন মাসে অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশ অনুসারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে যখন স্বায়ত্তশাসনের বিস্তার ঘটানো হয় তখন এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে ২০০(দুইশত) মহিলা নির্বাচিত হন[২৬]। বিশেষভাবে উল্লেখ্য সরকার এই নির্বাচনে ঘোষণা করেন ১৫টি জেলা পরিষদে ৩২৫টি ব্লক স্তরের পঞ্চায়েত সমিতিতে এবং ৩২৪২টি অঞ্চলস্তরের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি ক্ষেত্রে ২জন করে মহিলা সদস্যাকে নির্বাচিত করতে হবে। যেখানে এভাবে ২জন মহিলা সদস্যা নির্বাচিত হন নি — সেক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে দুজন মহিলাকে মনোনীত করা হয়। এভাবে বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরে নির্বাচিত ও মনোনীত ৭১৬৪ জন মহিলাকে প্রশাসনের দায়িত্বে এনেছিল। পৌর নির্বাচনে ঘাটাল ও পুরুলিয়া এই দুটি পৌরসভায় পৌরাধিপতি হয়েছিলেন দুজন মহিলা।[২৭]

পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাজ্যের সমাজকল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন বামপন্থী মহিলা নেত্রী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় । রাজ্য সমাজকল্যাণ পর্ষদের বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম ছিল দুঃস্থ নারীদের স্বাবলম্বী করা এবং শিশুকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সামাজিক -অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ। রাজ্যের সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা পঙ্কজ আচার্য। মাধুরী দাশগুপ্ত , মঞ্জরী গুপ্ত, কনক মুখোপাধ্যায়, প্রভা চ্যাটার্জী, মৃণালিনী দাশগুপ্ত প্রমুখ এই উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ রাজ্য সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রিকৃত ও অনুদানপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে এবং শিল্প সমবায়গুলিকে ক্ষুদ্র উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আর্থিক সাহায্যদান করে। এই উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে দুঃস্থ উপার্জনক্ষম মহিলাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দান করার পরে উৎপাদনকর্মে নিয়োগ করা হয়। এইরকম সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রকল্প ১৯৭৭ সালে ৩৮টি ছিল ১৯৮০ সালে তার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭টি হয় এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমাজের দুর্বল অংশের নারীদের শিক্ষাগত মান বৃদ্ধির জন্য বয়স্কা নারীদের সংক্ষিপ্ত শিক্ষাকোর্সের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ ১৯৭৬-৭৮ সালে ১৭টি কেন্দ্র পরিচালনা করত। ১৯৮০ সালে তা বেড়ে ৩৩টি কেন্দ্রে ৮২৪ জন

ছাত্রী পড়াশোনা করার সুযোগ পায়। এছাড়া, ১৯৮০-৮১ সালে ৫৮টি বালোয়াদি কেন্দ্র, ২০টি ক্রেশ, ৬০টি হলিডে ক্যাম্প রাজ্য সমাজকল্যাণ পর্ষদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। বিশেষ করে দুঃস্থ নারীদের রাখার জন্য দুঃস্থাবাস (Destitute Home) কেন্দ্র, চাকুরীজীবী নারীদের জন্য মহিলা আবাসিক কেন্দ্র এবং শিশুদের রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ক্রেশের ব্যবস্থা করাও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহুপূর্ব থেকেই বামপন্থী মহিলাদের আন্দোলন পরিচালনা ও দাবী উত্থাপনের মধ্যে এই দাবীগুলি ছিল অন্যতম।[২৮] ফলে আমাদের আলোচ্য সময়কালে বামপন্থী মহিলাদের এই সমস্ত দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন যে পরবর্তীকালে সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে অনেক প্রভাবিত করেছিল তা বলা যায়।

এছাড়া নারীদের দীর্ঘদিনের দাবী সমান কাজে সমান মজুরী - এই দাবীটিও বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়। ক্ষেতের কাজে, কলকারখানার কাজে, বাগিচা সহ সমস্তক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক নারী কর্মীদের জন্য সমান কাজে সমান মজুরীনীতি গ্রহণ পূর্বের আন্দোলনের ফল বলা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়া পর্যন্ত বামপন্থী মহিলাদের কাজ ছিল বিভিন্ন বিষয়কে এবং বিভিন্ন স্তরের নারীদেরকে কেন্দ্র করে। এই কাজে যে সবক্ষেত্রে সফলতা এসেছিল তা বলা যায় না। কিন্তু তাঁদের সাফল্য, তাঁদের ব্যর্থতা, তাঁদের ভাবনা ও সর্বোপরি তাঁদের প্রচেষ্টা স্বাধীন বাংলার ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। স্বাধীন বাংলার একেবারে জন্মলগ্ন থেকে আরম্ভ করে বামপন্থী নারীদের সংগ্রামের বিভিন্ন রূপ, বামপন্থী নারী সংগঠনের কাজ, আভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাত এই সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশেষ বিষয় — যেগুলি এই গবেষণাপত্রে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়া পর্যন্ত বামপন্থী মহিলাদের যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তা কমিউনিস্ট নেতা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৬মে, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কলকাতা জেলা পঞ্চদশ সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে জ্যোতি বসু বলেন — "আপনারা বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার গঠন করেছেন। আপনারাই এই সরকারের পরিচালিকা শক্তি। আপনাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়, অনেক দুঃখের সঙ্গে জীবন কাটাতে হয়। তাই আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে শোষণমুক্তির সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই নারীমুক্তি ঘটতে পারে।"[২৯] কাজেই বলা যায় পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর

যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধার আওতায় নারীদের নিয়ে আসার চেষ্টা হয় তার প্রস্তুতি ঘটেছিল আমাদের আলোচ্য পর্বে ১৯৪৭-১৯৭৭সময়কালে। যে অধ্যায়টি ছিল প্রকৃতঅর্থে এক আন্দোলন ও সংগ্রামের অধ্যায়।

তথ্যসূত্র :

১) মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা ; পৃ. ৪৭

২) বিশ্বাস অনিল, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন-দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬০

৩) তেভাগা সংগ্রাম রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ

৪) পুলিশ ফাইল নং - ৭৮৯/(৪৬) মেদিনীপুর জেলার 'Women's Fraction Committee -এর সম্পাদক মৃণাল (পদবী নেই) মেদিনীপুর জেলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদককে একটি বড় চিঠি লেখেন। এই চিঠি থেকে তৎকালীন সময়ের মহিলাদের সংগঠন, আন্দোলন এবং এ সম্পর্কে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী অনেকখানিই উপলব্ধি করা যায়

৫) সাতাশে এপ্রিল, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি

৬) চক্রবর্তী রেণু, ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা (১৯৪০-১৯৫০), অনুবাদ পুষ্পময়ী বসু ও মণিকুন্তলা সেন, মনীষা

৭) পুলিশ ফাইল নং - ৩৮৯০/৪৯

৮) পুলিশ ফাইল নং - ৮৯৮/৪৪

৯) মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৬-২১৯

১০) মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত

১১) পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬

১২) পুলিশ ফাইল নং ৩৮৯০/৪৯

১৩) পুলিশ ফাইল নং ৬১৯/৩৬ ; বসু জ্যোতি, যতদূর মনে পড়ে, পূর্বোক্ত

১৪) চক্রবর্তী জ্যোতি রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ১৯৮৮

১৫) মজুমদার দিলীপ, পশ্চিমবঙ্গের গণ আন্দোলন ও খাদ্য আন্দোলন এবং Das Suranjan & Bandyopadhyay Premansu Kumar, *Food Movement of 1959*, Ibid.

১৬) মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

১৭) ঘরে বাইরে, ১৩৫৯-৬০

১৮) মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯

১৯) মুখোপাধ্যায় কনক, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৩

২০) মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, মণিকুন্তলা সেন জনজাগরণে নারী জাগরণে, পৃ.১৯৪

২১) মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০

২২) মুখোপাধ্যায় কনক, মনে মনে, পৃ. ১২২

২৩) মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮

২৪) মুখার্জী কনক, মনে মনে, পূর্বোক্ত

২৫) মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

২৬) বন্দ্যোপাধ্যায় কল্যাণী, রাজনীতি ও নারীশক্তি, পৃ. ১০১

২৭) আচার্য পঙ্কজ, নির্বাচিত রচনা, পৃ ১০১

২৮) আচার্য পঙ্কজ, নির্বাচিত রচনা

২৯) মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা

Report

(1)

Copy of Report of D.I.O. (I) dated 13.3.56

Miss Laxmi Paul and Sebika Paul both daughters of Shri Nripendra Narayan Paul,Tufanganj town who are supported at the C.P.I. they started a "Mahila Atma Raksha Samity" at Tufanganj with Miss Sebika Paul as the secretary.

Police File No. 898/44 (1)

(2)

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তমলুকের কাজের রিপোর্ট

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মহিলা কংগ্রেসের পরে তমলুক মহকুমায় বিভিন্ন অঞ্চলে মহিলা মিটিং হয়। তাছাড়া তমলুকেও ২টা বৈঠক হয় কংগ্রেস সম্বন্ধে ও হিন্দু বিবাহ বিল, বিশেষ বিবাহ বিল ও পণপ্রথা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়। মেয়েরা খুব উৎসাহ ভরে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং সই তুলিবার ভার নেন। ১টা পুরুষ যে সদৃচ্ছা বিবাহ করিতে এবং স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে তার বেশ উদাহরণ চোখের সামনে রয়েছে যেমন- আমাদের ১টা কর্মী মেয়ে শচী দেবী তাকে স্বামী নেয় না। ১টা এক বছরের ছেলে নিয়ে বাপ মায়ের কাছে আছে। বাপ বা মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে আকুল হন। শচীর মা আমাকে বলেছেন দুঃখভরে, বলুনত আপনি এই মেয়েকে নিয়ে আমি কি করি এর ভবিষ্যৎ ত কিছু নেই। আমার অবস্থাও এমন নয় যে, এর ভরণ পোষণ করতে পারি। আমাদের সংসারে যা আয় তাতেই আমাদের চলে না। তারই বাড়ীর পাশেণ তাদের আত্মীয়দের আর একটা মেয়ে কমলা তাকেও স্বামী নেয় না। সেও বৃদ্ধমাতার অপরিসীম বোঝা। কমলার আর একটা বিবাহযোগ্যা ছোট বোন আছে কিন্তু পণপ্রথা এমন অবস্থাকরে রেখেছে যে বিবাহ দেওয়া গরীব, পরিবারে কি অমানুষিক কষ্ট তা তিনি উপলব্ধি করেন। আর কেঁদে বলেন এর কি বিহিত হবে না। এরূপ কত দৃষ্টান্ত চোখের ওপর আছে। আরও একটা মেয়ে তাকে স্বামী শুধু নেয় না তাই নয় - তার ছেলেটাকেও পিতৃত্বের দাবীতে মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এমনি কত দৃষ্টান্ত সমাজের বুকে রয়েছে। এই বুকে চাপান ভারী যাঁতাটা যাতে আলগা হয়ে যায় মেয়েরা যাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে তার জন্যই মেয়েরা সাগ্রহে বিলে সই দিচ্ছেন। গ্রামে ৫টা বৈঠক আমি করেছি তাতে প্রত্যেক বৈঠকে ১৩জন মহিলা থেকে ২১জন করে মেয়েরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সকলেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। নিজেরা সই দিয়েছেন। সংগঠনকে বাড়াতে হবে এর গুরুদায়িত্ব উপলব্ধি করেছেন। বাঁচার তাগিদে শহরের মেয়ে কর্মীরা সই তুলেছেন কোন বাধা বা প্রতিবাদের সম্মুখীন হননি। সহি সংগ্রহের কাজ চলছে।

বিভিন্ন জায়গায় সভ্য সংগ্রহের কাজ চলছে জেলার বা গ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে—এখনও কোন রিপোর্ট পাইনি। সব জায়গা হতে রিপোর্ট পাঠাতে লিখেছি। এখন পর্যন্ত ১০৮ (একশত আট) টি সভ্য হয়েছেন।

গত ৫/৭/৫৪ তারিখে মেয়ে কর্মীরা এস.ডি.ও-র নিকট একটা ডেপুটেশন দিয়েছিলেন মেয়েদের কথা এবং প্রসূতিসদন খোলার দাবি নিয়ে। প্রসূতিসদন খোলার ব্যাপারে সরকার কি করবেন এখনও কিছু যথেষ্ট বোঝা গেল না। কর্মকেন্দ্র সম্বন্ধেও প্রায় তাই। আমাদের জেলার সম্পাদিকা গীতা মুখার্জীর নেতৃত্বে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। আমি গ্রামে ছিলাম বলে এর মর্ম ঠিক বুঝতে পারিনি। সম্পাদিকার সহিত আমার দেখা হয় নাই। এরপরে এই ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে।

মহিলা সমিতির ফাণ্ডের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা আছে। কিন্তু নানা অসুবিধায় তাহা এখন করা সম্ভব নয়। সম্পাদিকা এখন ছুটিতে আছেন। তিনি ফিরে না এলে সম্ভব হবেনা। আমাদের জেলার সব জায়গা থেকে রিপোর্ট এলেপরে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠাবো।

অভিনন্দন সহ
স্বাঃ নির্মলা সান্যাল
তমলুক
পুলিশ ফাইল নং - ৮৯৮/৪৪(১)

(3)

The undersigned begs to report that female detenu Sm. Bhakti Ghosh wife Sri Udoybhanu Ghosh of Feeder Road, Bankura Town, Dist.Bankura, detained under the Govt. Order No. 4591. H. S. dated the 26th February, 1950, has been released from detention on 19.1.51 under the order of the Hon'ble High Court, Calcutta in connection with her Habeas Corpus Application (case no. 833/50) forwarded under no. 492 cr. dated 18.1. 51 to the Govt. West Bengal and a copy of which was sent to this Jail by the Govt. under no. 301 (5) H.S. dated the 19th Janu. 1951.

The detenu on release proceeded to her home address given above.

Sd/ J. Mukherjee
Superintendent
Presidency Jail, Calcutta.

Police File No.-777/42

(4)

Sri N.N. Basu

Special Supdt. of Police

Intelligence Branch C.I.D.

West Bengal, Calcutta

Reference your originators No. - 337 dated 3.11.50 regarding Smt. Bhakti Ghosh, Detenu.

Sm. Bhakti Ghosh was an important member of the Communist Party on the Female Front. Her detention put a check to the activity of the local Mahila Atma Raksha Samiti which is practically non-existant now. If she is released at this stage, she will surely revitalise its activity. Moreover, her husband Udoy Bhanu Ghosh, an important and active member of the Communist Party, its still absconding and has been carrying on communist activity from underground. Before her detention Smt. Bhakti Ghosh maintained contact with her husband and through him with other under ground communist workers and carried on Party Work. In case of her release she is likely to resort to her former tactics and render active assistance to the revitalisation of the rather inactive party. I would therefore strongly oppose her release.

B.C. Sarkar

Supdt. of Police, D.I.B.

Bankura

Police File No. 777/42

(5)

Brief History of Srimati Bhakti Ghosh Wife of Sri Uday Bhanu Ghosh of Feeder Road, Bankura Town, District Bankura, (Born 1923)

She gratuated herself from Bankura College in 1941 and was married to Uday Bhanu Ghosh of Bankura, an important member of the C.P.I. in 1946. She worked as Assistant Mistress at Kalitala Girls School for about 5 years and her service was dispensed with since January 1949 for her communistic activities .

She used to earn Rs. 65/- as her pay including D.A and spend the whole amount towards the expenses of her husband's family. She has no issue and her husband is leading the life of an absconder. Just before her arrest she was unemployed . She is the daughter of late Kishori Sinha of School danga, Bankura.

Her political activity came to notice in 1942. Intercepted correspondence revealed that she was intimately connected with the student organisations controlled by the C.P.I. She along with other girl students of Bankura town, formed a Committee styled Bankura Girl Students' Committee in the early part of 1942 and was in regular correspondence with Kalyani Mukherjee, General Secretary, B.P.C.S.C (Bengal Provincial Girl Students' Committee) which was controlled by the C.P.I. She also took prominent part in realising money for "May day" and observing "May Day", "China Day" etc. in Bankura town. In 1943, she was reported to be a member of the Bankura District Krishak Samiti which was under the control of the C.P.I. She was also connected with Mani Kuntala Sen (Since arrested),Gita Mukharji Roy Chowdhury and other important members of the C.P.I.

Besides what has been stated above, the following information have been placed on record against her–

Source No. 1 dated 31/3/47 - "A Secret meeting of Krishak Workers (C.P.I.) of the district was hold in Co-operative Biri Factory Workers' Union Office at Shibpukur, Bankura town on 29th March in the evening. Nripen Sen came from Calcutta to conduct the deliberations. Pramatha Ghosh (B.R. 615), Uday Bhanu Ghosh , Bhakti Ghosh (the subject) and many other C.P.I. workers of the district were present in the meeting. Resolutions for carrying on agitation for the release of political prisoners still in detention, against repressive measures of communist leaders, reiteration of the Tebhaga Movement throughout the province amongst the Bhagchasis nd cultivators etc.,were passed and carried."

Report of Superintendent of Police, Bankura dated 1/5/48. "Srimati Bhakti Ghosh (The subject) attended a meeting organised by the local C.P.I on 25/4/48 held at Kalitala, Bankura town under the Presidentship of Sri Jagadish Chandra

Palit (Security Prisoner) to protest against the arrest of T.U.C. leaders Sri S.A. Dange and Janab Abdul Momin. In the meeting, Bhakti Ghosh addressed the audience that the congress Govt. did not good to peasants, labourers and middle class people, on the contrary they hindered their progress. When these sufferers approached the authorities, to have their grievances redressed they had to face lathi charge and bullets from the police. She asked the students, labourers, peasants and middle class people to come under the banner of the C.P.I."

Source No. 2 dated 23/8/48 - "Bhakti Ghosh (the subject) of Feeder Road, Bankura is at present busy in recruiting girls from Bankura town to represent on behalf of Bankura Mahila Atma Raksha Samiti in the ensuing South East Asia Women conference to be held in Calcutta soon. She has received written instructions from Gita Mallik Secretary, West Bengal M.A.R.S. 93/1/A Bowbazar Street Calcutta, to attend the conference".

Report of the Super intendent of Police, Bankura dated 4/9/48

"Mrs. Bhakti Ghosh (the subject) a teacher of Kalitala Girls H.E. School, Bankura Town who has been served with a notice to leave the school for her prejudicised activities, asked Rama Guha, a student of the school and daughter of her husbands sister Uma Guha B.A. to draft a petition addressed to the school authorities, urging her (Bhakht's) retention in the school and getting the same signed by the girls of higher classes, with the threat that the students of the school might resort to strike unless their demand was conceded."

Report of Superintendent of Police, Bankura dated 23/10/48

"About 150 Bidi Workers, along with Bhakti Ghosh (the subject) and other C.P.I Workers of the town went in a procession to Bankura Railway Station on 19/10/48 to see of C.P.I. Security Prisoner Dr. Sudhangshu Mukherji who was being transferred from Bankura sub jail. They shouted communist slogans and left the station in a procession after the train started.

Intercepted Letter dated 17/1/49.

"A Circular letter (No. 3) written by Sja Nalini Basu, President, West Bengal M.A.R.S to Mrs. Bhakti Ghosh (the subject) was noticed. It asked the addressed

to furnish information relating to the programme taken by the District Samiti, number of active members and whether the members of Atma Raksha Samiti are regularly working among labourers, Krishaks, middle-class people and helping them during the harvesting period for their rights etc."

Police, Bankura - "Two letters, written by one Binode and addressed to priya Bandhu were produced by a gentleman of Narainpur union, P.S. Patrasayar, on 24/4/49, saying that he picked them up from a lonely village path on the Bank of Bodai river on 19/4/49. From the contents of the letters its appears that the writer Binode is no other than Sja Bhakti Ghosh (the subject) and the addressee is her husband, Uday Bhanu Ghosh (absconder). It is clear from the letter that she is a regular correspondence with her husband (C.P.I absconder) through special messengers and is keeping him informed of all important matters concerning the party as well as her activity with regard to propaganda and organisational work on the women front of the C.P.I.

a) One of the letters contains among other things: 1) How the writer enjoyed the film Anjan Garh which is full of scenes of revolution against Zamindars and King. The Scenes regarding the hard life of the abs conding workers reminded the writer of the present life of her husband and other party absconders.

2) The organisational work on the Women front is being carried on satisfactorily.

3) The Security Prisoners lodged in the Midnapore central jail would go on hunger strike from 8th instant.

4) Censorship has been imposed on Ghare Baire (the organ of the M.A.R.S.)

5) The writer will try to realise money for party work from among the relatives visiting her brother house on the occasion of the marriage ceremony of her niece.

b) The other letter contains the following information:

1) The writer realised Rs. 17/- from her newly married sister in law as subscription towards women fund.

2) The writer refers to the sufferings of hundreds of comrades and states that thousands had already sacrificed their lives and many more will do in future for the sake at party work but sufferings at comrades in her presence give her pain

and at the same time her mind burns for revenge against the Congress Govt. and makes her think how she will retaliate.

3) The writer started realising money for "one lakh fund" and had obtained some promises. She hopes good realisation during Gajan festival and wants to organise two women squad for the purpose. She has heard that good realisation is being made in factories and that Santals are being well organised.

4) In the concluding part of the letters, the writer refers to the arrest of some C.P.I. members of Bankura and Midnapore districts.

Her place was searched on 29/4/49 early morning and a large number of communist literature was seized from the room occupied by her.

She was arrested on 29/4/49 at Bankura U/S 30 (1) of the West Bengal Security Act and despatched to Midnapore central jail where from she has been committed to the Presidency jail, Calcutta.

16/5 /1949, Deputy Inspector General Police, Intelligence Branch, C.I.D. West Bengal.

Police File no. - 777/42

(6)

History Sheet of Priti Banerjee Sova Sarkar d/o late Narendra Nath Sarkar and W/O Ramen Banarji of Ghoramara, Rajshahi and of 267, upper Chitpore Rd., Calcutta (Born 1924)

Priti Banarji passed B.A. from the Rajshahi Colleges in 1943. She had been to Bombay for three yrs. for musical training. She is a Radio and film artist. An intercepted letter d/14-7-43 written by the Secy. Rajshahi Mahila Front to Miss Manikuntala Sen (CPI), now a detenu contains minutes of a meeting specially meant for the ladies which was organized by the defence committee and held at Rajshahi town hall. The meeting was presided over by Priti Sarkar.

In an intercepted letter d/24-9-43written by Ramen (Ramen Banerjee to Priti Sarkar the writer expressed that so long he had an idea that Priti would attend G.S.A (Girls Students Association) Working Committee meeting.

In an intercepted letter d/2-10-43 from Ramen Banerjee to Priti Banerjee C/O - Communist Party Office, Rajshahi, the writer informed the addresses about comrades Anupama and Snehadi and that he was leaving Calcutta for about two months.

Police File No. - 1195/42(1)

(7)

History Sheet of Srimati Bimala Majhi alias Mandal W/O Sri Anantadeb Majhi of Chapbasan, P.S. - Tamluk, Dist.- Midnapore.

(Born 1924 approximately)

Srimati Bimala Majhi and Mondal comes of a middle class peasant family and can read and write Bengali. She became widow at an early age and subsequently was married with Sri Anantadeb Manjhi (C.P.I absconder - now a detenu) and got two minor children. She used to work for the party (C.P.I) with her husband and the Party used to maintain them as her husband was a whole timer of the party.

The following information is on record against her before August 1947.

Her activities came to notice as early as April 1947 when she was taken as a member at the Executive Committee of the C.P.I in the annual party conference held at Kharagpur on 9.4.47 and 10.4.47 and was a prominent member at the district MARS.

Information after August 1947 Source No.129.1.48: Bimala Majhi reported to be the Secretary of Midnapore K.S. attended the District Krishak Samiti Conference (Bankura) held at Hadatrarayanpur, P.S. - Patrasayer, Dist.-Bankura on 20.1.48.

WCR. 7.2.48. - A Public meeting under the auspices at the C.P.I was held at Tamluk on 29.1.48 on the occasion of Biswa Nath Mukherji's visit. The meeting was attended by about 1,000 people. The following amongst others was prominent Bimala Maji.

Report of a D.I.B Officer 16.2.1948 Deben Das -Mudli (C.P.I. now a detenu - B.R. 5943), Bimala Majhi and others went to Bankura during the middle of January 1948 to attend a conference at Hadal narayanpur, P.S. - Patrasayer, Dist.- Bankura. They took with them the mike of the Midnapore Party Office.

W.C.R. 13.3.48 - At a meeting (250 including women) held on 9.3.48 at Rashmancha Maidan of Village Jatankur, P.S. - Tamluk. The C.P.I. Workers, Viz.-Bimala Manjhi and other delivered speeches advocating the abolition of Zamindari System without compensation and the need for remission of Govt. loans. A comittee of II members for the year 1948 was formed. It is reported that they will recruit young men and women of and above the age of 18 to oppose any policy of the Govt. that will go against the interest of the Kishans.

W.C.R. 3.4.48 - Bimala Majhi called on the Women folk to get ready to help their men folk in the struggle for livelihood. She asked women to fight united against the oppossion of the police when the question of their living is trampled upon.

Report of a D.I.B officer 3.4.48. - C.P.I. Commune at Tamluk town, which was occupied by Anantadeb Maji (C.P.I. now at detenu) and his wife Bimala Maji was searched on 26.3.48 and 118 items of Party literature, documents, leaf lets including one Exercise Book at Tamluk town Branch of the C.P.I. containing proceedings at Party meetings etc. were seized.

Source No. 2 (21.4.48) - There is a sub-divisional Committee of the Party with the following members in the Executive Committee Bimala Majhi.

Source No. 3 (12.5.48)- Bhupal Panda (C.P.I) absconding B.R. 6080) and another will move about in Nandigram area for secret propaganda among the Kishans and Saroj Roy (C.P.I absconding, B.R. 6098) with Rabi Mitra (C.P.I.B.R - 6059-now in jail) and Srimati Bimala Majhi at Garbeta area.

Source No. 4 (8.11.48) - On 30.10.48 at Secret meeting of the Party held at Bhekutia attended by Chitta Ranjan Giri (E.S.P), Rakhal Bag (C.P.I Since dead) and Bimala Majhi it was decided that a branch of the M.A.R.C should be organised immediately in Babukhan bar area, P.S.Nandigram to organise the females is resisting the police with broom strick and by throwing dust and saline water in the eyes of the Police. Bimala Manjhi has been requested to visit the area for the purpose.

Source No. 5 (12.3.49)- Bimala Manjhi with her son also came to Takapura (P.S. Nandigram) and put up in the house of Ramhari Sasmal (C.P.I). She organised a meeting at night during the 1st week of February, 1948 with the female folks and instructed the females to face any difficulty and not to hesitate to attack the police and to snatch away arrested persons from police custody.

Source No. 20 (24.3.49) - Bimala Majhi who is probably now concealing in the house of Patit Mal of Nilkantha is organising the Women of Tamluk, Panskura and Nandigram areas (Note-Acting on this secret information, the local police raided the house of Palit Mal at Nilkanthya, P.S. Tamluk on the night of 24.3.49 and arrested Bimala Majhi, an active and important organiser of the Mahila Atma Rakshya Samiti.Bimala Majhi is wanted in the Katagachhia Police firing case no. 4 dated 10.3.49 U/S/48/353/307 I.P.C. A book untitled "Communist O Congress" and a leaflet entitled "Hatyakanda O Daman Nitir Biruddhey Rukhe Darao" were recovered and seized from the house of Patit Mal).

Report of a D.I.B. Officer (11.5.48) - I had been to Midnapore Central Jail to interview U.TP Srimati Bimala Majhi. She decline to say anything even she refused to give out her identity saying that her name and address were known to police. What she has got to say she will speak to the Magistrate . She remarked .

Report a D.I.B Officer (6.6.49)- Bimala Majhi has no other occupation except

that she was an active member of the C.P.I and Mahila Atma R.S. at Tamluk Sub-division and she had no income there from.

I.B.No. 2251/C.S. (23.4.49) - Bimala Majhi should be arrested under the West Bengal Security Act and Committee to jail in case she is released or bailed out from the specific case, if there is sufficient materials against her for such detention.

From the above it will appear that Bimala is an important and active member of the Midnapore Executive Committee of the C.P.I. and was the organiser of the Mahila A.R.S. of Midnapur district. She with Deben Das Mudli (Since a detenu B.R. 5943) attended the Bankura Dist. Krishak Samiti Conference held at Hadalnarayanpur, P.S. Patrasayer, Dt. - Bankura on 20.1.48 and attended a Party meeting at Tamluk on 29.1.48 presided by C.P.I leader Biswanath Mukherjee.

On 9.3.48 she attended a party meeting at Jatankur, P.S. Tamluk and delivered specches advocating the abolition of Zamindari system without compensation and to oppose any Policy of the Govt. that will go against the interest of the Kishans.

At a party meeting held on 30.10.48 at Balkutia P.S. Nandigram, She was entrusted for organising the female members of Nandigram area under the M.A.R.S with a view to resist the police with broom sticks and by throwing dust and saline water in their eyes.

During the first week of February, 1949, she visited Takapura area, P.S. - Nandigram and organised a party meeting with the female folks and instructed the female folks to face any difficulty and not to hesitate to attack the police and snatch away the arrested persons from their custody. She remained absconding for a pretty long time in organising the women of Tamluk, Panskura and Nandigram areas and was arrested on 24.3.49 in the house of a party member who is still absconding she was also wanted in Kalagachhia Police Camp attack case of Panskura, P.S.(Vide CaseNo. 4 dated 10.3.49 U/S 148/353/307 I.P.C.) and is likely to be discharged from the case. She is undoubtedly an important and active C.P.I workers of a violent

type.

It is well known that the C.P.I which along with its volunteer organisation has been declared unlawful by Govt. undersection 16 of the India Criminal Law Amendment Act (Act XIV of 1908) aims seizing power by violent means and in pursuance of its object it has adopted a plan of organiser terrorism and violence and carrying on illegal activities to stir up lawlessness prejudicial to the maintenance of Public order.

In view of the facts stated above, the Superintendent of Police recommends that detention orders under section3 (1) (a) (11) of the preventive detention act. 1950 (Act iv of 1950) be issued in respect of Bimala Majhi.

D.C. Sen,
S.P.Mid,
12.6.50

(8)

A Brief Note of Manikuntala Sen

She is a leading female communist member.

In 1940 she with other leading C.P.I workers addressed the workers aof the Hukumchand Mills went on strike.

She was elected on member of the Bengal Provincial Committee of the C.P.I for 1947-48.

On 29.1.48 she with other C.P.I workers led about 1200 Women to Writers Buildings to protest against existing ration quota and on the assurance given by the premier that the ration cards would soon be restored. She remarked that they were not prepared to hear any excuse and that the Govt. which failed to feed their countrymen should resign. She attended the West Bengal Govt. Employees Convention held at Wellington square on 13.3.48 and made a speech bitterly attacking the West Bengal Govt. She also took a prominent part in the demonstration on 19.3.48 before Writers' Building in connection with the Bara - Kamalapur (Hoghly)Police firing . She was arrested on 26.3.48 IIB, Ferbroad, a report at the female member of the party.

2.4.48

Police File no. 619/36 Sd/- H.N. SIRCAR

Deputy Inspector General of Police

Intelligence Branch, C.I.D.

(9)

On 6.5.55 Mahila Sammelan (2000) was organised on the occassion of the conference with Nirmala Sanyal (MARS) in the Chair, Bimala Majhi, Jana Samanta, Kamala Maity, Manikuntala and the president addressed the gathering.

They dwelt on the alleged backward condition of the Women folk in India as compared with other countries and urged the female audience to agitate for various demands like of work for women, opening of maternity centres in villages, arrangements for education of children and illiterate women etc. On the next day 7.5. 55 a peace convention (1500) was held there with Shri Mrigen Bhattacharji M.L.A in the chair. The speakers urged the audience to collect mass signature on the peace forms and also to carry on agitation against the use of atomic weapons.

Police File No. 619/36

(10)

24.4.55 the West Bengal Fishremen conference (1,000) was held at Purba Satgachia, P.S. Kalna, with Ashu Barek in the Chair, Bagala Guha, Manikuntala Sen, Ananda Mukherjee, Ambika Chakraborty, Murari Goswami. The speakers criticised the allegepathy of the West Bengal Govt. towards the miserable condition of the fishermen including refuge fishermen. Resolutions demanding right of fishing in the rivers and canals free of taxes grant of gratuity and long term loan etc. were adopted in the meeting." The West Bengal Fishermen Committees was formed in the conference with Ashu Barek as President, Bagala Guha as Secretary and 180 as their members.

Police File No. 619/36

(11)

Dated 5.3.55 report C.P.I.

In reference to the call of the National Federation of Indian Women, West Bengal Committee, Women belonging to different walks of life, mostly women peasants and labourers, and representing various organisations collected at wellington square from 12 noon on 1.3.55 in batches and in processions, carrying their respective banners and festons. They usually shouted slogans demanding the stoppage of retrenchment of Women labourers in the Industrial concerns, further facilities of employment, equal wages with men act. At about 2 P.M. a meeting (1000) of women was held under the Presidentship of Sushama Sengupta, wherein the speakers spoke in support of their principal demands for employments and equal wages for equal work.

Police File No.: 619/36

(12)

Copy of telephone message dated 14.9.55 from A.S.I UpendraNath Banerji (South) and A.S.I Barin Bhattacharjee to D.S.(C) I.B.Cal.

A procession of about 600 strong including 50 ladies organised by the C.P.I was taken out from Wellington Square at about 17.35 it was led by Ambika Chakraborty, Suresh Ghosh, Manikuntala Sen and others. The procession reached before the gate of U.S. consul office of 5/1 Harington Street at about 18.25hrs. and staged a demonstration and shouted slogans namely "Down with American Imperialism'. Down with murderer of Indian Pilot and Chinese delegates etc. A deputation consisting of Gouresh Ghosh, Amika Chakraborty, Hemanta Ghosal, Manikuntala Sen and Niranjan sen waited upon the deputy consul of U.S.A. and a protest note against conspiracy mode. My U.S. and Chiang to spoil the ensuing the "Bundung" conference. After that they dispersed peacefully at 18.55 hrs. D/R will follow.

Police File No. 619/36 P.M. 12.9.55

Copy of a cyclostyled letter in English dated 30.6.55 in a Book post cover addressed to the Editor, *Swadhinata*, 33 Alimuddin Street, Calcutta -16,issued Hazra Begum, Anasuya, Gyanchand,National Federation of Indian Women, 10-B, Asaf Ali Road, New Delhi, Intercepted at Park Street, P.O.- on 13.7.55 bearing postal seal of issue New Delhi - Dated 11.7.55. National Federation of Indian Women.

10 B Asaf Ali Road, New Delhi - 1 dated 30.6.55.

Press Statement

The World Congress of Mothers which is to be held at Lausanee in Switzerland from 7th to 10th July 55 is being supported by various women's organisation from 67 countries. the Congress is being held to unitedly voice the opinion of all mother against the horrors of atomic war and the effects of the H. Bomb, and give an opportunity to women of various opinion to discuss the possibilities of a healthy happy future for their children in a peaceful world.

The preparatory committee of the Congress which has such eminent women as Madam Cotton, president of the Women's Internatinal Democratic Federation and President of the Union of French Women; Griesemann from the West German Women's Peace Committee, Mrs. Wahida Abon Ismail from Lebanon; Mrs. Fialho from Brazil, Mrs. Hiratsuka from Japan; Mrs. Rauso me Kuti from Nigeria, Mrs. Lily Wachter from Germany and Madam Tsao Meny Chuan of China - has received numerous messages of support and greetings from prominent people. Her Majesty the Queen of Belgium, Madam Joliot Curie, Madam Anna Segh ers, Madam Olga Lepe Ching Ling and Rajkumari Amrit Kaur have sent messages of greetings.

It is expected that 200 delegates from France, 100 from Italy, 150 from the German Federal Republic, 30 from Brazil, 20 from Great Britain, 20 from Japan etc. will attend the Congress.

The Indian delegation to the World Congressof Mothers Consisting of 40 delegates from 8 different states and representing more than 8 various Women's organisations will leave Delhi by a special charter plane on Sunday the 3rd July

1955. The delegation consists of writers, teachers, editors of Magazines, Singers and dancers. There is a member of Parliament, a member of the Legislative Assembly and an advocate besides too. Trade Unionists amongst the delegates. The delegation is expected to stay in Switzerland till the 10th July after which date the members are to tour various countries of Europe.

The National Federation of Indian Women which has sponsored the delegation has appealed to the World Congress of Mothers to support both the principles of Panch-shila and the Declaration of the Bandung Conference which have been contributory to the lessening of the International tension.

It is expected that the Indian delegation will attempt to draw the attention of the Congress to the eradication of hunger, ignorance, disease and poverty in the under developed countries of Asia and Africa. There is also a move by some delegates broach the idea of a Asian Women's Conference in the near future.

Following is the list of delegates attending the World Congress of Mothers:

Bombay : Naval Rele, Saralabai Deodhar, Krishnabai Koppikar, Akhita Shankar, Seeta Mukherjee, Anandibai Vijapura, Charulata Gokhale.

Delhi: Chitra Sen, Sheila Gujral, Sati Sen, Anasuya Gyanchand, Hajrah Begum.

Hyderabad : Jamalunissa Begum.

T-C : Annie Joseph, Annama Thomas

Maharashtra : Minakshibai Sen, Saraswatibai Kirloskar.

U.P. : Sadiga saran

Bengal: Brahma Kumar Roy, Aruna Munshi, Moitree Sen, Madhuri Ghosh, Bibha Sircar, Chitra Roy, Nandarani Banerjee, Lily Dutta, Mina Das Gupta, Bina Bhattacharya, Bhanu Das Gupta, Sushama Sen Gupta, Sabita Bose, Manikuntala Sen, Mukta Kumar, Geeta Ghosh, Amiya Ghosh, Usha Gupta, Asan Ganguly, Reba Roy Chowdhury, Kanak Mukherjee, Suruchi Sen Gupta.

Assam - Archana Sircar

SRC/30.8.55 Sd/ Hajrah Begum, Anusuya Gyanchand

Joint Secretaries

Police File No. 619/36

(14)

Report D.I.O Cooch Bihar 30.12.54

Manikuntala Sen accompained by Monoranjan Roy (CPI) made tours in the district from 16.9.59 to 23.9. 54 and held meetings at Coochbihar Dinahata and Tufanganj. After the meeting at Dinhata on 18.9.54 a group of persons including some Krishak Samity Worker (CP Sponsored) on their way back from the meeting fell upon a police party and rescued 5 persons arrested in connection with the passport Act. Case No.16 dt.- 18.9.59 u/s 147/379/224/ 225 I PC /II (3) W.B.S. Act was started at Dinhata P.S.

Subsequently on 10.12.54 a procession was taken out by the CPI at Dinhata Town on the occassion of the release of the said Krishak Samiti Workers on Bail.

The case has since been ended in Chargsheet against 23 persons.

Police File No. 619/36 — Dist. Int. Branch (CID)

Coochbehar the 6th Jan.55

(15)

Proceedings of the District Conference of the M.A.R.S Howrah held on the 8th and 9th October, 1955. Forward under S.P., D.I.B., Howrah's Memo No. 5208/91-47 R. 4058 dated 11.10.55 to S.S.I.B., W.B.

The 8th Annual conference of the Howrah Dist. M.A.R.S was held on the 8th and 9th October 1955, the delegates meeting was held on 8.10.55 in the 'Atchala' of Suresh Bhattacharji of Sardarpara, Mashila, P.S. - Sankrail and the open meeting was held on 9.10.55 at Anandamoyee maidan, Dakshinpara Andul, P.S. Sankrail.

Sm. Pankaja Acharji of Calcutta was the chief guest in the closed session on 8.10. 55. This session was presided over by a Presidium consisting of Sm. Pankaja Acharji, Sm. Sailaja De and Sm. Suruchi Debi. On 8.10.55 the delegates session was held from about 4 p.m. and floral wrealth were placed on the Martyr's Memorial. Sixty one delegates including 15 fraternal delegates attended the conference from Sankrail, Bagnan, Domjur, Shibpur, Madhya Howrah and Salkia areas. Discussion were held on the following subjects and various resolutions were moved and passed after deliberations.

i) **Taxation-** Discussions were held on various taxations of the Govt., Particularly on the essential commodities which require in the day-to-day life of every family. According to the conference this taxation ultimately tells upon the woman folk who usually run the household affairs. It was resolved to resist this heavy taxation of the Govt. on the essential commodities.

ii) **Land Reforms Bill** - It was stated that the majority of the members of the MARS belong to the Krishakfamilies and such the Land Reforms Bill would effect them most. Govt. gave out that after the abolition of the zamindary system and cultivators would get land of their own but now it is seen that the chasis would get very little benefit out of this. They condemned the Land Reform Bill and demanded free distribution of land among the tillers.

iii) P.D. and Security acts - The extension of the life of the P. Dand Security Acts was condemned and abolition of these two 'Kala Kanun' was demanded.

iv) Peace - The necessity of 'peace' was stressed. If a war breakout the women-folk will suffer most. Their husbands, brothers and sons would be drafted forward Many of them would be killed. As such every woman should take particular interest for the peace movement.

v) Women unemployment - Alarming unemployment of rural women folk was discussed and it was urged upon the Govt. for establishment of various cottage industries to ameliorate the conditions of women.

vi) Adult Women Education and Child Welfare- Necessity of adult women eduction was stressed. They are the mothers and would be mothers who are to impart the first training to the children of the country. Regarding child welfare it was stated that this matter is most neglected in this country in comparison with other foreign countries. Govt. was urged upon to look into the matter immediately.

vii) Maternity- Insufficiency of maternity homes hospitals etc. was discussed. Particularly in rural areas there is no proper arrangement for maternity homes. Govt. should be moved for establishment of a good number of maternity home and hospitals in every locality.

Finally it was resolved to recruit new members to the MARS . So that by the coming year the membership may stand at 5000. A new Executive Body of the Dist. MARS was formed with 19 members with the following on the president, Vice-president and the Secretary :

President - Sm Saillaja De.

Vice-president - Sm. Suruchi Deb.

Secretary - Sm. Sachi Rani Biswas.

The open session was held on 9.10.55 at Anandamoyee Maidan, Andul Dakshinpara, from 17.30 to 19.30 hours. with Sm. Sailaja De. in chair. After the election of the President, the conference started with the usual song and then Sm Manikuntala Sen M.L.A .,the chief Guest , was garlanded.

Sm. Sachi Rani Biswas, the incoming Secretary, read out the proceedings of the delegates meeting and placed the resolutions passed in that meeting.

Manikuntala sen was the main speaker. She announced that the 13th session of the provincial MARS would be held very soon. She narrated the circumstances under which the MARS was formed and also described its history stage by stage. She also spoke on the condition of the Women in other European countries and particularly compared with those of Red China. In comparison with those countries she stated that the conditions of the women are deplorable. She also spoke on women education and child welfare, establishment of maternity homes, employment for the women-folk etc.

The President Sm Sailaja De thanked all for their co-opertion in making the conference a success. She urged alll classes of women to unite and to come under the banner of the MARS with a view to mitigating the sufferings of the women folk,. About 100 women including childred attended the open meeting.

EBD

26.11.55

From the CR. dated 4.7.55 regarding secret duty at Dumdum Airport.

The following women, delegates of world Mother congress left Dumdum Airport for Delhi by a special at about 9.50 hours on 3.7.55 hrs.

a) Mrs. Manikuntala Sen

b) Mrs. Chitra Roy

c) Mrs. Aruna munshi.

d) Mrs. Geeta Ghosh

e) Mrs. Sushama Sen Gupta

f) Mrs. Lely Datta.

g)Mrs. Moitree Sen

h) Usha Gupta

i) Madhuri Ghosh

j) Usha Gupta

k) Madhuri Ghosh

l) Asha Ganguly

m) Amiya Ghosh

n) Mukti Kumar

o) Sabita Bose

p) Bhanu Das Gupta

q) Amiya Bhowmick

r) Reba Roy Chowdhury

s) Bina Bhattacharjee

t) Anima Das Gupta

u) Nanda Rani Banerji

v) Arati Bose

w) Archana Sarkar

x) Suruchi Sen Gupta

Hooghly - on 22. 5. 55- The Third Annual Conference (200) of the Konnagar MARS (CPI) was held at Kalitala near the Refugee camp., Konnagar, P.S. Uttarpara

with Sm Gita Mukherjee in the chair, Sm Manikuntala Sen was the chief guest. Sm Dolly Basu presented the income and expenditure of the Konnagar unit of the Samiti for the year 1954-55 and the work done by the unit during the same year Manikuntala in course of her speech stressed on the collection of signature against the use of atom bombs and urged the women to exert themselves for strengthening the party for the achievement of their rights.

Police File No. - 619/36

(18)

A short note on Geeta Banerjee nee Mitra nee Mukherjee, daughter of Durgananda Banerjee of Shionibash, Majdia, District- Nadia, and of 104/1E, Lake Road, Calcutta.

Geeta Mukherjee (24) is an important member of the C.P.I. She is the ex-wife of Dhruba Mitra of 22B, Southern Avenue and is now married to shobha Mukherjee (E.D. C.P.I)

She first came to notice as a member of the B.P.S.F. Later on she identified herself with the B.P.I. In 1943 or there about, she was reported to have gone to her sister at Mandalaya after resinging her membership and married Dhruba Mitra. After this, she rejoined the party and became active in the affairs of the B.P.I Women's Committee. In 1946 she became prominent in the C.P.I front and took an active part in the agitation against the All India Radio Station Officials.In 1947 she was sent to Europe by the A.I. Student Federation to represent the Indian youth Movement there and visited Hungery, Rusia, China, France, Italy, Germany, Britain, Czechoslovakia and the U.S.A. In 1948, she represented the Bengal Women's self Defence League in the Women's International Democratic Federation and was later on elected a member of the Secretariat of the W.I.D.F. She returned to India in August, 1951 and married Subhas Mukherjee, the Editor at the 'Parichay' (CPI - Monthly) . In september, 1951, she attended the P.O.C Conference of the Party and in November, was entrusted with the work of organising the youth movement . She moved in different industrial areas in Calcutta and Howrah in that connection. In December,

1951, she was selected as one of the organisers of the C.P.I sponsored Yuba Sangha for the organising the unemployed youths of different localities under party influence. In 1952, she was elected one of the members of the youth sub-comittee of the party and vice-president of the "Kishore Bahini" the youth front of the party. The same year, she took keen interest in organising the National Conference is defence at the Children held in March in Calcutta and was included in the sponsoring committee for the conference as its General Secretary. During the year, she also attended a number of meetings including the All India Peace Conference. In May, that year she shifted to Budge Budge in connection with the organising affairs, of the MARS. In August, she was selected to attend the Peking Conference. In Februry 1953, she attended the Anti unemployment and anti retrechment convention where in speakers exhorted the workers to stand united against retrenchment and unemployment and criticised Govt. for endeavouring to create a division among the workers by backing up the "dalal" unions. The following month, she attended a condolence meeting on Stalin's death and also took part in a cultural function which depicted Sri Nehru and others personalities as disciples of Lord Mountbatten and urged the workers and peasants to launch as concentrated struggle to uproot the evils. In December, she was elected a delegate to attend the West Bengal, P.C. Conference of the C.P.I. In January, 1954 she was reported to be organising striped in seven jute mills of Budge Budge as a protest against the lockout of the Albion Jute Mills and alleged highhandedness of the mill authorities. In June, she attended the delegates session of the National Congress of Women where in resolutions were passed urging Govt. to open maternity centres on the basis of one per 10,000 Women to grant 3 months maternity leave with full pay, to open milk distributing centres, criticising the Govt. for its indifference towards the high death rate among children and women during delivery etc. In September, she was nominated by the party to contest the ensuing Municipal elections in Budge Budge.

Police File No. -3890/49(P) SG/ 26.4.56

(19)

Midnapore District Confidential Report (2.4.54)

Delegates session of Mid. Dist.-MARS conference was held at Tamluk from 30.3.54 evening to 31.3.54 morning, attended by about 100 Women including delegates and visitors with Bela Lahiri, Secretary of W.B. MARS, in the chair. On 31.3.54 after-noon the open conference was held at Tamluk, with Bela Lahiri in the chair. About 400 people including 200 Women attended the conference, addressed by Gita Mukharjee W/O Biswanath Mukherjee and Asha Ghosh, Asstt. Secretary of Dist. MARS. The speakers demanded employment for women nursing home in each and every union and legislation against eviction of Bargadars by the Jotdars, Gita Mukherjee urged the people to continue their struggle against the Govt. in order to establish a people's Roy by removing the reactionary congress Govt.

Police File No. 3890/49

(20)

Week ending Report D.I.B Hooghly (2.4.54)

A.D.I.O reports on 2.4.54 that the Fourth Annual Conference of the Hooghly Dist. MARS was held on 27th and 28th March at Chinsura. The Delegates session was held on 27.3.54 in the office of the MARS at Antar Bagan, P.S. Chinsura.

The open session attended by about 300 people, mostly women was held on 28.3.54 at Daspara Maidan with Kamal Rani Basu of Calcutta in the chair. The meeting was addressed by the following :

1) Mani Kuntala Sen

2) Sandhya Chaterjee

3) Mukta Kumar W/O - Doyal Kr. at Buroshibtala P.S. Chinsura.

4) Parul Roy Chowdhury of Baidyabati, P.S. Serampur

5) Sm. Dakshabala Dasi, reported to be of Bhadreswar.

The speakers in brief while demanding equal status in social and political spheres called upon the women to organise and fight for their rightful places in education, employment etc. They further discussed the prevalent economic dis-

tress and pleaded for the removal of the Govt. Finally, while criticising Pak-U.S.A. military pact they demanded world peace. It was announced that the following were selected as delegates of this district to the coming provincial MARS conference.

1) Sm. Maya Chatarjee W/O - Late Bisweswar at Antarbagan, P.S. - Chinsura

2) Sm Sandhya Chaterji

3) Mukta Kumar

4) Sm. Parul Roy Choudhury.

5) Daksha Bala Dasi

Police File No. 1340-43

(21)

Hooghly Week ending Report D.I.B (26.3.54)

ADIO - reports on 22.3.54 that a meeting under the auspices of the local MARS (CPI) was held at Telinipara (Manasatala) , P.S.-Bhadreswar on 21.3.54 with Kanak Mukherjee at Chandernagore in the chair and Sushila Guha Roy (CPI) at Telinipara. P.S. Bhadreswar, Sandhya Chaterjee at Chandernagore, Gita Bhattacharjii Mukherjee wife of Durga Bhattacharjee of Bhadreswar as speakers. The meeting was attended by about 100 people including party workers and female workers of Victoria and Gondal Para Jute Mills.

The speakers and the president delivered lectures about the difficulties of the female workers of different Jute mills and requested them to unite together and fight for education of their children and better treatment from the management. The Govt. was criticised as usual.

Police File No.1340-43 SG/6.4.54

(22)

Usha Rani Chakrabartti
D/O- The late Sushil Chandra
of Chatra, Serampore, Hooghly,
and Wife of Sri Bihari Lal
Chakrabartti of Chhotobazar, Mid. Town, dt.Mid.

A Brief Note of Usha Chakraborty arrested on 26.3.48, Born-1911

Her connection with the activities of the C.P.I in Mid dist. first came to notice towards the latter part of 1944 prior to which she was a communist worker in Hooghly district. She was a prominent worker of the MARS, an organisation of the CPI and she started several female weaving centres in rural areas of Mid dist. towards the latter part of 1945. She carried on party work among the female by way of propaganda in favour of the upliftment of the general condition of the women folk.She was considered to be an important organised of the party in Mid. dist. and she maintained connection with leading fanale communist members in Calcutta. About this time she became the Secretary of Mid.dist. MARS and worked whole heartedly to activise the women workers of the party, extending her influence over the girls at several female institutions at the dist. She also interested herself in the organisation of different labour unions of the party. In April 1947 she was taken in as a member of the D.C. and was placed in charge of the MARS. The same year, she organised several meetings to carry on an agitation for the abolition of Zamindari system and fomented for holding a general strike of the scavengers and sweepers in Mid.town.

She also toured in the rural areas for re-organising Kisan units and organised meetings as a protest against passing of the security Bill. In February 1948 she attended party meetings at which the members discussed the formation of "Red onward " organisation in the dist. abolition of Zamindari system, collection of funds for the party congress and the important matters. During the search of her place many communist literatures, a set of loud speakers and other articles were seized . Police File No. - 789/(46)

Detenu Srimati Bimala Majhi has already handed over her four year oldchild "Bulu" to her Sister in Law with the approval of the District Magistrate, Midnapore on 28.7.50.

On First admission to this jail on 26.3.49 her height was 92Lbs- she is 5ft. 3 inches in height. She was admitted to jail hospital on 1.7.50 for anaemia and colitis and was cured and discharged on 29.7.50.

Her nine months old baby has also been suffering from respected attacks of Enterocolitis for about two months, she is better now.

Police file No. 1628/49

Sd/ P.S. Bhattacharjee
9.5.50
C.Sand M.O. Midnapur Central Jail
Midnapur

চিঠি

(১)

Dear Friend,

Thanks very much for your kind invitation to me to preside at the fourth annual conference of All-Bengal-Mahila Atma Raksha Samity.

I am of afraid it would not be convenient to me to undertake a journey to Calcutta from Bombay in the month of June, as I am travelling to that side again in July, to attend the A.I.W.C Standing Committee meeting being held in Patna on the 30th and 31st July. Any date hence later than 15th July would be suitable to me. I do not think it would be convenient to you to hold your proposed conference after 15th July. I would hence request you to excuse me . I express my inability to accept your proposal.

With best regards,
yours sincerely
Sd. Shanta Mukherjee

Submitted
14.5.48
Police File No. 240/46

(২)

Copy of a typed letter in Eng. dated 8 July 52 intercepted at Boubazar Po. on 14 July 52 bearing a Postal Seal of issue illegible.
From : Trade Union International of Agricultural & Forestry Workers.

To- Mrs. Shanta Mukherjee Bengal Provincial Trade Union Congress.
249 Bowbazar Street
Calcutta
No.-596 8th July - 1952

Dear Comrade,

In a letter of 9th March, 1952 the Bengal Provincial Committee of the AITUC communicated to us that, owing to your absence from Calcutta, they could not supply us with the news concerning social insurance in the sector of agricultural workers, and ensured us that we shall receive these news immediately after

your return.

In April I had the pleasure of meeting with you in Vienna and received many interesting news during the discussion in which we examined the possibilities of holding a conference of the agricultural workers of the Asian Countries.

In that occasion you promised to give us all your help in establishing close contacts with the agricultural workers' organisations of India.

Today, remembering your promise, I decided to write to you considering that we did not succeed in other ways to establish close contacts with the Indian Organisations.

Although the Asian Conference has been postponed for the moment, I here still remains the hard work of preparing our International Conference in which the Indian agricultural workers' delegates cannot and should not fail.

The preparation of the report by the Secretariat, the studying of the living and working conditions, the examination of the fights carried on by agricultural workers of whole the world, the preparation of a programme of demands and the research of the most suitable forms of organisation require a close collaboration between us and the various national organisations.

This collaboration will be impossible if the contacts between our union and the national organisations do not exist or are weak.

We are enclosing here copy of two letters sent by us and ask you to take an interest in the question in order that we can receive their reply.

We are counting on your concern in establishing contacts with the other organisations of the Indian agricultural workers. We would be very grateful to you if you may send us some addresses for your press.

With our best wishes for your work.

Yours Fraternally

Sd/ - R. Vidimari

Secretarial of the T.U.I.A.F.W.

Police File No.- 240/46

Police File No. 240/46

(৩)

For D.C.S (Mid.)

কমরেড,

আমার খড়্গাপুরে থাকিয়া সম্প্রতি মেয়েদের মধ্যে রেল ধর্মঘটের প্রচার আন্দোলন কাজের সংবাদ নিশ্চয়ই পাইয়া থাকিবেন। এখানকার রেল কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা পরামর্শ ক্রমেই আমার কার্য্যক্রম স্থির করিয়া লইতেছি। এ বিষয়ে বিস্তৃত রিপোর্ট এখানে অবস্থিত D.C.M দের নিকট হইতেই পাইবেন।

গত ১৬ই তারিখে পুরাগ্রেনশপ, অথবা ৬০টাকা খাগনী এবং কোয়াটারের দাবীতে রেলশ্রমিক পরিবারস্থ মেয়েদের একটা মিছিল কারখানা গেটে CME র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যায়। CME দেখা করে না। সামনের গেটে তালা লাগায় ও পেছনের গেট দিয়া চলিয়া যায়। পুলিশও ডাকে। CME র সঙ্গে মেয়েরা দেখা করিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের এই মিছিল কারখানা মজুরদের মধ্যে তো বটেই সমস্ত খড়্গাপুরেই যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। মেয়েরা গেটে এবং ওভারব্রিজের উপরে দাঁড়াইয়া হাজার হাজার মজুরদের সামনে দাবী সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সকলেই সমর্থন করেন। দালালরাও বিরুদ্ধে বলিতে সাহস করে নাই। Slogans প্রভৃতিতে প্রচার বেশ ভালই হয় এবং CME এর দেখা না করা, তালা দেওয়া পুলিশ ডাকা প্রভৃতি ঘটনা সারা শহরেই যথেষ্ট বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। সাময়িকভাবে হইলেও কারখানার মজুরদের মধ্যে দুর্বলতা কাটাইয়া কিছুটা সংগ্রামী মনোভাব জানাইতে সমর্থ হয়।

এই অভিযান পরপর আরও মিছিল শোভাযাত্রার প্রোগ্রাম লইয়া আগাইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু ১৯শে তারিখের ব্যাপক গ্রেপ্তারে মেয়েরা আপাতত খানিকটা ভয় খাইয়া গিয়াছে। আশা হয় আবার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই চাঙ্গা হইয়া উঠিবে। আমার এখানে কাজ করিবার পক্ষে সব থেকে বেশী অসুবিধা হইল এখানে মেয়েদের মধ্যে পার্টি ক্যাডার নাই একজনও। কারখানার কুলি মেয়েদের মধ্যে আগেকার লড়াইয়ের ইতিহাস আছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও আমাদের কোন Contact নাই। অন্যান্য শ্রমিক পরিবারে বৌ মেয়েরা তো ইতিপূর্বেই কোন লড়াই আন্দোলন বা সাধারণ মহিলা সমিতির কোন প্রগতিমূলক কাজও করে নাই। সেইহেতু এদের মধ্যেও কোন পার্টি ভিত্তি নাই। ফলে আমাকে একলাই Squad করা হইতে আরম্ভ করিয়া সব কাজই করিতে হয় — একজনও helping hand না থাকার ফলে কাজও ঢিলে পরে। তাছাড়া মুসিকল (মুশকিল আমার ধারণা অনুযায়ী) হইতেছে d u g লোকের পক্ষে বেশীদিন এভাবে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা চালানো সম্ভব হয় না। আরো দুই চারজনের একটা গ্রুপ থাকিলে পেছন হইতে কাজ করানো সুবিধা হইত। এখানে দিন দশেকের এই প্রকাশ্য ঘোরাফেরা এবং অভিযান পরিচালনার জন্য গ্রেপ্তারী লিস্ট এ আমার এখানকার নামটাও উঠিয়া গিয়াছে। অগত্যা দিনের বেলা চলাফেরা আপাতত বন্ধ। রাত্রে মেয়েদের মধ্যে বেশীক্ষণ কাজ করার সুবিধা নাই। ফলে খুবই মুসিকলে পড়িয়াছি।

এই কারণে ডি.সি-র নিকট রেলধর্মঘটের কাজে আমি এই জিলা হইতেই আরো একজন মহিলা কমরেডকে পাঠাইবার জন্য বিশেষভাবে জানাইতেছি। কলিকাতা হইতে এখানে আর লোক পাঠানো সম্ভব নয়। সেখান হইতে ইতিমধ্যেই ৫/৭জনকে বিভিন্ন রেল এলাকায় পাঠানো হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ এখানে আমার আসিবার পর কলিকাতা হইতে আরো লোক আনিবার প্রস্তাবের যুক্তিও নাই। তাছাড়া, বাহিরের মেয়ে বেশী আনাইয়া এখানে রাখিবার জায়গাও বিশেষ নাই। সুতরাং সবদিক হইতেই জিলার ক্যাডার কিছু কিছু এদিকে যুক্ত করিয়া লওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং যুক্তিযুক্ত। এই জিলার মেয়ে কমরেডরা অধিকাংশই কৃষক এলাকায় ভাল কাজ করিতেছেন জানিলাম। ধানকাটার সময় সরিয়া গিয়াছে। এখনকার সংগ্রাম কিছু দীর্ঘ প্রোগ্রাম লইয়াই চলিবে। এই অবস্থায় সমূহ এবং সর্বাধিক জরুরী ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত এলাকা হইতেও দু একজন কমরেডকে পাঠানো উচিত মনে করি। রেলধর্মঘটের জরুরীত্ব এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে আমার বিশেষ লেখা বাহুল্য মনে করি। এখানে আসিয়া মনে হইতেছে এবং কমরেডরাও বলিতেছেন কিষাণ এলাকার মতোই এখানেও মেয়েদেরকে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ অগ্রবর্তীর অংশই গ্রহণ করিতে হইবে। পুলিশ হামলায় ছেলেদের মধ্যে Mass meeting করা বন্ধ হইয়াছে। এই Mass meeting করাইতে হইবে মেয়েদের দিয়াই। বন্দীমুক্তির দাবী তুলিতে আগে বাহির হইয়া আসিবে মেয়েরাই, পুলিশের সাক্ষাত মোকাবিলা করিবার জন্য সামনে দাঁড়াইতে হইবে মেয়েদেরকেই। রেল ধর্মঘটে মেয়েদের এতখানি ভূমিকা লইতে হইবে এ বিষয়ে স্থানীয় বা জিলা কমরেডগণ কেহই পূর্বে খেয়াল করেন নাই। শেষ সময়ে খেয়াল হইবার পরেও কলিকাতা হইতে একজনকে আনাইয়া থ্রো করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেও ভুল হইবে। এ বিষয়ে জিলার সাধ্যানুযায়ী সঙ্গতিকে কাজে লাগাইতেই হইবে।

এই প্রয়োজনবোধে আমি প্রস্তাব করি কমরেড আশাকে অবিলম্বে আপনারা এখানে পাঠাইয়া দিন। কেউ তাঁহার আত্মীয় এখানে রেলেই কাজ করেন। তাঁর পক্ষে এখানে থাকারও অসুবিধা নাই, রেলশ্রমিক পরিবারস্থ মেয়ে হিসাবে কাজ করিতেও অসুবিধা হইবে না। তাহার এখানকার মেয়েদের সঙ্গে জানা পরিচয় না থাকিলেও অসুবিধা হইবে না। যতটুকু আওতা এরই মধ্যে পাওয়া গিয়াছে তাহারই মধ্যে থাকিয়া সে কাজ করিতে পারিবে। ওকে পাঠাবার কথা লিখিতেই আমার দেরী হইয়া গেল যথেষ্ট। এরপর নানা কমিটির মতামত লইয়া তাহাকে পাঠাইতে যদি আপনাদেরও দেরী হয় তো পাঠাইয়াও কোন উপকার হইবে না। আর মাত্র কয়েকদিন বাকি ধর্মঘটের। সুতরাং আমি আশা করি যদি DCS আশাকে পাঠানোর প্রয়োজন সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন তবে অবিলম্বে গ্রাম হইতে তাহাকে আনিয়া এখানে পাঠাইয়া দিবেন। এ বিষয়ে দেরী করিবার অর্থ হইবে রেলধর্মঘটের মেয়েদের যথাযোগ্য অংশগ্রহণের কাজে সাহায্য না করা।

এখানে সম্প্রতি রেল ধর্মঘটের কাজে যুক্ত থাকিলে জিলার মহিলা ফ্রন্ট সম্পর্কেও আমি পুরা খবর সংবাদ জানিবার জন্য ব্যস্ত আছি। জিলার মহিলা সভ্যা কজন এবং কে কে কোথায় কিভাবে কাজ করিতেছেন সমস্তই জানা প্রয়োজন। পি.সি হইতে মহিলা ফ্রন্টকে বর্তমান পার্টি কার্যক্রম অনুযায়ী সম্পূর্ণ নূতনভাবে ঢালিয়া সাজাইবার চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতার মহিলা সভ্যারা

এই অনুযায়ী অধিকাংশই শ্রমিক মেয়ে ও শ্রমিক পরিবারস্থ মেয়েদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। জিলাতেও অনেক জায়গায় কমরেডদেরকে সম্পূর্ণ কিষাণ আন্দোলনে প্রয়োগ করা হইতেছে। এ বিষয়ে পি.সি হইতে শীঘ্রই একটা ছাপান বুলেটিন পাঠানো হইতেছে। মেদিনীপুরের মহিলা কমরেডগণ অধিকাংশই বরাবর কৃষক এলাকায় কাজ করিয়াছে এবং সেখানেই তাহারা এখনও কাজ করিতেছেন। যাহারা শহরে, ইস্কুলে প্রভৃতি গঠনমূলক কাজে এতকাল জড়িত ছিলেন তাহাদের সম্পর্কে জিলা হইতে নূতন কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল কিনা জানিতে চাই। এই সম্পর্কে কমরেড উষা চক্রবর্তী বর্তমানে কিভাবে কাজ করিতেছেন জানিতে ইচছা করি। জেল হইতে বাহির হইবার কিছুকাল পরে কনভেনশন সময়ে তাহার সহিত আমার দেখা হয়। কমরেড সুখেন আমাকে লেখেন তিনি (উষাদি) কি কাজকর্ম করিবেন সেই বিষয়ে আলাপ করিতে। উষাদির নিকট হইতে জানিতে পারি শ্রীরামপুরে মায়ের বাড়িতে অনবরত পুলিশ Watch -এ তাহাকে থাকিতে হইতেছে। ওখানে থাকিয়া তাহার পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় আমি তাহাকে বলি নিজের জেলাতেই গ্রামে ফিরিয়া যাইতে। যদি কোন tect উদ্দেশ্যে DC-র নির্দেশে শ্রীরামপুরে ওভাবে থাকিতে হয় তবে আলাদা কথা। নয়তো আমার ধারণায় এরকম একজন কমরেডকে অনির্দিষ্টকাল বিনা কাজে ফেলিয়া রাখা সবদিক হইতে ক্ষতিকারক। উষাদি restriction -এর কথা বলেন। জবাবে আমার মত আমি জানাই। Restriction এর নিয়ম মানিয়া প্রকাশ্যভাবে কিছু কাজকর্ম করা সম্ভব হইলেই মাত্র Restriction মানিয়া চলার অর্থ হয়। নতুবা কর্মহীন হইয়া Restriction এর খাতিরে Restriction মানিবার কোন হেতু নাই। এ অবস্থা ঘটিলে আমার মতে গ্রামে কিষাণ এলাকায় চলিয়া যাওয়াই একমাত্র উপায়। এ বিষয়ে Finally DC র সঙ্গে আলাপ করিয়াই সিদ্ধান্ত লইবার পরামর্শ তাহাকে আমি দেই। তিনি মেদিনীপুরের স্কুলের কথা জিজ্ঞাসা করেন। সে সম্পর্কেও মহিলা ফ্রন্টের কাজ সম্পর্কে বর্তমান পার্টি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমার মতামত তাহাকে আমি জানাই। স্কুলকে ভিত্তি করিয়া মেদিনীপুরে অদূর ভবিষ্যতে মহিলাদের মধ্যে কোন গণ আন্দোলন গড়িয়া ওঠার সম্ভাবনা নাই। তাছাড়া ঐ স্কুল বাড়ি পার্টি। এটা পার্টি অফিসের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত হইয়া পুলিশের কাছে প্রকাশ্য হইয়া গিয়াছে যে উহাকে ভিত্তি কোন tech কাজ করাও সম্ভব বা সমীচিন নয়। এ অবস্থায় স্কুলের জন্য দু তিনজন কমরেডকে আটকাইয়া রাখা শুধু অর্থহীনই নয় উক্ত কমরেডদের পক্ষেও ক্ষতিকারক হইবে। ঐ স্কুল যদি Non-party teacher দের পক্ষে এত বৎসর পরেও এখন বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব না হয় তো আমাদের তরফ হইতে উহাকেই বাঁচাইয়া রাখার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করাও প্রয়োজন নাই। সুতরাং আমার মতে স্কুলের কাজে নিযুক্ত কমরেডদের গ্রামে কিষাণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করাই উচিৎ। উষাদিও আমার এই মতে রাজি হইবেন এবং জিলার সহিত আলাপ করিবেন জানাইলেন। তাহার পরে কি ব্যবস্থা হইল আর জানিতে পারি নাই। এখানে আসিয়া শুনিলাম আশা গ্রামে ভাল কাজ করিতেছে। উষাদি শ্রীরামপুরেই আছেন। কলিকাতা থাকিতে কমরেড "মধুর" নিকট হইতে আমি একখানি Slip পাই। তাহাতে উষাদি Under Restriction একথা জানিয়াও আমি তাহাকে Convention যোগ দিতে বলিয়াছিলাম কিনা, বিধবার

পোষাকে পুলিশের চোখ এড়াবার চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলাম কিনা ইত্যাদি ধরনের কয়েকটা প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠানো হয়—ইহার যথাযথ উত্তর আমি সঙ্গে সঙ্গেই পাঠাইয়া দিই। প্রশ্নগুলি গুরুতর নহে কিন্তু হঠাৎ ইহাই এনকোয়ারির বিষয় হইল কিনা ভাবিয়া কিছুটা আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম।

এখানে আসিয়া দুজন DC কমরেডের কাছে ঊষাদির খবর জানিতে চাই। তিনি খড়্গপুরে আগে মাঝে মাঝে আসিতেন কাজ করিতেন। এখন যদি তাহাকে এখানে পাই তো কাজের সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়াই তাহার কথা আমি বারে বারে জানিতে চাই। কিন্তু কমরেডরা শুধু এটুকুই জানান তিনি আসতে পারিবেন না এবং শ্রীরামপুরে আছেন। ইহার কারণ কি? এ সময়েও তাহাকে কাজে পাওয়া যাইবে না কেন অথবা তিনি DC নির্দেশেই শ্রীরামপুরে কোন কাজে নিযুক্ত আছেন কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন আমার পক্ষে করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু করিয়াও কোন সদুত্তর পাই নাই। কমরেড "মধুর" এবং ঊষাদির বর্তমানে কাজের বাইরে থাকা এই দুই ব্যাপারেই আমার কাছে কিছুটা আশ্চর্যজনক মনে হয়। এই কারণেই বিষয়টি বিস্তৃত করিয়া আপনাকে লিখিলাম যদি কোন অসুবিধা না থাকে তো আমাকে জানাইবেন তাহার কাজ সম্পর্কে আপনাদের সিদ্ধান্ত কি?

আরও একটু বিষয় সম্পর্কে লেখা প্রয়োজন মনে করি। কলিকাতা থাকিতে খবর পাই এই জেলায় গ্রাম এলাকায় কৃষক মেয়েরা K.S. এর অন্তর্ভুক্ত হইবে অথবা ARS অন্তর্ভুক্ত হইবে ইহা লইয়া কিছুটা Confusion এ সম্পর্কে P.C. বুলেটিনে নির্দেশ থাকিবে। মৌখিক আলোচনায় করিতে পারিলেই ভাল হইত। কমরেড মাইতির সঙ্গে কিছুটা আলোচনা হইল। তিনিও বলিতে পারিবেন আশা করি। যথাসম্ভব এই সাংগঠনিক প্রশ্নের জবাব লিখিয়া ও জানাইতেছে।

বিষয়টা দেখিতে হইবে প্রথমে আন্দোলনের দিক হইতেই। তবেই, সাংগঠনিক রূপ পরিষ্কার হইবে। মনে রাখিতে হইবে ব্যাপক মহিলা আন্দোলনের মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, শ্রমিক পরিবারস্থ মেয়েরা এবং এই অংশের পরিবারস্থ মেয়েরাই আসিবে। ইহাদেরই রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ধনতান্ত্রিক শোষণ কবলে সর্বাপেক্ষা সঙ্কুচিত। এই অধিকার লাভের জন্য শ্রমিক, কৃষক ও গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বর্তমান গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রত্যেকটার সঙ্গে এই হেতু মেয়েদেরও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রহিয়াছে। কৃষকের গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের মধ্যে কৃষক মেয়ের মুক্তি নিহিত আছে। সুতরাং কৃষাণ লড়াইতে কৃষক মেয়েরা অগ্রণীয় অংশ নেবার চেষ্টা করিবেই এবং করিতেছেও। তখনই নিজ নিজ শ্রেণী সংগ্রামে শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত মেয়েরা আগাইয়া আসিবে। সুতরাং শ্রেণীর মেয়েদের লড়াইয়ের জন্য সেই সেই শ্রেণীর দাবিও সংগঠনই হইবে উপযুক্ত দাবী ও T.U.এর এই হিসাবে কিষাণ মেয়েরা অবশ্যই K.S. সভ্য হইবে। শ্রমিক মেয়েরা অবশ্যই T.U. সভ্য হইবে। K.S. ও T.U -র প্রোগ্রাম লইয়াই তাহাদের আন্দোলন চলিবে। কিন্তু সংগঠনের দিক হইতে শুধুমাত্র K.S. ও T.U. কেই একমাত্র করিয়া রাখিলে ব্যাপকভাবে মেয়েদের সাংগঠনিক সংযোগ বাধ্য হইয়াই সঙ্কুচিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় সমগ্র শ্রমিক সংখ্যার এক সিকিও শ্রমিক মেয়ের সংখ্যা নাই যাহারা গিয়াছে কৃষক মেয়ের শ্রমিক মেয়ে তাহারা সরাসরি T.U সভ্যা অবশ্যই

হইতে পারিবেন কিন্তু শ্রমিকের মা বোনদের T.U. ভুক্ত করার কোন কায়দা নাই, অথচ শ্রমিকের লড়াইতে তাহাদের একটা বিশেষ ভূমিকা সর্বত্রই দেখা যাইতেছে। শ্রী দুর্গা মিলের দীর্ঘ ধর্মঘটে দলের পর দল মিল গেটে পিকেটিং করিয়াছে শ্রমিকের ঘরের মেয়েরা। তাহারাই পুলিশের সঙ্গে লড়িয়াছে, মরিয়াছে, অত্যাচার সহিয়াছে। রেলে ৮লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে কারখানাগুলিতে মাত্র নগণ্য, একটা সংখ্যা আছে মেয়েদের।বাকী সবাই শ্রমিকের মা বোন। Golden Rock এর স্মরণীয় ধর্মঘটে কারখানা ঘিরিয়া রাখিয়াছে শ্রমিক ঘরের মেয়েরা। বর্তমানের ধর্ম্মঘটেও কদম বাড়াইতেছে একই। এই মেয়েরা লড়াই আন্দোলনে বিরাট শক্তি সৃষ্টি করিতেছে, ভবিষ্যতে আরো করিবে। কিন্তু এঁদের জন্য কোন সংগঠন নাই। T.U. তেও নয়। বিভিন্ন কলে কারখানায়, শিল্পে ও অফিস দপ্তরে নিযুক্ত শ্রমিকের ঘরে ঘরে এই বিরাট কাহিনী রহিয়াছে যাদেরকে আন্দোলনে টানিবার এবং সংঘবদ্ধ করিবার দায়িত্ব নিতে হইবে পার্টির। এদের জন্যে ARS-এর মতন সংগঠন অবশ্যই প্রয়োজন। ARS-এর গণতান্ত্রিক প্রোগ্রাম এদেরই আন্দোলনের পেছনে গণসমর্থন লইয়া দাঁড়াইবে। এরা ARS-এই সংগঠিত হইবেন। কিন্তু ব্যাপক মহিলা আন্দোলনের ভিত্তি শুধু এদের মধ্যেই নাই। শ্রমিক মেয়ে এবং কৃষক মেয়েদের সঙ্গে এদের আন্দোলনকে সংযুক্ত করা এবং সাংগঠনিক যোগ স্থাপন করারও প্রয়োজন আছে। একের আন্দোলনে অপরের সমর্থন টানিবার জন্য এবং সকলের সাধারণ স্বার্থে একত্রে আন্দোলন করিবার জন্য একটা সাধারণ সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজন আছে যেখানে এরা পরস্পর যুক্ত হইবেন। এইহেতুই TUKS এর অন্তর্ভুক্ত মেয়েরাও ARS সহিত যুক্ত হইবেন।

প্রশ্ন হইবে TUKS মেয়েরা কিভাবে যুক্ত হইবেন ? Individual membership মারফতেই অথবা Collective affiliation সাহায্যে এ বিষয়ের কোন কডাকড়ি নিয়ম করা সমাপ্ত নয় উচিৎও নয়। Collective affiliation-ই আপাত দৃষ্টিতে সুবিধার মনে হইবে। কিন্তু এ সম্পর্কে একটা উদাহরণ দিয়া রাখিতেছি বিষয়টা বুঝিবার জন্য। বড় কমলাপুর এলাকায় ৪০০শত কিষাণ মেয়ে KS এর সভ্য। ইহাদের লইয়া KS এর অন্তর্ভুক্ত মহিলা সাব কমিটিও আছে। গত পৌষ মাসে বড় কমলাপুরে এই মেয়েদের উপরে জিলা কিষাণ-মহিলা সম্মেলন হয়। নিশ্চয়ই আপনারা এই সম্মেলনের বিষয় শুনিয়া থাকিবেন। সম্মেলন খুব ভাল হয় সাফল্যমণ্ডিত হয়। প্রকাশ্য সম্মেলনের নেত্রীরা একটা প্রস্তাব তোলেন KS মহিলা সাব কমিটির ARS সঙ্গে যৌথ অন্তর্ভুক্তির সম্পর্কে। প্রস্তাবটি আলোচনাও হয় না কিন্তু বিনা বাধায় পাশ হইয়া যায়। সেখানকার উপস্থিত মেয়েরা জন্মে হয়তো ARS -এর নামও শোনে নাই। কিন্তু নেত্রী মেয়েরা যাহা করিবে ভালর জন্যই করিবে এই মনোভাব হইতে তাহারাও এ বিষয়ে আর প্রশ্নই তুলিল না এবং বিষয়টি বুঝিলও না। এই ধরনের Collective affiliation সংগঠন বা আন্দোলন কোনদিক হইতেই সহায়কও নহে কাম্যও নহে। আমাদের প্রভাবিত কিষাণ এলাকা হইতে মেয়েদের মাথার উপর দিয়া আমরা এরকম প্রস্তাব হয়তো অনায়াসেই পাশ করাইয়া লইতে পারি কিন্তু তাহা কোনদিকেরই শক্তি বাড়াইবে না। ARS এর গণতান্ত্রিক প্রোগ্রামকে Campaign আন্দোলন মারফতেই তাহাদের

কাছে পরিচিত করিতে হইবে। এবং সেই প্রসেসের মধ্যে তাহারা ইচ্ছা হইলে individual membership এও আনিতে পারে Collective affiliation এও আসিতে পারে। দুই প্রতিষ্ঠানে individual membership এ কোন Constitutional বাধা নাই। যদি মেয়েদের সেই পদ্ধতিতেই Conscious করিবার পক্ষে সুবিধা হয়তো তাহাই করিতে হইবে। জমি ফসলের সবাইয়ের ফাঁকে ফাঁকে কিষাণ মেয়েদের দৈনন্দিন সামাজিক আন্দোলনের কাজে ARS এর গণতান্ত্রিক প্রোগ্রাম তাহাদের সহায়ক। এই হিসাবে মহিলা সাব কমিটির ঘরখানা ARS এরও ঘর এবং ঘাঁটি হইবে। এইভাবেই কিষাণ মেয়েরা ARS কে নিজের প্রতিষ্ঠান বলিয়া জানিবে এবং ইহার মারফতে অন্য শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে যুক্ত হইবার পথ পাইবে। নিজের দাবী লইয়া আন্দোলনেরও ব্যাপকতা সংগঠন পাইবে। এইজন্যই application এর ফর্ম হইতে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম করা হয় নাই। অনেক গ্রামে হয়তো এমনও হইবে- KS Unit Strong নয়। কিন্তু আমাদের দু একজন মহিলা কমরেডদের উপস্থিতি ও চেষ্টায় সেখানে কিষাণ মেয়েদের নিয়া ARS হইতে পারিবে। এই ARS অবশ্যই কিষাণ সমিতির মূল প্রোগ্রামের দিকেই মেয়েদের আনিবে।

মোটামুটি সাংগঠনিক প্রশ্নটাকে এইভাবে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই দেখিতে হইবে। মেদিনীপুরে মেয়েদের জন্য ARS বরাবরই তাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান। গতবার পর্যন্ত তাহারা AKS এর ফেস্টুন লইয়া আগাইয়াছে। তখনকার মহিলা ফ্রন্ট-এর ARS এর ত্রুটি ছিল—ARS এর প্রধান কাজ ছিল গঠনমূলক। মেদিনীপুরের মেয়েরা যখন নিজেদের প্রয়োজনেই দুর্বল দৃষ্টিভঙ্গিকে অতিক্রম করিয়া ARS ফেস্টুন লইয়াই কিষাণ লড়াইতে আগাইয়া গেল তখন সে লড়াইকে কেন্দ্রীয় ARS নিজের প্রোগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করিল না। বর্তমানে এই সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকেই মহিলা ফ্রন্টে আমূল পরিবর্তন করিবার সংগ্রাম চালানো হইতেছে। সুতরাং ARS নাম থাকিলে বা তাহার অন্তর্ভুক্ত হইলে গ্রামের মেয়েরা কিষাণ প্রোগ্রামে যুক্ত হইবে না বা দুর্বল হইয়া যাইবে এ ভয় করিবার কারণ নাই। শুনিলাম মেদিনীপুরে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, মেয়েরা ARS হইবে না। KS সভ্য হইবে। এরূপ সিদ্ধাপ্ত ভুল হইবে। মেয়েরা উভয়েরই সভ্য হইবে। পদ্ধতি তাহারা নিজেরাই বাছিয়া লইবে। সমিতির ঘর আগের মতই থাকিবে। ইহার কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। KS এর বাহিরে ARS হইবে KS মেয়েদেরও ব্যাপকতর মহিলা আন্দোলনের জন্য মহিলা প্রতিষ্ঠান। KS মেয়েদের ইহার মধ্যে ব্যাপক অন্তর্ভুক্তি ARS ও KS প্রোগ্রামে গ্রহণের ভিত্তি তৈরি করিবে।

বিশ্ব নারী সংঘের যে সমস্ত নেত্রীরা এখানে আসিয়াছিলেন, তাহাদের সঙ্গে নানা আলাপের মধ্যে এ সমস্ত দেশে মেয়েদের সাংগঠনিক কায়দা ও এইরকমই জানা গিয়াছে। ওদের মহিলা প্রতিষ্ঠানে ৩০ লক্ষ, ৪০লক্ষ, ৮০লক্ষ করিয়া সভ্যা সংখ্যা শ্রমিক কৃষক ও গরীব মধ্যবিত্ত মেয়েদের একত্র সমাবেশই এই সভ্যা সংখ্যা। এখানেও তাহার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অন্ততঃ যেসব এলাকায় শ্রমিক কৃষক মেয়েরা পার্টি প্রভাবে আছে, তাহারা পরপর মিলিত হইবার জন্য এই ধরনের মহিলা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে অবশ্যই পারে। ইহা দ্বারা তাহাদেরই সর্বতোমুখী গণতান্ত্রিক দাবী এবং সংগ্রাম জোরালো হইয়া উঠিবে। বাংলাদেশে ARS এই ব্যাপক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের

কাঠামো। ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তোলা আমাদেরই কাজ এবং শক্তিশালী করার অর্থ হইবে নিজেদেরই আন্দোলনকে শক্তিশালী করা। এই ভিত্তিতেই ARS গড়িয়া তুলিতে হইবে শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যেও।

রেল ধর্মঘটের পরে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে এখন বলা শক্ত। কিন্তু আমার ইচ্ছা আছে ধর্মঘটের পরে জিলার একটা Women P.M. দের নিয়া meet করা। সেটা কোথায় কিভাবে সম্ভব হইতে পারে DC হইতে ঠিক করিয়া দিতে হইবে। খড়্গপুরে সম্ভব না হয় তো আমি গ্রামের এই অবস্থায় খাওয়া থাকা এবং ফিরিয়া আসার মধ্যে বাধা ও অসুবিধা কি কি আছে না আছে আপনারা বিবেচনা করিবেন। DCS এর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার সম্ভব হইলে চিঠি সমস্ত বিষয়েই আলোচনা পরিষ্কারভাবে হইতে পারে।

ঘর বাইরে পত্রিকায় কিষাণ আন্দোলনের রিপোর্ট পাওয়া দরকার প্রকাশের জন্য। বিশেষভাবে মেয়েদের ভূমিকা বিষয়ক। এখানে মেয়েরা যদি নিজেরা এবিষয়ে রিপোর্ট পাঠাইতে পারেন তো ভালই। নয়তো DC কেই ভার নিতে হইবে। Through PC Women fraction এর কাছে রিপোর্ট পাঠাব। এ বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা করিবেন। গ্রাম এলাকায় পড়িতে পারে এবং কাগজ বিক্রী হইতে পারে এইরকম মেয়েদের সংখ্যা কত? আমাদের প্রভাবিত এলাকাগুলিতে কত পরিমাণ কাগজ বিক্রী সম্ভব? সেই অনুসারে মেয়েরা এজেন্সীও লইতে পারে।

এই পত্রের উত্তর পাইলে সেই অনুযায়ী আমার এখানকার প্রোগ্রাম স্থির করিব। আশা সম্পর্কে সত্তর ব্যবস্থা করিবেন আশা করি।

লাল সেলাম
ইতি
মৃণাল
Secy. Women's fraction 28/2

পুলিশ ফাইল নং - ৭৮৯(৪৬)

(৪)

শ্রীযুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্টের স্বরাষ্ট্র সচিব মহাশয়ের সমীপেষু।

মহাশয়,

গত ২৯শে এপ্রিল তারিখে আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রায় সাড়ে তিনমাস বিনা বিচারে আটক বন্দী হিসাবে প্রথমে হুগলী পরে প্রেসিডেন্সী জেলে আটক রাখার পর গত ১০ই আগস্ট তারিখে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি দেওয়ার সময়েই আমার উপর পুনরায় হুগলী জেলার মধ্যে অন্তরীণ থাকার জন্য একটা সরকারী হুকুমনামা জারী করা হয়। ফলে বর্তমানে আমাকে হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর শহরে আমার পিত্রালয়ে বাস করিতে হইতেছে।

অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে কেন যে আমাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল এবং কেনই বা আমার উপর পুনরায় অন্তরীণ থাকার আইন জারী করা হইল তাহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। হুকুমনামায় দেখিলাম যে আইন অনুমোদিত কার্য্যের জন্য আমাকে সন্দেহ করা হইয়াছে - ইহা সত্য নহে। আমি ইহাই জোর করিয়া জানাইতেছি যে কোন প্রকার আইন অনুমোদিত সংগঠন বা কার্য্যের সহিত আমার কোনপ্রকার সম্পর্ক নাই। এমন কি বহুমাস যাবৎ আইন অনুমোদিত মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কার্য্যও করি নাই এবং করিতেছিও না। তথাপি এভাবে বিনা কারণে ও ভুল ধারণায় আমাকে আটক করিয়া আমার স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও কাজকর্ম করার পথে বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে।

বর্তমানে আমার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। চাকুরি করিয়াই আমাকে আমার ও আমার কন্যার জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত। কিন্তু এইরূপ আটক অবস্থায় আমি কোনপ্রকার চাকুরী করিতে পারিতেছি না বা কোনপ্রকার চাকুরীর সন্ধানও পারিতেছি না। ফলে আমাদের আর্থিক অবস্থা এদিন আরো শোচনীয় আকার ধারণ করিতেছে। তাতে আমার কন্যার স্কুলের পড়ানও বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। বর্তমানে আমার কার অত্যন্ত অসুস্থ বিশেষ কোন অসুখের জন্য ডাক্তার আমাকে শীঘ্র মধ্যে অস্ত্রোপচার করার জন্য বলিয়াছেন। শীঘ্রমধ্যে অস্ত্রোপচার না করিলে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হইয়া পড়িব— ইহাই তাঁহার অভিমত। ইহাও জানিতে পারেন যে জেলে আটক থাকাকালীন 'মেয়েমানুষ' বিশেষজ্ঞ লেডি ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহারও ইহাই অভিমত ছিল। বর্তমানে বিনা চিকিৎসায় আমার শরীর আরো খারাপ হইয়া পড়িতেছে। এইভাবে আটক থাকিয়া আমার চিকিৎসারও কোনকিছুই ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না।

এইমত অবস্থায় অবিলম্বে আমার কোন চাকুরীর ব্যবস্থা না করিতে পারিলে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িবে এবং আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা এইখানে হওয়ার উপায় নাই। যথাযথভাবে সুচিকিৎসা না করিতে পারিলে আমার জীবন সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়িবে।

অতএব আমি আপনার নিকট অনুরোধ করি যে আমাকে স্বাধীনভাবে চাকুরীর চেষ্টা করিতে আমার নিজের চিকিৎসা, পরিবারের অন্যান্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও পারিবারিক নানা বিষয় কাজকর্ম করিবার স্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবে বসবাস করার জন্য আমার উপর হইতে সরকারী হুকুমনামা তুলিয়া লওয়া হউক। আমি আশা করি একজন মহিলার উপর হইতে যে আটক আইনের হুকুমনামা রহিয়াছে তাহা তুলিয়া লইয়া আমায় স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রায় সকল বাধা দূর করিয়া দিবেন।

ইতি

স্বা. ঊষা চক্রবর্তী

চাতরা বাজার রোড

জেলা - হুগলী

পুলিশ ফাইল নং- 789(46)

(৫)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব মহাশয়ের নিকটে মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় মারফত।

মহাশয়,

মেদিনীপুর শহরের বাহিরে যাইতে হইলে ৭দিন পূর্বে ঠিকানা জানাইতে হইবে ইত্যাদি সরকারী নির্দেশ আমার প্রতি থাকায় আমার পক্ষে কাজকর্মের বড়ই অসুবিধা হইতেছে। আমি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষে মহিলা ও শিশুদের জন্য কাজ করি। আমার কাজ কোনওরূপ অবৈধ নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমার উপর এইরূপ নির্দেশ এখনও থাকায় সর্বদা সরকারী লোক আমার পিছনে ঘোরে- তাহাতে আমার ব্যক্তিগত কাজকর্মের এমন কি নিজের ভরণপোষণের জন্য উপার্জন করার পক্ষে আত্মীয়স্বজনের বাড়ী যাওয়া পর্যন্ত অসুবিধা ও কষ্টকর হইতেছে।

আপনাকে জানাই যে আমার উপর হইতে এরূপ নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইয়া আমাকে ভরণপোষণের জন্য উপার্জন করার সুযোগ দিন।

স্বা: ঊষা চক্রবর্তী
মেদিনীপুর
৩০.১২.৪৮

পুলিশ ফাইল নং - 789/46

(৬)

প্রিয় বেলাদি

সম্মেলনে এসে আপনাদের সঙ্গে আজ ভালভাবে আলাপ করতে পারি নি। ৫ তারিখে রাত ২.৩০টায় বাড়ী ফিরে দেখি বাচ্চা ছেলেটি খুবই অসুস্থ। ৬ তারিখ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি দেখে ডাক্তার ডাকি। ডাক্তার বললো ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির Last Stage এ এসে গেছে। ৬ ও ৭তারিখে অত্যন্ত খারাপ অবস্থা গেছে। বহু চেষ্টা করেও আমি একটা বারের জন্য মিটিং এ যাওয়ার সুযোগ করতে পারি নি। আমাদের প্রতিনিধিদের কাছে চিঠি লিখে পাঠাই ওরা যেন আমার বাড়ীতে এবং অন্তত: আলাপ আলোচনা করে পরবর্তী মিটিং-এ আমার বক্তব্য ঠিক করার জন্য। কিন্তু ওরা কেউ আসতে পারলেন না। RCPI এর কমলা মজুমদারকে অবশ্য বলা ছিল যদি All India Comittee -র কিছু গঠন করা হয়। আসাম থেকে অন্ততঃ কমলা ও আমার নাম যেন দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের সমিতির যে সভ্যা এসেছিলেন তিনি বললেন উনি নিজে বলা সত্ত্বেও কমলা এরা ওঁর সঙ্গেও কিছু আলোচনা করেনি আমাকে খবর করা তো দূরের কথা। উনি যা বললেন তাতে বোঝা গেল সারা ভারতের চেহারা দেখে ওরা P বিরোধী দল একটা তৈয়ারী করার চেষ্টায় ছিল। যার ফলে ওরা আমাদের নাম প্রস্তাব করেনি। অথচ আসামে আমাদের মহিলা সমিতিই সবচেয়ে active। যাক ওসব বলে এখন লাভ নেই। তবে একটা বিষয় জানতে চাইছি। যদি আসাম থেকে আমাদের মহিলা সমিতির তরফ থেকে All India Committee কে জানানো যায় তাহলে কিছু

একটা ব্যবস্থা করা যায় কি? তাছাড়া, আমার অনেককিছু জানাবার রয়েছে। কবে এবং কোথায় গেলে আপনাকে, মণিদিকে বা রেণুদিকে পাওয়া যাবে তাড়াতাড়ি জানাবেন। ঠিকানা জানিয়ে দিবেন। এই চিঠিখানা মণিদি ও রেণুদিকে দেখাবেন। শুভেচ্ছা রইল।

ইতি

১৫.৬.৫৪ হেনা বেরা

পুলিশ ফাইল নং - 619/36

(৭)

বন্দী মণিকুন্তলা সেনের প্রতি অন্যায় আচরণ।

মহাশয়,

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রাদেশিক কমিটির নেত্রী শ্রীযুক্তা মণিকুন্তলা সেনকে গ্রেপ্তার করে মেদিনীপুর জেলে রাখা হয়েছে। আমরা সম্প্রতি শুনলাম জেলের ভিতর মণিকুন্তলা সেনের উপর উৎপীড়ন চলছে, তাঁকে জেলের ভিতর কয়েদীদের সঙ্গে রাখা হয়েছে, এ পর্যন্ত একখানা কাপড় বা বিছানাপত্র কিছুই তাঁকে দেওয়া হয়নি, সাবান দেওয়া হয় না, সাবানের পরিবর্তে তাঁকে সাজিমাটি ব্যবহার করতে হয়। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতেরও অত্যন্ত কড়াকড়ি, গরাদের ভিতর দিয়ে তাঁকে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয়। আমরা গভর্ণমেন্টের এরূপ অন্যায় আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করি, এবং অবিলম্বে মণিকুন্তলা সেনের মুক্তি দাবী করি।

সম্প্রতি বিভিন্ন জেলে যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন ধর্মঘট করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশ দাবী নাকি সরকার মেনে নিয়েছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে মেনে নেওয়াটা শুধু কাগজপত্রেই। মেয়ে বন্দীদের প্রধান দাবী ছিল, মেয়েদের প্রেসিডেন্সী জেলে একত্রে রাখা এবং অন্য একটি দাবী ছিল সমস্ত বন্দীদের প্রথম শ্রেণির সুবিধা দেওয়া, রাজনৈতিক বন্দীদের চোর ডাকাতের পর্যায়ভুক্ত করা চলবে না।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মণিকুন্তলা সেনের বেলা এ সমস্ত কিছুরই ব্যতিক্রম হচ্ছে। তাঁকে লোকচক্ষুর অন্তরালে মেদিনীপুর জেলে রাখা হয়েছে। এবং এভাবে চোর-কয়েদীদের সঙ্গে রেখে তাঁর উপর উৎপীড়ন করা হচ্ছে। আমরা গভর্ণমেন্টের এরূপ মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করি এবং মণিকুন্তলা সেন ও অন্য যে কয়জন মেয়ে বন্দী মেদিনীপুর জেলে আছেন তাঁদের অবিলম্বে প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত করে প্রথম শ্রেণির বন্দী হিসাবে রাখবার দাবী জানাই।

আমরা পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্টকে জানিয়ে দিতে চাই, বাংলার পুরোগামী মেয়েদের নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের উপর এই ধরনের অন্যায় আচরণ আমাদের দেশের সংগ্রামী মেয়েরা কোনমতেই সহ্য করবে না। আমরা জনসাধারণকেও এই ধরণের অনাচারের প্রতিবাদ করিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ইতি

অনুপমা বাগচী

পুলিশ ফাইল নং 619/36 ৯৩/১ এ, বহুবাজার স্ট্রীট

(৮)

ডি.আই.বি. ইন্সপেক্টর মহাশয় সমীপে

মহাশয়,

খড়্গপুরে আমার গ্রেপ্তারকালে আমাদের বাসা হইতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পুলিশ লইয়া আসে। বইগুলি একখানিও বেআইনী নহে এবং রাজবন্দীদিগকে যে সমস্ত পুস্তক পড়িবার অনুমতি দেওয়া হইয়া থাকে এগুলি তাহারই অন্তর্ভুক্ত। উক্ত বইগুলি অবিলম্বে আমাকে আপনারা ফেরৎ দিবেন। আপনাদের জনৈক কর্মচারীর মুখে শুনিয়াছি আমাকে শীঘ্রই কলিকাতা পাঠাইবেন। বইগুলি তাহার পূর্বেই যেন আমার নিকটে পৌঁছায়। নচেৎ উক্ত পুস্তকগুলির বিনাদোষে খোয়া যাইবার অথবা অনন্তকাল আপনাদের দপ্তরে পড়িয়া থাকিবার আশঙ্কা আছে। শ্রীমান শান্তিচন্দও বইগুলি চাহিয়া অনুরূপ দরখাস্ত আপনাদের কাছে পাঠাইতে পারেন। আমাকে বই ফেরৎ দিবার কথা তাহাকে আপনারা জানাইয়া দিবেন ও বাড়ী হইতে যেসমস্ত বই ও কাগজপত্র পুলিশ আনিয়াছে তাহা শান্তিচন্দের নহে আমার। অতএব আমাকে ফেরৎ দিলেই হইবে। নি: (স্বা:) মণিকুন্তলা সেন ১৫.৪.৪৯

বইগুলির নাম —

1) Helps to the Study of Communist Manifesto.

2) History of the Communist Party [C.P.S.U] (B)

3) Political affairs

4) বাংলায় কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ

5) ঘরে বাইরে,

6) মুক্ত চীনের কৃষক (নামটি আমি হয়ত ঠিক লিখতে পারলাম না। একখানা ছোট পুস্তিকা)।

পুলিশ ফাইল নং - 619/36

(৯)

To
The Home Secretary
Govt. of West Bengal

From
Bimala Majhi
Detenu
(Mid. Jail)

মহাশয়,

গত ১৫ মাস যাবৎ আমি মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারায় আবদ্ধ আছি। সম্প্রতি আমাকে মুক্তি দিয়ে নিবর্তনমূলক আটক আইনে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিতেছে।

আমার বৃদ্ধা মাতা বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগিতেছেন। বর্তমানে তিনি মরণাপন্ন অবস্থায় শয্যাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার জন্য আমি অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় দিন কাটাইতেছি। আমার

এই দীর্ঘ কারাবাসের মধ্যে একবারও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ হয় নাই। তিনি এই জেলারই তমলুক মহকুমার একটি গ্রামে বাস করেন। সেখান হইতে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

সেজন্য আপনার নিকট আমার আবেদন এই যে শীঘ্র মধ্যে একবার আমাকে এক সপ্তাহের জন্য গৃহে যাইবার মাতাকে শেষবারের মত দেখিয়া আসিবার অনুমতি দেওয়া হোক। আশা করি আমার আবেদন উপযুক্ত করুণার সহিত বিচার করা হইবে এবং ইহা গ্রাহ্য হইতে বিলম্ব হইবে না।

বিনীতা

১৬ই জুন ১৯৫০ স্বাঃ বিমলা মাজী

মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারা রাজবন্দিনী

পুলিশ ফাইল নং -১৬২৮/৪৯

(১০)

মেদিনীপুর জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি

(পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শাখা)

অফিস - তমলুক

জেলা - মেদিনীপুর

প্রিয় ভগ্নী,

৬ টাকা গত পরশুদিন পাঠিয়েছি। আমাদের জেলার কৌটা চাঁদা -৫ এবং আমার ব্যক্তিগত চাঁদা জুন জুলাই ২মাসের ১ টাকা। প্রাপ্তি সংবাদ দিবে। সার্কুলার পেয়েছি। সব জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি। সাধারণ রিপোর্ট একটা পাঠালাম। আমাদের কাজের অবস্থা খুবই দুর্বল-ফাণ্ড সংগ্রহ করার জন্য কিছু করা একান্ত প্রয়োজন—গীতা না এলে কিছু করা যাবে না। সহি সব জায়গাতেই উঠছে মনে হচ্ছে তবে রিপোর্ট এখনও পাইনি।

অভিনন্দনসহ

পুলিশ ফাইল নং ৮৯৮/৪৪ স্বা: নির্মলা সান্যাল

'ঘরে বাইরে' পত্রিকা ৩৫ কপি পেয়েছি।

স্বা: নির্মলা সান্যাল

(১১)

মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের বিশেষ শাখার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

আমি আজ ১৮ মাস যাবৎ বিনাবিচারে কারাভোগ করিতেছি। গত ১৯৪৯ পর মার্চ মাসে আমি প্রথম গ্রেপ্তার হই। ইহার পর দুই মাস অবধি আমাকে গ্রেপ্তারের কোন কারণ দর্শান হয় নাই। এই বে-আইনী ব্যবস্থার বারংবার প্রতিবাদের ফলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একদিন জেলা পরিদর্শন

করিতে আসিয়া এইস্থানেই বসিয়া নিজ পরিকল্পিত একটি কেসের ধারা আমার কাছে বসাইয়া দেন। সরকারের নিকট আমার ইহাই জিজ্ঞাস্য যে কোন আইনের বলে কোনও নিরপরাধ নাগরিককে সম্পূর্ণরূপে অকারণে প্রথমে গ্রেপ্তার করিয়া পরে তাহার কারণ স্বরূপ ইচ্ছানুযায়ী কাল্পনিক অভিযোগ দর্শান যায়? আমি শুনিয়াছি ঐ কেসের ধারানুযায়ী আমার বিরুদ্ধে দাঙ্গা, লুঠতরাজ, ইত্যাদির অভিযোগ আনা হয়েছিল। কিন্তু এই অভূতপূর্ব ভারতীয় গণতান্ত্রিক আইনানুযায়ী সরকার এ পর্যন্ত একদিনও প্রকাশ্য আদালতের সম্মুখে আমাকে ঐ অভিযোগের সত্যাসত্য প্রমাণ করিবার অধিকার দেন নাই।

এইরূপে এক বৎসরের উপর বিনা বিচারে ও বিনা কারণে হাজতবাস করাইবার পর গত জুন মাসে (১৯৫০) আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়। আমার সহিত আমার দুইটি শিশুপুত্র কন্যাও এই একবৎসরাবধি কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে। ইহার অনিবার্য ফলস্বরূপ তাহাদের স্বাস্থ্য ক্রমাবনতির যাইতেছে। বিশেষতঃ আমার শিশুকন্যাটির অবস্থা ক্রনিক আমাশয় রোগে ভুগিয়া আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘদিন কারাবাসের ফলে আমার শরীরও সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গিয়া আমার দেহের ওজন উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে। অত্যন্ত শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ নানাবিধ রোগের আক্রমণে আমাকে অধিকাংশ দিনই শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হয়। আমি আশঙ্কা করি এইরূপে আরও কিছুদিন কারাবাস করিতে হইলে আমাকে কোনও বিশেষ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রমিত হইতে হইবে।

বর্তমানে যে যে অভিযোগের অজুহাতে আমাকে বন্দী রাখা হইয়াছে আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করি। আমি আরও মনে করি যে, এই কারণেই সরকার আমাকে প্রকাশ্য আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত করিতে সাহসী হইতেছে না। আমি অবিলম্বে আমার মুক্তি দাবী করি। নতুবা প্রকাশ্য আদালতে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির সত্যতা রাখি।

ধন্যবাদের সহিত।

মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারাগার
৮ই আগষ্ট ১৯৫০
পুলিশ ফাইল নং- ১৬২৮/৪৯

বিনীতা
বিমলা মাজী
রাজবন্দিনী

(১২)

মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ স্বরাষ্ট্র সচিব মহোদয় সমীপেষু

মহাশয়,

ইতিপূর্বে আমি গৃহে যাইয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আপনার নিকট দুইবার আবেদন জানাইয়াছি। কিন্তু এখনও তাহার কোনও উত্তর পাই নাই। গতকল্য গৃহের পত্র মারফৎ জানিলাম যে, আমার বৃদ্ধ শ্বশুর মহাশয়ও দীর্ঘদিনের রোগভোগ এবং নিদারুণ মানসিক অশান্তির

ফলে মৃত্যুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। আমার সহিত আমার দুইটি পুত্রকন্যাও এইস্থানে আটক রহিয়াছে। এই দীর্ঘদিনের অদর্শনে তিনি তাহাদের একবার দেখিবার জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন।

সেইজন্য আপনার নিকট আমার আবেদন এই যে, আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব এক সপ্তাহের জন্য গৃহে যাইয়া মাতা ও শ্বশুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দেওয়া হোক। আমার পিতৃগৃহ ও শ্বশুর গৃহ পরস্পর নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। দুইটি গ্রামই তমলুক মহকুমার অন্তর্গত। এই সুদীর্ঘ দেড় বৎসরের কারাজীবনে আমি তাঁহাদের দর্শন হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত আছি। আশা করি তাঁহাদের সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার ব্যাকুলতা উপলব্ধি করিবেন এবং অবিলম্বে প্রার্থিত অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন।

ধন্যবাদের সহিত
বিনীতা
স্বাঃ বিমলা মাজী

মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারা
৭ই জুলাই ১৯৫০
পুলিশ ফাইল নং ১৬২৮/৪৯

(১৩)

To
The Home Sec.
Govt. of West Bengal

মহাশয়,

গত ১২.১০.৫০, ২০.১০.৫০, ২৬.১০.৫০ ও ৩০.১০.৫০ তারিখে পরপর চারটি দরখাস্ত করিয়াছি। উক্ত দরখাস্তগুলিতে আমি আমার পারিবারিক অবস্থা ও মায়ের শারীরিক অবস্থার কথা জানাইয়াছিলাম। উপরোক্ত বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন কিনা জানিতে চাই।

আমার মায়ের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা আরও অবনতির দিকেই যাইতেছে। আমি তাঁহাকে আর একবার দেখিতে যাইবার ছুটি দাবী করিতেছি। আশা করি আমাকে আর একটা Handle leave অবিলম্বে মঞ্জুর করিবেন।

স্বা: ভক্তি ঘোষ (মহিলা রাজবন্দী)
মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল
৬/১১/৫০

পুলিশ ফাইল নং ৭৭৭/৪২

(১৪)

মাননীয়াসু, ৩রা ভাদ্র, ১৩৬৯

ব্যারাকপুর

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে— আমরা পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির ব্যারাকপুর শাখা প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছি। স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষতঃ স্থানীয় মহিলা সমাজ এ ব্যাপারে আমাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সমর্থন জানাচ্ছেন।

কিন্তু কর্ম পরিচালনায় আমাদের স্বল্পদক্ষতা এবং কর্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব আমাদের অগ্রগতির পরিপন্থী। এইরূপ অবস্থায় আপনার বা আপনাদের উপদেশ আমাদের একান্ত কাম্য। সুতরাং আমাদের মাঝে একদিন আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করছি। আপনি যদি একদিন এসে আমাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়া যান তবে আমরা সবিশেষ বাধিত হব। কবে আপনার সময় এবং সুবিধা হবে আমাদের জানালে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আপনি যদি মনে করেন আপনাদের অন্যান্য সহকর্মীদের কারোও আসা সম্ভব আমাদের জানালে অত্যন্ত বাধিত হব।

আপনার চিঠি পেলে আমরা আপনাদের আনবার ব্যবস্থা করব। আশা করি আপনি আপনার সুবিধামত সম্ভাব্য তারিখ জানাবেন। আপনি আমাদের নমস্কার জানবেন।

ইতি

স্বা: রেবা চ্যাটার্জী

সম্পাদিকা মহিলা সমিতি

ব্যারাকপুর শাখা

From
Reba Chatterjee
C/O- B.K. Ghosh
Beniapara,Moniranpur
Barrackpur, Dist. 24 Parganas

পুলিশ ফাইল নং - 3890/49

(১৫)

দাসপুর থানা কংগ্রেস কমিটি
কার্যালয় গ্রাম ও পো: সোনাখালি
জেলা-মেদিনীপুর, তাং - ১০.৬.৬৩

To
The DIG, 9B, CID
West Bengal, Calcutta
13, Lord Suigho Rd. Cal

মহাশয়,

মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার তথা ঘাটাল মহকুমার দেশপ্রেমিক জনসাধারণের পক্ষ

হইতে নিবেদন এই যে, এই থানায় তথা এই মহকুমা কয়েকবৎসর যাবৎ উত্তরোত্তর কম্যুনিস্টদের প্রাদুর্ভাব বাড়িয়াই যাইতেছে। গণতান্ত্রিক প্রথায় শাসিত দেশে স্বাভাবিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাব বাড়িতে থাকিবে। ইহা জানা থাকিলেও বর্তমানে ক্ষীণ আক্রমণ জন্য জরুরী পরিস্থিতিতে যেখানে কম্যুনিস্ট পার্টির দেশ বিরোধী ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের পরিসর বহুভাবে পাওয়া যাইতেছে তথা তাহাদের সম্বন্ধে দেশবাসী তথা সরকারের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

কিছুদিন পূর্বে আমি শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে ব্যক্তিগতভাবে দাসপুর থানার রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা সর্বাঙ্গীন রূপ জানাইয়া একটি পত্র লিখিয়াছিলাম। উহাতে সব কথাই জানাইয়াছিলাম। তৎপূর্বে আমার কিছু ধারণা ছিল। আমি গত সাধারণ নির্বাচনে দাসপুর বিধানসভাকেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ছিলাম। আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে- কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রী মৃগেন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট আমি পরাজিত হই। সাম্প্রতিক একটা ঘটনার কথা বলিয়া জনসাধারণকে তাহার কথা আপনার দৃষ্টিতে আনিব। পশ্চিমবাংলায় কোথায় বিশেষ করিয়া মেদিনীপুর জেলায় প্রকাশ্য কম্যুনিস্টরা কোনও জনসভা করার সাহস করে নাই। কিন্তু গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সোমবার দাসপুর থানার পার্বতীপুর গ্রামে ভূপাল পাণ্ডা, গীতা মুখার্জী প্রমুখ কম্যুনিস্ট নেতাদের পরিকল্পনায় প্রায় পাঁচশত লোকের মিছিল সহ সভা হইয়াছিল। ইহাতেই এ অঞ্চলের অবস্থা জানিতে পারিবেন। ঐ সভার বহুদিন পূর্ব হইতে শ্রী ভূপাল পাণ্ডা বাড়ী বাড়ী গিয়া চাঁদা আদায় তথা রাষ্ট্রবিরোধী প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। স্থানীয় কম্যুনিস্টকর্মী শ্রী রামকৃষ্ণ মাইতি, সতীশ মাইতি, শীতল সা, নিশীথ মণ্ডল প্রভৃতি ঐ সভার প্রস্তুতির জন্য প্রকাশ্যভাবে রাষ্ট্র বিরোধী কথাবার্তা বলিয়া তাহারা সংগ্রহার্থে বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করে। এ সংবাদ কি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হইয়াছিল বা এজন্য কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া ঐ অঞ্চলে সরকারি গুপ্তচর বিভাগের পর্যবেক্ষন প্রেরণ করা হইয়াছিল কি ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য?

স্বা: ভবদীয়

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র শাসমল

সভাপতি

পুলিশ ফাইল নং - ৩৮৯০/৪৯

(১৬)

মণিকুন্তলা সেনের নিজের হাতের লেখা চিঠি

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে আমাদের শাখা সংঘ নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং সেই হিসাবে সঙঘ মহিলা সম্মেলনের সংগৃহীত কার্যক্রমেই গ্রহণ করে ও মহিলা সম্মেলনের কলিকাতা শাখার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রেণু রায় ও সুধীরা রায়ের আহ্বানে যে মহিলা সভা হইয়াছিল তাহাতেই ঐ সংঘ গঠিত হয়।

মণিকুন্তলা সেন

২১.৮.৪১

পুলিশ ফাইল নং - 619/36

(১৭)

বেলাদি,

আমাদের জেলাতেও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হচ্ছে। সুতরাং আমরা চিন্তা করে দেখলাম আমাদের জেলা থেকেই স্বেচ্ছাসেবিকাদের আইন অমান্য করা উচিত। তাছাড়া মাসীমা এবং কাকীমাদের এখনই এই কাজ করলে সংগঠনের ক্ষতি হতে পারে। পরে অন্য খবর জানাচ্ছি। বিষয়টা আপনারা ভাল করে ভেবে তাড়াতাড়ি জানান।

ইতি

(স্বাঃ মুক্তা কুমার)

পুলিশ ফাইল নং ৮৯৮/৪৪

বামপন্থী মহিলা নেত্রীদের সংক্ষিপ্ত জীবনপরিচিতি

মণিকুন্তলা সেন : অবিভক্ত বাংলার নারী আন্দোলনের প্রথম সারির নেত্রী। ১১ ডিসেম্বর, ১৯১০সালে বরিশালে জন্ম। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন। ১৯৪৮-৫২ পর্যন্ত কারারুদ্ধ ছিলেন। জলি কলকে বিবাহ করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম আইনসভায় নির্বাচিত বিধায়ক। ১১সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭সালে জীবনাবসান। স্মৃতিগ্রন্থ: সেদিনের কথা।

রেণু চক্রবর্তী : ২০অক্টোবর, ১৯১৭সালে কলকাতায় জন্ম। ১৯৩৮ সালে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্তের প্রভাবে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৫২-১৯৬২সাল পর্যন্ত পরপর তিনবার কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরূপে লোকসভায় নির্বাচিত। লিখিত গ্রন্থ: 'Communists in Indian Women's Movement'।

কমলা মুখোপাধ্যায়: ২৪শে মে, ১৯১৩ হাওড়াতে জন্ম। ছাত্রাবস্থা থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান। ১৯৩৮ খ্রি. মুক্তি পাবার পর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। কারামুক্ত মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম পার্টি সদস্য। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

যুঁইফুল রায়: ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে বরিশালে জন্ম। বরিশালে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মুখ্য প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৮-৩৯সালে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা। ১২ই জানুয়ারি, ১৯৯৭ জীবনাবসান।

কনক মুখার্জী: ৩০ডিসেম্বর, ১৯২১ সালে যশোরে জন্ম। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা হন। ১৯৩৯-এ গার্লস স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিকা। সরোজ মুখার্জীর সঙ্গে বিবাহ। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। কবি ও সাহিত্যিক রূপে পরিচিত। ৯-মার্চ, ২০০৫ সালে জীবনাবসান।

অপর্ণা পাল চৌধুরী: বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলায় ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন। ১৯৪৩সালে কাছাড় জেলার পার্টির সম্পাদক সুরথ পালচৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ। সুরমা উপত্যকায় নানকার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। এজন্য অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থায় পুলিশের অত্যাচারে তাঁর গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। ৫ বছর জেলে কাটিয়ে মুক্তি পেয়ে ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। আমৃত্যু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা ছিলেন। ১৯৯২তে জীবনাবসান হয়। রচিত গ্রন্থঃ নারী আন্দোলনের স্মৃতিকথা।

ইলা মিত্র: ১৭ অক্টোবর, ১৯২৫ সালে যশোরে জন্ম। ১৯৪০ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ক্রীড়াবিদ হিসাবে প্রতিযোগিতার জন্য ভারত থেকে নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সালে নাচোলের জমিদার পরিবারের ছেলে কমিউনিস্ট নেতা রমেন মিত্রের সঙ্গে বিবাহ। নাচোলের তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। পাকিস্তান সরকারের হাতে চরম নির্যাতিতা হন এবং কিংবদন্তীতে পরিণত হন। মুক্তি পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে অধ্যাপনার কাজের পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ নেন। ১৯৬২-৭৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মাণিকতলা কেন্দ্র থেকে চারবার সি.পি.আই-এর সদস্যরূপে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৩অক্টোবর, ২০০২ সালে জীবনাবসান।

মনোরমা বসু: ১৮৯৭সালের ১৮ই নভেম্বর বরিশাল জেলার নরোত্তমপুর গ্রামে জন্ম। ১৯০৭-০৮ খ্রিষ্টাব্দে নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন 'মাতৃমন্দির'। চল্লিশের দশকের প্রথমে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা হন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

নিবেদিতা নাগ : ১৯১৮ সালের ৪ঠা আগস্ট বাংলাদেশের ঢাকার অদূরে নারায়ণ গঞ্জে আমলা পাড়ায় জন্ম। ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হন। স্বামী বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা নেপাল নাগ। ১৯৪২সালে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ অর্জন করেন। ১৯৪৩সালে ঢাকা জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জেলা সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। পরে সারা প্রাদেশিক স্তরে মহিলা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

জ্যোতি চক্রবর্তী: ১৯০০ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার মাইজদি গ্রামে জন্ম। কংগ্রেস কর্মী হিসাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। এবং নারীদের জন্য গড়ে তোলেন 'সেবা সমিতি'। পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। ১৯৭১ সালে গুপ্তঘাতকের দ্বারা আক্রান্ত হন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৬ সালের ২২শে জুলাই জীবনাবসান।

পঙ্কজ আচার্য: ১৯২৪সালে রাজশাহীতে জন্ম। ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন। স্বামী বিখ্যাত শ্রমিক নেতা গোপাল আচার্য। ভারতের জাতীয় মহিলা ফেডারেশনের একজন সংগঠক ছিলেন পঙ্কজ। ১৯৬১সালে প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সাধারণ সম্পাদিকা হন। ১৯৭৭ সালে রাজ্য সমাজকল্যাণ পর্ষদের সভানেত্রী হন। আমরণ তিনি এই পদে ছিলেন। ১৯৮২ সালের ১২ই জুন জীবনাবসান।

গীতা মুখার্জি: ১৯২৪সালের ৭-ই জানুয়ারি বাংলাদেশের যশোরে জন্ম। বিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই ছাত্র আন্দোলনে যোগদান। ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন এবং ঐ বছরই কমিউনিস্ট নেতা বিশ্বনাথ মুখার্জীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। কৃষক আন্দোলন ও মহিলা আন্দোলনে অংশ নেন। বহুবার কারাগারে বন্দী হন। ১৯৬৭-৭২পর্যন্ত চারবার পাঁশকুড়া কেন্দ্রের বিধায়ক। ১৯৮০ থেকে ঐ একই কেন্দ্র থেকে আমরণ লোকসভার সাংসদ ছিলেন। মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ বিল পাশ করানোর জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। ২০০০ সালের ৫ই জানুয়ারি জীবনাবসান হয়।

ভক্তি ঘোষ: জন্ম ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ। বাঁকুড়া জেলার প্রথম মহিলা কমিউনিস্ট সদস্য। বাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট নেতা উদয়ভানু ঘোষের সাথে ১৯৪৬ সালে বিবাহ। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বাঁকুড়া জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। জেলে থাকাকালীন রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে ৫৬দিন অনশন করেন। ১৯১৭সালের ৭ সেপ্টেম্বর জীবনাবসান হয়।

মুক্তা কুমার: হুগলী জেলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী নেত্রী। ১৯৪২সালে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যা হন। ১৯৪৩-১৯৮২খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হুগলী জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকার দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৫৫সালে সুইজারল্যাণ্ডে বিশ্বমাতৃসম্মেলনে যোগ দেন। দশটি সন্তানের জননী হওয়ায় সম্মেলন থেকে সম্মানিত হন। ২০০১সালের ২৯শে জুলাই জীবনাবসান হয়।

লতিকা সেন: ১৩১৯সালের ১৪ই জ্যেষ্ঠ ঢাকা জেলার পাইকপাড়া গ্রামে জন্ম। পারিবারিক বিপ্লবী হাওয়া তাঁকে রাজনীতিতে আকৃষ্ট করে। ১৯৩৬ সালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মহিলা সদস্যা। ১৯৩৯সালের ২০শে অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ডা: রণেন সেনের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বন্দীমুক্তির দাবিতে মিছিলের পুরোভাগে থেকে ১৯৪৯ সালের ২৭শে এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

প্রতিভা গাঙ্গুলী: ১৯১৭সালে ছোটনাগপুরের সিংভূম জেলার চাইবাসায় জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্রতার বিরুদ্ধে লড়াই করে কৈশোরে রাজনীতিতে যোগদান। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ। হুগলী জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মূল পরিচালিকা ছিলেন। ১৯৪৯সালের ২৭শে এপ্রিল রাজবন্দীদের মুক্তির সমর্থনে মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

অমিয়া দত্ত: ১৯১৮ সালে ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্ম। ১৯৪৩সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ। ১৯৪৩ সালে ঢাকাতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির রিলিফের কাজে যুক্ত হন। ১৯৪৯সালের ২৭শে এপ্রিল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির মিছিলে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু।

গীতা সরকার: ১৯১৫সালের ২৬শে জুন বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার সালধ গ্রামে জন্ম। বালবিধবা গীতা পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা দূর করার জন্য হাসপাতালের নার্সের কাজে যোগ দেন। এইসময় কমিউনিস্ট পার্টির সংশ্রবে আসেন। ১৯৪৯সালের ২৭শে এপ্রিল রাজবন্দীদের মুক্তির দাবির সমর্থনে থেকে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

মীরা চট্টোপাধ্যায় : ১৯২৪সালের ১৫ই নভেম্বর জলপাইগুড়ি জেলায় জন্ম। ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে নানা বিপ্লবীর আনাগোনা। ১৯৪৩সালে ১৯ বছর বয়সে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীসভ্যা হয়ে পার্টির ইউনিট সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। নারী আন্দোলনের পাশাপাশি শিক্ষিকা হিসাবে শিক্ষক আন্দোলনে যুক্ত হন। ২০১২সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর জীবনাবসান।

সাধনা পাত্র: মেদিনীপুর জেলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। প্রথমে এই সমিতির সম্পাদিকা এবং পরে সভানেত্রী হন। কৃষকসভার ডাকে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণ করেন। কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। ১৯৭৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনে গড়বেতা ৩নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হন। ২০০২ সালের ৬ জুন জীবনাবসান।

বিমলা মাজী: পাঁশকুড়া থানার চক দুর্গাপুরে ১৯২৪সালে জন্ম। পিতা শ্রীভাগবৎচন্দ্র মাইতি। বাল বিধবা ছিলেন। মণিকুন্তলা সেনের অনুপ্রেরণায় রাজনীতিতে আসা। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। পরে কমিউনিস্ট নেতা অনন্ত মাজীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তেভাগা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।

বিভা কোঙার: বর্ধমান জেলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম জেলা সম্পাদিকা। ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা হন। ১৯৪০ সালে কমিউনিস্ট নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙারের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে এবং ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে খাদ্য আন্দোলনের সময় দুবার কারাবরণ করেন। ১৯৯৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর জীবনাবসান হয়।

সুপ্রিয়া আচার্য্য: ১৯২২ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে জন্ম। বাবা প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। চল্লিশের দশকে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে যোগ দেন এই প্রগতি লেখিকা। ১৯৪৫সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদসা। ১৯৪৪ সালে প্রখ্যাত আইনজীবি স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের সঙ্গে বিয়ে হয়। ১৯৬৪সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে সি.পি.আই.এম-এ যোগ দেন। ১৯৯৫সালে কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটির কন্ট্রোল কমিশনের সদস্যা হন। ২০০২ সালের ৩১শে অক্টোবর মৃত্যু হয়।

ঊষারানী চক্রবর্তী: ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের শ্রীরামপুর, হুগলীতে জন্ম। মেদিনীপুরের ছোটবাজারে শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহের সূত্রে মেদিনীপুর জেলার মহিলাদের সংগঠিত করার কাজে যুক্ত হন। প্রথমে ১৯৪৪ সালে হুগলী জেলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭সালে কমিউনিস্ট পার্টির মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য হন। জমিদারী প্রথা বিলোপ এবং ঝাড়ুদার ও মেথরদের নিয়ে আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

সত্যবালা চট্টোপাধ্যায়: বীরভূম জেলার মহিলা নেত্রী। চল্লিশের দশকে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে বীরভূম জেলায় ত্রাণকাজ পরিচালনায় ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৪সালে গঠিত বীরভূম জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। পারিবারিক বাধা অতিক্রম করে রাজনৈতিক কাজ চালিয়ে যান। ১৯৬৭সালে জীবনাবসান।

প্রীতি ব্যানার্জী: জন্ম ১৯২৪ সালে রাজশাহীতে। পিতা নরেন্দ্রনাথ সরকার। ১৯৪৩ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে স্নাতক। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে যোগদান। সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য তিন বছর বোম্বেতে অবস্থান করেন। বেতার এবং চলচ্চিত্র জগতে সুনাম অর্জন করেন। ১৯৪৩সালে রাজশাহী মহিলা ফ্রন্টের সম্পাদিকা হন। কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসেবে ১৯৫০সালে কারাবরণ করেন।

বেলা লাহিড়ী: ১৯১৭সালে পূর্ববাংলায় জন্ম। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে ১৯৪৩সালে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে অংশগ্রহণ। কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ১৯৬৮খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির যুগ্ম সম্পাদিকা। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা হন। কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে তিনি সি.পি.আই তে যোগ দেন। ১৯৭০-৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির সদস্যা। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আমৃত্যু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কন্ট্রোল কমিশনের সদস্যা। ১৯৮২ সালে জীবনাবসান।

মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়: ১৯০৭ সালের ৬ই মার্চ কলকাতায় জন্ম। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা গায়িকা, লেখিকা ও নারী আন্দোলনের নেত্রী। নৃতত্ত্ববিদ এবং মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ। ১৯৪৩ সালে কৃষ্ণনগরে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে নিজের

বাড়িতে দাতব্য চিকিৎসালয় ও দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র খোলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নদীয়া জেলা কমিটির প্রথম সভানেত্রী ছিলেন। ঘরে বাইরে পত্রিকার প্রথম সম্পাদিকা। গণপ্রজাতান্ত্রিক চীন প্রতিষ্ঠার পর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি দলের সদস্যা রূপে চীন পরিভ্রমণ করে লেখেন 'চীন দেখে এলাম।' কারাবরণ করে বন্দীমুক্তির দাবিতে ৫১দিন অনশন করেন। আমৃত্যু কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতিশীল মহিলা আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন।

মাধুরী দাশগুপ্ত : ১৯২১সালে কলকাতায় জন্ম। শিক্ষিকা ছিলেন। ১৯৪৩খ্রিষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে নোয়াখালি দাঙ্গায় বিশেষ ভূমিকা নেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির প্রথম সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ওয়েস্ট বেঙ্গল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড-এর ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন।

মায়া লাহিড়ী: ১৯২১ সালে পাবনায় জন্ম। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে কাজ করার সুবাদে পাবনা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। এরপর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা অবনী লাহিড়ীকে বিয়ে করেন। ভারতের জাতীয় মহিলা ফেডরেশনের যুগ্ম সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। জীবনাবসান হয় ১৯৯১সালে।

সুধা রায় : ১৯১১খ্রি. বাংলাদেশের ফরিদপুরে জন্ম। ডক মজদুর আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী। প্রথমে অনুশীলন সমিতিতে এবং পরে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন। শেষে বলশেভিক পার্টিতে যোগ দেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজে যুক্ত ছিলেন। ভারত সরকারের ডক লেবার বোর্ডের তিনিই একমাত্র মহিলা আন্দোলনের নেত্রী হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে ভ্রমণ করেন। ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ৭ই জুন মৃত্যুবরণ করেন।

সুহাসিনী গঙ্গোপাধ্যায়: ১৯০৯খ্রি. ৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় জন্ম। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কর্মীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে বন্দী হন। ১৯৩২-১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হিজলী জেলে বন্দী ছিলেন। ১৯৩৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৮সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলে একবছর কারারুদ্ধ হন। শিক্ষা আন্দোলনে যুক্ত থাকেন। ১৯৬৫খ্রিষ্টাব্দে ২৩মার্চ জীবনাবসান হয়।

গীতা ব্যানার্জী (মিত্র/মুখার্জী): নদীয়া জেলার মাজদিয়া গ্রামে জন্ম। পিতা দুর্গানন্দ ব্যানার্জী। প্রথমে ধ্রুব মিত্র এবং পরে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন। ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হয়ে ১৯৪৭ সালে ইউরোপ যান সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিনিধি হিসাবে। যুব আন্দোলনেও যুক্ত ছিলেন। পরে মহিলা আন্দোলনে যুক্ত হয়ে বজবজে কাজ করতে থাকেন। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। বজবজে জুট শ্রমিকদের নিয়ে তাঁর আন্দোলন উল্লেখের দাবি রাখে।

ছায়া বেরা: ১৯৪২সালের ১৪ই জুলাই ওড়িশার কটকে জন্ম। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে যোগদান। ১৯৭১সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সদস্যা নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সাল থেকে নন্দনপুর কেন্দ্রে পরপর চারবার নির্বাচিত বিধায়ক। প্রথমবারে বামফ্রন্ট সরকারের সমাজশিক্ষা ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ও গ্রন্থাগার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হন। আমৃত্যু বামফ্রন্টমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯৮ সালের ১৩ই জুলাই মৃত্যু।

সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায় : জন্ম চন্দননগরে ১৯২৫সালে। বাবা বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, মা আশালতা চ্যাটার্জী - হুগলী জেলার নারী আন্দোলনের একজন নেত্রী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক। চন্দননগর মহিলা সমিতি, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজনীতিতে যোগ দান। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন। হুগলীর ডুবিরভেরীতে তেভাগা আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা নেন। ১৯৪৯সালে গ্রেপ্তার হয়ে ৫৩দিন অনশনে যোগ দেন। ১৯৮২-৮৪ সালে রাজ্য বিধানসভার সদস্যা। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সহ-সম্পাদিকা ছিলেন। ২০১৩ সালের ৭ই জানুয়ারি জীবনাবসান হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যাদের সঙ্গে সরোজিনী নাইডু

বেলা লাহিড়ীকে লেখা মুক্ত কুমারের চিঠির অংশ বিশেষ

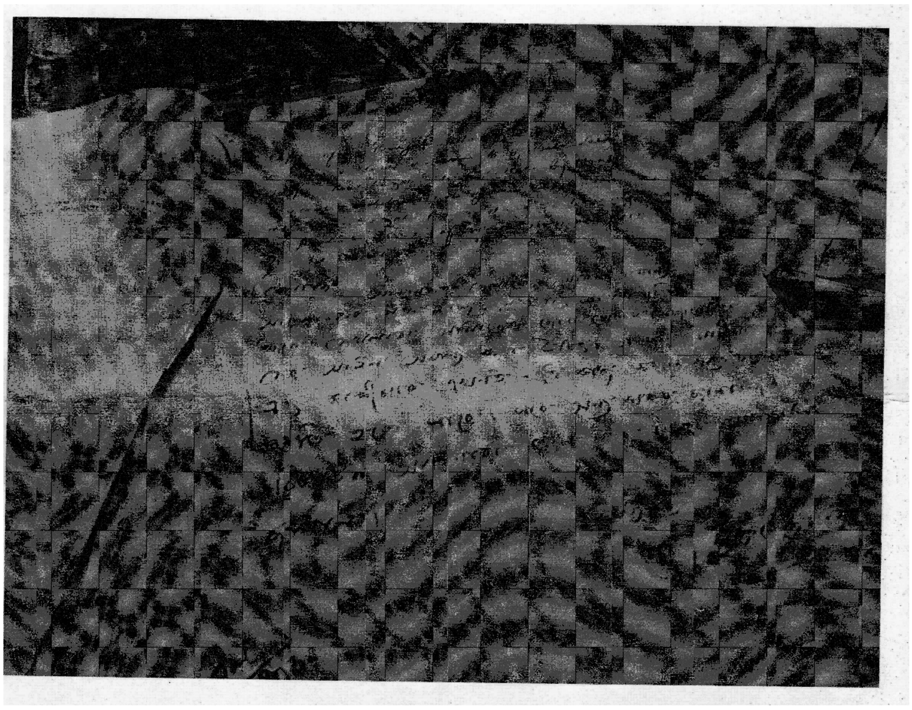

৫-১০ জুন, ১৯৫৩ সালে কোপেনহেগেন-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদল

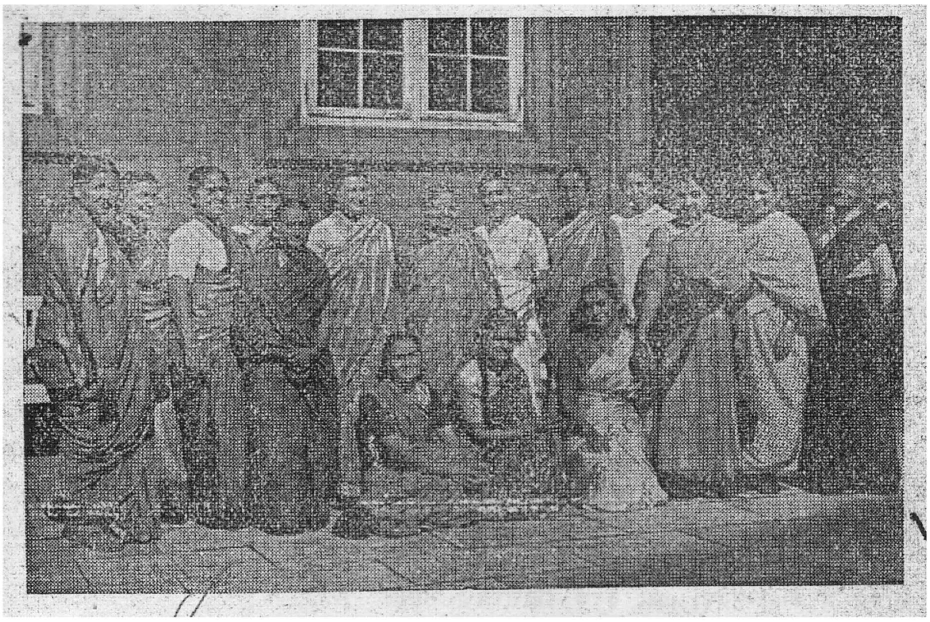

১৯৫৩ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর খাদ্য দপ্তরের সামনে কলকাতা ও শহরতলীর মেয়েদের সমাবেশ

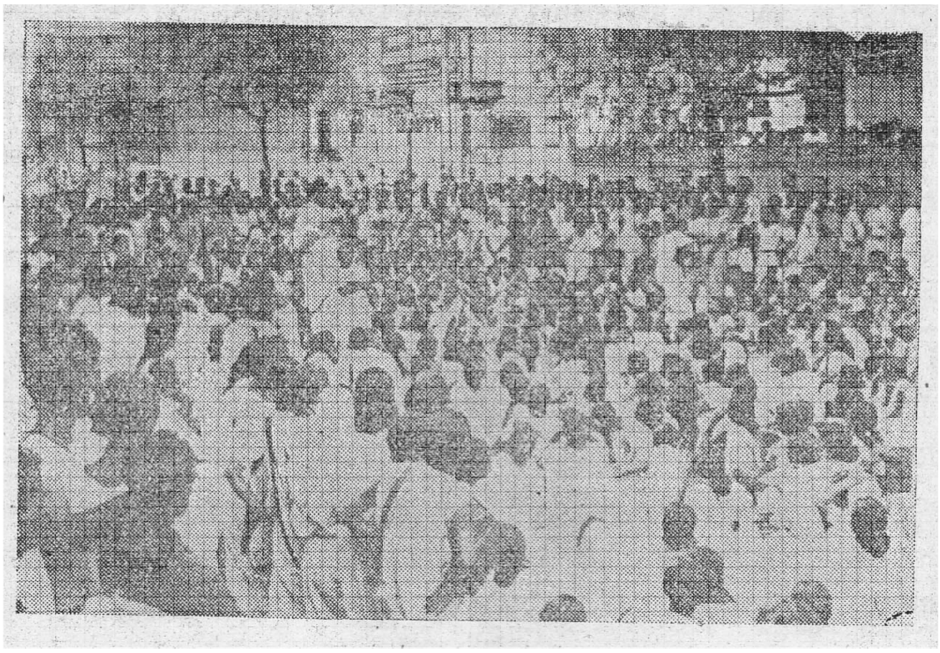

উৎসপঞ্জি

প্রাথমিক উৎস:

• মহাফেজখানায় প্রাপ্ত তথ্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, কলকাতা, পার্কস্ট্রীট।

পুলিশ ফাইল

• Copy of report of D.I.O (I) dated 13.3.56, File No.-898/44

• Weekly confidential report of the superintendent of Police Nadia for the week ending 21.8.54. File No. - 898/44

• Report of the Superintendent, Presidency Jail, Calcutta, File No.- 777/42

• Report of the Special Superintendent of Police, Intelligence Branch, C.I.D, West Bengal, Calcutta, File No.-777/42.

• Report of the Home Department, Govt. of West Bengal, Calcutta the 13th January, 1950, File No.- 777/42.

• Report of the Superintendent of Police, Bankura, dated 1.5.1948, File No. - 777/42.

• Report of the Superintendent of Police Bankura, dated 4.9.1948 File No. 777/42.

• Report of the Superintendent of Police Bankura, dated 23.10.1948 File No. 777/42.

• Report of the District Intelligence Branch, Bankura, the 8th Nov. 1950, No. 4201/95-48(154) File No. 898/44.

• Report of the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, C.I.D. West Bengal, File No.-777/42.

• Report of the Superintendent, Presidency Jail, Dated 25.1.1951, File No.-1628/49.

• Report of a D.I.B. Officer, dated 16.2.1948, File No. - 1628/49.

• Report of a D.I.B. Officer, dated 3.4.1948, File No. 1628/49.

• Report of a D.I.B. Officer, dated 11.5.1948, File No. 1628/49.

• Report of a D.I.B. Officer, dated 6.6.1949 File No. 1628/49.

• A brief note from Deputy Inspector General of Police Intelligence Branch C.I.D. dated 2.4.1948. File No. 619/36

• A brief note from C.I.D. West Bengal, dated 4th June, 1948 File No. 619/36.

• Report from D.I.B., dated 31.10.1955, File No.- 619/36.

• Report C.P. dated 26.2.1955, File No.-619/36.

• C.P. Report dated 15.1.1955, File No.- 619/36.

- C.P. Report on 8.1.1955, File No.- 619/36.
- I.B. Officers Reported dated 30.3.55, File No. - 619/36.
- Report D.I.O Coach Bihar 30.12.1954, File No.- 619/36.
- Report of the District Intelligence Branch (C.I.D.) Coach Bihar, 6th January, 1955, File No.- 619/36.
- Midnapore District Confidential Report 2.4. 54., File No. - 1340-43.
- Week Ending Report D.I.B. Hooghly 2.4.1954, File No. - 1340-43.
- Hooghly Week Ending Report D.I.B. 26.3.54, File No.-1340-43.
- C.A.B. Report on 6.9.1948, File No. - 789(46).
- Report Intelligence Branch, C.I.D File No.- 702-49.
- Confidential Diary Calcutta Police File No. - 702-49.
- Report of the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch CID West Bengal. Dated the /4th February 1950. File No. 278(x) 50.
- Report of the Deputy Commissioner of Police, 24.9.49 Special Branch, Calcutta, File No.-372x50
- Report of the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, CID, W.B., 15th March 1949, Police File No.- 540/49
- Report of the Deputy Commissioner of Police, Dated 14.11.1949, Special Branch Calcutta, Police File No. - 278(x) 50
- File No. 619/36
- File No. 777/42
- File No. 898/44
- File No. 1628/49
- File No. 789/46
- File No. 702-49
- File No. 278 (x) 50
- File No. 372 (x) 50
- File No. 240 (x) 46
- File No. 540 (x) 49
- File No. 3852 (x) 49
- File No. 1628 (x) 49

- File No. 1500/42
- File No. 1195/42
- File No. 937/44
- File No. 1340/43(Darjeeling)
- File No. 1340/43 (Howrah)
- File No. 1340/43 (JalPaiguri)
- File No. 1340/43 (Burdwan)
- File No. 1340/43 (Coach Bihar)
- File No. 1340/43 (Birbhum)
- File No. 1340/43 (24Paraganas)
- File No. 643/45
- File No. 46/50
- File No. 708/46
- File No. 948/46
- File No. 3290/49
- File No. 4162x49
- File No. 34 x 49
- File No. 326x49
- File No. 2260 x 50
- File No. 2526 - 50
- File No. 2100 - 50
- File No. 556 x 50

Debates in the West Bengal Legislative Assembly:

- Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the Provisions of the Constitution of India, 21 Sept. 1954, P. 1-29.
- Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the Provisions of the Constitution of India, 23rd Sept.1959, P. 108-131.
- Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the Provisions of the Constitution of India, 28th Sept. 1959 (p.260-301)
- Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the Provisions of the Constitution of India, 4th December 1959 (P-565-578)

Copy of Telegram and Telephone:

- Copy of Telegram dated 3.5.1954 from A.S.I. of I.B. Howrah R/S File No. 619/36
- Copy of Telephone Message dated 14.4.1955 from A.S.I. Upendra Nath Banerjee(South) and A.S.I.Barin Bhattacharjee to D.S. (c) I.B. Cal. File No. 619/36.
- Telephone Message dated 12.4.1955 from S.I.R.B. File No.-619/36.

Letter :

- Copy of a Cyclostyled letter in English dated 30.6.1955 in a book post cover addressed to the Editor, Swadhinata, 33 Alimuddin Street, Calcutta-16, issued Hazra, Begum, Anasuya Gyanchand, National Federation of Indian Women.
- Copy of a letter in Bengali dated 2.3.55 in a closed cover from Chitta Roy Secy. Subdivisional Biri Mazdoor Union.
- A letter dated 7.2.56 from Bela Lahiri of Paschim Banga Mahila Attyaraksha Samity 188/2 Bowbazar St. Calcutta 12. to Pankaja Deb Barma, Ganatantrik Nari Samity 37/2 Krishna Nagar, P.O.- Agartala, Tripura, File No. - 898/44.
- দাসপুর থানা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে D.I.G, I.B., C.I.D. (West Bengal Calcutta)-র উদ্দেশ্যে ১০.৬. ১৯৬৩ তারিখের চিঠি। File No. - 3852/49.
- Copy of a typed letter in Eng. dated 8 July 52 intercepted at Boubazar P.O. on 14 July 52 bearing a postal seal of issue illegible. From - Trade Union International of Agricultural & Forestry Workers. To- Mrs. Shanta Mukherjee Bengal Provincial Trade Union Congress. File No. 240/46.
- The Assistant Secretary Govt. of West Bengal, এই সম্বোধনে নিরাপত্তাবন্দী শেফালী রায় কর্তৃক ৬.৪.১৯৪৯ তাং লেখা একটি চিঠি। File No. 702-49 (31)
- ১৫.১১.১৯৫৯ তারিখে বালুরঘাট থেকে নীলিমা সেন কর্তৃক বেলা লাহিড়ীকে লেখা চিঠি। ফাইল নং - 898/44 (1)
- ১১.১১.১৯৫৯ মণিকুন্তলা সেন কর্তৃক বেলা লাহিড়ীকে লেখা চিঠি ! ফাইল নং 898/44 (1)
- ২০.১১.১৯৫৮ হুগলী জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি পক্ষে মুক্তা কুমার কর্তৃক বেলা লাহিড়ীকে লেখা চিঠি। (ফাইল নং 898/44 (1))
- ৪.৭.১৯৫৬ ২৪ পরগণা মধ্যম গ্রাম মহিলা আত্মরক্ষা সম্পাদিকা, হিরন্ময়ী রায় কর্তৃক বেলা লাহিড়ীকে লেখা চিঠি। (ফাইল নং 898/44(1))
- ১৭.১.১৯৫৬ বুড়া শিবতলা চুঁচুড়া থেকে মুক্তা কুমার কর্তৃক বেলা লাহিড়ীকে লেখা চিঠি। ফাইল নং 898/44(1)
- ৪.২.১৯৫৫ তুফানগঞ্জ থেকে সেবিকা পাল কর্তৃক বেলা লাহিড়ীকে লেখা চিঠি। ফাইল নং 898/44(1)

- ১০.৮.১৯৫৪ কৃষ্ণনগর থেকে অমিয়া দাশগুপ্তা কর্তৃক বেলা লাহিড়ীকে লেখা চিঠি। ফাইল নং - 898/44(1)
- ১৯.৭. ১৯৫৪ মেদিনীপুর জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষে নির্ম্মলা সান্যাল কর্তৃক বেলা লাহিড়ীকে লেখা চিঠি। ফাইল নং - 898/44(1)
- ৬.১১.১৯৫০ মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে মহিলা রাজবন্দী ভক্তি ঘোষ কর্তৃক The Home Secretary, Govt. of West Bengal কে লেখা চিঠি। ফাইল নং - 777/42
- ৮ই আগষ্ট ১৯৫০ মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দিনী বিমলা মাজী কর্তৃক মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের বিশেষ শাখার সম্পাদক মহাশয়কে লেখা চিঠি। ফাইল নং - 1628/49
- ১৬ই জুন ১৯৫০ মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দিনী বিমলা মাজী কর্তৃক The Home Secretary (Govt. of West Bengal) কে লেখা চিঠি। ফাইল নং - 1628/49
- ৭ই জুলাই ১৯৫০ মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দিনী বিমলা মাজী কর্তৃক মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ স্বরাষ্ট্র সচিব মহোদয়কে লেখা চিঠি। ফাইল নং 1628/49
- 15.6.1954 হেনা বেরা কর্তৃক বেলা লাহিড়ীকে লেখা চিঠি। ফাইল নং 619/36
- 12.2.1942 সালে বাঁকুড়া থেকে ভক্তি সেন কর্তৃক কল্যাণী মুখার্জীকে লেখা চিঠি। ফাইল নং 619/36
- ৩রা ভাদ্র ১৩৬৯ চব্বিশ পরগণা জেলার ব্যারাকপুর মহিলা সমিতির সম্পাদিকা রেবা চ্যাটার্জীর লেখা চিঠি। ফাইল নং - 3852/49
- ৩.৯.১৯৪৯ ঊষা চক্রবর্তী কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব মহাশয়কে লেখা চিঠি। ফাইল নং - 789/46
- ৩০.১২.৪৮ ঊষা চক্রবর্তী কর্তৃক মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় মারফৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব মহাশয়কে লেখা চিঠি। ফাইল নং 789/46.

সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকা

- স্বাধীনতা, ১৯৪৬-১৯৪৮খ্রিষ্টাব্দ, ১৯৫৪-১৯৫৯খ্রিষ্টাব্দ
- জনযুদ্ধ, ১৯৪২-১৯৪৪খ্রিষ্টাব্দ
- পিপলস্ ওয়ার, ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ
- ঘরে বাইরে, ১৯৪৩-১৯৪৯খ্রিষ্টাব্দ, ১৯৫৩-১৯৬৭খ্রিষ্টাব্দ
- একসাথে, ১৯৬৮-২০১৪খ্রিষ্টাব্দ
- নন্দন, ১৯৭০-২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ
- দেশহিতৈষী
- যুবশক্তি
- মার্কসবাদী পথ, ১৯৯০-২০১৫খ্রিষ্টাব্দ
- ছাত্রসংগ্রাম

• পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন জেলা সংখ্যা, তেভাগা সংখ্যা ইত্যাদি

• The Working Class- Monthly Journal of the CITU

• সমাজ জিজ্ঞাসা

• শব্দের মিছিল

সাক্ষাৎকার:

• বামপন্থী নারী আন্দোলনে অংশগ্রহণ কারী কয়েকজন নারী নেতৃত্বের সাক্ষাৎকার।

সহায়ক বা গৌণ উৎস:

• Ray Renuka , *My Reminiscences*, All India Women's Conference, 2005

• Desai Neera & Thakkar Usha, *Women in Indian Society*, National Book Trust, India, 2001.

• Rai Chowdhuri Satyabrata , *Leftlism in India*, Macmillan, 2007.

• Das Suranjan & Bandyopadhyay Premansu Kumar, *Food Movement of 1959*, K.P. Bagchi & Company, Kolkata , 2004.

• Roy Bharati and Basu Aparna (eds), *From Independence Towards Freedom Indian Women Since*.

• Roy Anuradha , *Cultural Communism in Bengal*, Prima Publishers, 1936-1952.

• Basu Chandan, *The Making of the Left Ideology in West Bengal Culture, Political Economy, Revolution 1947-1970,* Abhijeet Publications, Delhi, 2007.

• Basu Chandan, *Radical Ideology and Controlled Politics : CPI and the History of West Bengal 1947-1964,* Alphabet Books, 2005

• Chanda Anuradha Ed, *Women in History,* Progressive Publishers, 2003.

• Ghosh Jayasri, *Political Participation of Women in West Bengal A Study,* Progressive Publishers, 2000.

• Sarkar Sujaya, *'Writing Women's History-Role of Autobiography and Sediner Katha',* Ghosh Ratna (ed), The Study of Social History-Recent Trends, Progressive Publishers, 2015.

• মুখোপাধ্যায় কনক, *নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা,* একসাথে, ১৯৯৩

• সেন মণিকুন্তলা, *সেদিনের কথা,* নবপত্র প্রকাশনা, ১৯৮২-৯ই আগষ্ট

• চক্রবর্তী রেণু, *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা (১৯৪০-১৯৫০)* মণীষা,

• বেবেল আগস্ট, *নারী-অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৮৩

• মুখোপাধ্যায় কনক, *আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের ধারা,* একসাথে, ২০০৫

- মুখোপাধ্যায় কনক, *নারীমুক্তির প্রশ্নে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড; ১৯৮৪
- দাশগুপ্ত মৃণালিনী, *নির্বাচিত রচনা,* একসাথে, ২০০৪
- গুপ্ত শ্যামলী, *বঙ্গনারীর প্রগতিপ্রবাহ,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২
- মুখোপাধ্যায় সরোজ, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১লা মে ১৯৮৫
- সেনগুপ্ত অমলেন্দু, *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব,* প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৮৯
- আচার্য পঙ্কজ, *নির্বাচিত রচনা,* পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, জুন ১৯৮৩
- বসু জ্যোতি, *যতদূর মনে পড়ে,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮
- ড. মজুমদার দিলীপ, *পশ্চিমবঙ্গের গণ আন্দোলন ও খাদ্য আন্দোলন,* নবজাতক প্রকাশন, ১লা অক্টোবর, ১৯৯১
- নাগ নিবেদিতা, *ঢাকা থেকে কলকাতা,* আলোচনা চক্র, কলকাতা -৫৬, ৪ঠা আগষ্ট ২০০৮
- চক্রবর্তী জ্যোতি, *রচনা সংগ্রহ,* পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, জানুয়ারী ১৯৮৮
- পাল চৌধুরী অপর্ণা, *নারী আন্দোলন: স্মৃতিকথা,* পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, অক্টোবর ১৯৯০
- *বামফ্রন্ট সরকার ও নারী সমাজ,* একসাথে, এপ্রিল ১৯৮১
- মুখোপাধ্যায় কনক, *মার্কসবাদ ও নারীমুক্তি,* পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩
- চট্টোপাধ্যায় রানু, *বাংলা দেশের স্মৃতি,* পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, নভেম্বর, ১৯৮৪
- মুখোপাধ্যায় কনক, *মনে মনে,* একসাথে, ২০০৬
- সেন মণিকুন্তলা, *জনজাগরণে নারী জাগরণে জন্মশতবার্ষিকী রচনা সংগ্রহ,* মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, থীমা ২০১০
- মুখোপাধ্যায় কনক, *স্মরণ করি,* পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ২০০৩
- *সাতাশে এপ্রিল,* রাজ্য কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৮৫
- গুপ্ত শ্যামলী, *নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৭
- গুপ্ত শ্যামলী, *শতবর্ষের কৃতি বঙ্গনারী,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১
- ড. ঘোষ অসিত, *আপন কথা,* পূর্বদেশ, আগস্ট, ২০১১
- চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী ও নিয়োগী গৌতম, *ভারত ইতিহাসে নারী,* কে.পি.বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৮৯
- পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা, *কৃষক আন্দোলনের সংগ্রামী অধ্যায়,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড,২০১২
- বন্দ্যোপাধ্যায় কল্যাণী, *রাজনীতি ও নারীশক্তি,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, জুন, ২০০৯
- ঘোষ শাশ্বতী, *সমতার দিকে আন্দোলনে নারী : প্রথম পর্ব,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, জুন ১৯৯৯
- দে বরুণ, *মুক্তি সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ,* পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ৮ নভেম্বর, ১৯৯২

- চৌধুরী বিনয়, *অতীতের কথা কিছু অভিজ্ঞতা,* এন বি.এ সেপ্টেম্বর, ২০১১
- গুপ্ত মঞ্জরী, *একুশ শতকের ভাবনা,* একসাথে, জানুয়ারী, ২০০৪
- মুখোপাধ্যায় কনক, গীতা মুখোপাধ্যায়, গীতা সেনগুপ্ত, অপরাজিতা গোপ্পী, মালিনী ভট্টাচার্য, বৃন্দা কারাত, মঞ্জরী গুপ্ত; *সমাজতন্ত্রই নারীমুক্তির একমাত্র পথ,* একসাথে, ২০০৫
- গুপ্ত শ্যামলী, মালিনী ভট্টাচার্য, ঈশিতা মুখার্জী; *নারী ও বিশ্বায়ন,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪
- দাশগুপ্ত সমীর, *গণ আন্দোলনে ছাপাখানা কমিউনিস্ট পার্টি ও সমদর্শী সংবাদপত্রের ক্রমপর্যায়,* প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
- দাশগুপ্ত সমীর, *গণ আন্দোলনে ছাপাখানা কমিউনিস্ট পার্টি ও সমদর্শী সংবাদপত্রের ক্রমপর্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ই আগস্ট, ১৯৯৮
- রসুল মুহম্মদ আবদুল্লাহ, *গ্রাম গ্রামান্তরে,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, অক্টোবর, ১৯৮৫
- চট্টোপাধ্যায় কুণাল, *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭
- দাশ সুস্নাত; *অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম,* নক্ষত্র প্রকাশন, ১৫ই আগস্ট, ২০০৭
- দাশ অমল; *ভারত ইতিহাসে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক,* প্রগতিশীল প্রকাশক, এপ্রিল ২০১৩
- *পঞ্চায়েত ও নারী সমাজ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড,* পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি, জানুয়ারী ২০০৪
- দাশগুপ্ত বাসব, *যুক্তফ্রন্ট সরকার ও পশ্চিমবাংলা,* নিউনারায়নী প্রেস, মে, ১৯৯৩
- ভট্টাচার্য তন্ময়, *আমাদের পূর্বসূরিয়া,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, অক্টোবর ২০০৫
- দত্ত নারায়ণ, *গণ আন্দোলনের পথ বেয়ে* - গণশক্তি, ২০১০
- গুপ্ত শুভাশীষ, *বিশ্বনারী আন্দোলনের পটভূমিকায় 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসে'র শতবর্ষের ইতিহাস,* কুলিক, কলকাতা, মার্চ ২০১১
- ধর কৃষ্ণ, *ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা,* তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৫ই আগস্ট, ১৯৯৭
- ঘোষ সুকান্ত, *৭০এর আপনজন,* উৎসব, মার্চ, ২০০৯
- গুপ্ত রত্না, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী নারী,* কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট - ১৯৯০
- নাম্বুদিরিপাদ ই.এম.এস., *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০৬
- বসু জ্যোতি, *নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড, আগস্ট ২০০৬, চতুর্থ খণ্ড সেপ্টেম্বর, ২০০৪, ৫ম খণ্ড নভেম্বর ২০০৫
- বিশ্বাস অনিল, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন-দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম খণ্ড- অক্টোবর, ২০০৪, ২য় খণ্ড সেপ্টেম্বর, ২০০৩, ৩য় খণ্ড ৫ আগস্ট, ২০০৪, ৪র্থ খণ্ড, ২০০৫, ৫ম খণ্ড নভেম্বর ২০০৬
- পোলিট হ্যাবি, *নারী কমিউনিজম, মার্কস থেকে মাও,* র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০০৮
- বিশ্বাস অনিল, *নির্বাচিত রচনা সংকলন,* গণশক্তি ২য় খণ্ড, ৩রা জানুয়ারী, ২০০৯, ৩য় খণ্ড, ৩রা জানুয়ারী

২০১০, ৪র্থ খণ্ড, ৩রা জানুয়ারী, ২০১১

- মুখোপাধ্যায় সোমা, *অধিকার থেকে ক্ষমতায়ন,* মিত্রম্, এপ্রিল ২০০৮
- চট্টোপাধ্যায় তুষার; *স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলী জেলা,* নবজাতক প্রকাশন, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৮৩
- চৌধুরী অরুণ, *বীরভূম জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলন গঠন ও ব্যক্তিত্ব* - এন.বি.এ. মার্চ ২০১৪
- চন্দ পুলক, *নারীবিশ্ব,* গাঙ্চিল, জুলাই, ২০০৮
- দাশ সুস্নাত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্রীসমাজ,* ছাত্রসংগ্রাম - ২০০২
- আহমদ্ মুজফ্ফর, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারী ২০০৬
- আহমদ্ মুজফ্ফর, *নির্বাচিত প্রবন্ধ,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ই আগষ্ট, ২০১১
- সুকোমল সেন; *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস* (১৮৩০-২০০০) ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারী ২০০৫
- মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত; *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান,* প্রথম খণ্ড -নবম খণ্ড
- *ইতিহাস অনুসন্ধান,*পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, একাদশ খণ্ড, দ্বাদশ খণ্ড, পঞ্চদশ খণ্ড
- হোসেন আনোয়ারা; *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী* (১৮৭৩-১৯৪৭), প্রগতিশীল
- মুখোপাধ্যায় কনক; *ভারতের নারী আন্দোলনের ধারা*
- *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বামফ্রন্ট - ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের ৫০ বছর, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি* (মার্কসবাদী, আগস্ট ২০০৯
- দাশগুপ্ত কমলা, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী,* র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫
- পূততুণ্ড সঞ্জয়, *কৃষক সংগ্রামের পাতা থেকে,* এন.বি.এ, ২০১৪